মাহ্যার নামা

(স্মারকলিপি)

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশক ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১২১১
বাংলাদেশ

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
রমজান, ১৪১৩
ফাল্গুন, ১৩৯৯
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

সংখ্যা ২০০০ কপি

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ ঃ
শাবান, ১৪১৪
চৈত্র, ১৪০০
এপ্রিল, ১৯৯৪

সংখ্যা ২০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস, ঢাকা

যা বলা প্রয়োজন

'মাহ্‌যার নামা' (স্মারকলিপি) পুস্তকের ইতিহাসের সাথে পাঠকদের পরিচয় থাকা খুবই প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে এর পরিচিতি তুলে ধরছি ।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তান জাতীয় সংসদ এক সিলেক্‌ট কমিটি নিয়োগ করে। উক্ত কমিটির কাছে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াও এর বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যেসব অভিযোগ আনা হয় ওসবের যথাযথ উত্তর দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান জাতীয় সংসদের আহ্বানে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রাহঃ) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন তা-ই মাহ্‌যার নামার (স্মারকলিপি) রূপ নিয়েছে।

এসব সত্ত্বেও পাকিস্তান জাতীয় সংসদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে সাংবিধানিক ও আইনের স্বার্থে 'অ-মুসলিম' বলে ঘোষণা করেছে। এ সীমিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পাকিস্তান জাতীয় সংসদ কুরআন পাকের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অ-মুসলিম ঘোষণা করার ভিত্তি খুঁজে পায়নি পাবেও না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত ঘোষণার পর ঐ দেশের জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নানাভাবে ক্ষুন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে, নাগরিকদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলাম ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান ধর্মীয় সহনশীলতা সর্ব নিম্নস্তরে পৌঁছেছে ফলে ধর্মীয় কোন্দল ও হানাহানি খুনাখুনি অহরহ লেগেই আছে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ঐ দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। কারণ হলো, কোন আহমদী কাকেও সালাম দিয়েছে, কেউ কলেমা পড়েছে, কেউ বিসমিল্লাহ্‌ ও ইনশাআল্লাহ্‌ উচ্চারণ করেছে এবং কেউ কুরআন তেলাওয়াত করেছে ইত্যাদি। এ সবের দরুন নাকি অনেক 'ধর্মপ্রাণ' মুসলমানের 'প্রাণে' আঘাত লেগেছে। সেজন্যেই তারা কোর্টে বিচারপ্রার্থী হয়েছে। ভেবে দেখুন, মোকদ্দমা দায়েরকারীরা, আসামীগণ এবং শত শত আইনজীবী ও বিচারক এতে জড়িত হয়ে পড়েছেন। মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও সময়ের কি বিরাট অপচয়! দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কি অপূর্ব কূটকৌশল! এ সব দ্বারা কখনো কোন দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে কি?

দেশ ও সমাজের কল্যাণকামী কেউ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হোক তা চাইতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম নির্ধারণের দাবী সরকার মেনে নিলে বাস্তবে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ফলে ঐক্য ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ, অনৈক্য ও অকল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়। অনুরূপ অযৌক্তিক আন্দোলন দ্বারা পবিত্র ইসলামকেও হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

পরিতাপের বিষয় যে, যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন বাংলাদেশেও আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতকে 'অ-মুসলিম' ঘোষণার দাবী উঠেছে। পাকিস্তানের ইতিহাস থেকে এ দেশবাসী যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে এরূপ ক্ষতিকর আন্দোলন হতে দূরে থেকে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে যেতে পারে এ উদ্দেশ্যেই 'মাহ্‌যার নামা' (স্মারকলিপি) পুস্তকটির বাংলা তরজমা প্রকাশ করা হলো।

তরজমার দুরূহ কাজটি সমাধা করেছেন আমাদের সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশনায় আমার অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের বিশেষ অবদান রয়েছে। এর দ্বিতীয় সংস্করণটি অনুবাদক মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব জনাব এ, টি, এম, হক সাহেব ও জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সহযোগিতায় সংশোধন করার পর প্রকাশিত হল। তা'ছাড়া যারা এর সাথে যেভাবেই জড়িত সবার জন্যে কল্যাণ কামনা ও দোয়া করছি। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কারে ভুষিত করেন। আমীন।

খাকসার-

শাবান, ১৪১৪
চৈত্র, ১৪০০
এপ্রিল, ১৯৯৪

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংসদের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১
২।	একটি নীতিগত মৌলিক প্রশ্ন	১
৩।	মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সংবিধান	১
৪।	জাতীয় সংসদের ধর্মীয় বিষয়াদির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার	৩
৫।	কুরআন করীম ও হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ঘোষণাবলীর আলোকে	৪
৬।	প্রস্তাবাবলীর উপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মৌলিক আপত্তি	৫
৭।	হক ও ইনসাফের দাবী ও চাহিদা পূরণের আবেদন	৭
৮।	মুসলমানের সংজ্ঞা এবং জামা'তে আহ্‌মদীয়ার বক্তব্য	৯
৯।	কুফরী ফতওয়াসমূহের মূল্যায়ন	১৫
১০।	খতমে নবুওয়ত অস্বীকার সংক্রান্ত অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ	২০
১১।	মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সম্পর্কে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার রচনাবলী থেকে	২৮
১২।	কুরআন করীমের অত্যুচ্চ শান ও মর্যাদা	৪১
১৩।	আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা	৫৬
১৪।	আয়াত "খাতামান্নাবীঈন"-এর তফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)	৭৩

১৫।	আরবী অভিধানের আলোকে 'খাতামান্নাবীঈন' শব্দের অর্থ	৮০
১৬।	আয়াত-"খাতামান্নাবীঈন"-এর ব্যাখ্যা ঃ হাদীস সমূহের আলোকে	৮৯
১৭।	জিহাদ অস্বীকার করার অভিযোগের প্রকৃত স্বরূপ	৯২
১৮।	অন্যান্য কতিপয় অভিযোগের পর্যালোচনা	১১৫
১৯।	সম্মানিত সাংসদ মহোদয়গণের খেদমতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন	১৩২
২০।	পাকিস্তানের বিভিন্ন ফির্কার ধর্ম-বিশ্বাস ঃ যা অপরাপর ফির্কাগুলোর দৃষ্টিতে আপত্তিকর	১৩৭
২১।	আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বেদনাভরা আন্তরিক সাবধানবাণী	১৪৭
২২।	দোয়া	১৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

"মাহ্যার নামা" সেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, যা আহমদীয়া জামা'ত ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের পূর্ণ হাউস সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির সামনে নিজেদের মুসলমান হবার, নিজেদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরার এবং এই জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অমূলক অপবাদসমূহ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছিল। আর গোড়াতেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, জামা'তে আহ্‌মদীয়ার মতে দুনিয়ার কোনও সংসদ বা আদালত কোনও ব্যক্তি বা জামাত ও সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস নিরূপণ ও নির্ধারণের আদৌ কোন অধিকার রাখে না। কেননা এরূপ এখতিয়ার ও অধিকার একমাত্র খোদাতা'লারই, যিনি মানবহৃদয়ের গোপন রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞাত। তেমনিভাবে মর্মান্তিক বেদনা ভরা ভাষায় এ বিষয়টির সম্পর্কেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, ঐ সংসদ যেন আহমদীদেরকে অ-মুসলিম বলে আখ্যায়িত ক'রে মুসলিম উম্মাহ্‌র একতায় ফাটল ধরাবার কারণ না হয়। কেননা, এর দ্বারা এরূপ এক ভ্রান্ত ও ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে,যা পরবর্তী কালে অন্যান্য ফির্কা ও সম্প্রদায়গুলিকেও এর আওতায় ফেলতে পারে।

এই দুঃখজনক ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ এই যে, একটি বহুচিন্তিত পরিকল্পনাধীনে, কতিপয় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে (যেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাওয়ার অবকাশ নেই) তদানীন্তন সরকার আহমদীদেরকে ইসলামের গণ্ডীবহির্ভূত বলে আখ্যায়িত ক'রে উগ্রপন্থী আলেম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের প্রয়াস পেয়েছিল। আর যেহেতু বিরোধী দলে পূর্ব থেকেই বহুসংখ্যক আলেমের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাই এ বিষয়ে বিরোধীদলও জোরেশোরে তদানীন্তন সরকারের সহায়তা করে। এমন কি, পরিশেষে এ বিষয়টি যখন বহুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী একটা যৌক্তিক পরিণামে উপনীত হয় তখন বিরোধী দল এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে পরস্পর এ বিষয় নিয়ে এই টানাপড়েন শুরু হয়ে যায় যে, তথাকথিত এই 'নব্বই বছরের সমস্যা' সমাধানের কৃতিত্বের অধিকারী কে – সরকার, না বিরোধী আলেম সম্প্রদায় ।

বস্তুতপক্ষে এটা পাকিস্তানের ইতিহাসে বড়রকমের একটা বেদনাদায়ক ঘটনা, যদ্বারা রাজনীতিকে ধর্মের মধ্যে এবং ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে অনুপ্রবেশ ও অনধিকার চর্চার ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হল। এটাই সেই মারাত্মক ভুল, যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজ পাকিস্তানের রাজনীতিকে এবং আজ অব্দি ইহা এই হোঁচট থেকে শামলিয়ে উঠতে পারছে না। এরপর ক্রমাগত ধারায় দেশের রাজনৈতির অঙ্গণের চরমপন্থী আলেমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে আর এটাই সে ভুল, যা পরিণামে সেই দুর্ভাগ্যজনক মার্শাল ল' (সামরিক শাসন)-কে ডেকে আনে, যার এগার বছরের সময়কালটা অন্য যে কোন মার্শাল ল'-এর তুলনায় শতগুণ অশুভ ও অকল্যাণকর সাব্যস্ত হয়েছে, যার

অকল্যাণের কালো ছায়া আজও করাচী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত জাতির ভাগ্যকে রাহুগ্রস্থ করে রেখেছে এবং দিন দিন দেশ আইন-শৃঙ্খলা, ঐক্য, পরমত-সহিষ্ণুতা এবং জাতীয় সংহতি হতে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। স্বার্থপর রাজনীতি ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ ও অনাধিকার চর্চা ক'রে বিভেদের যে বীজ বপন করেছিল তা বহু রকমের নিত্যনতুন ঘৃণা-বিদ্বেষের ফসল নিয়ে প্রস্ফুট হতে লাগলো। আর পাকিস্তান শ্রেণী, ফের্কা, দল ও উপদলে এবং প্রদেশসমূহে বিভক্ত হতে আরম্ভ করেছে।

আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের যে হাল-অবস্থা, সে সম্বন্ধে চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়টি মোটেই গোপন নয় যে, বস্তুতপক্ষে তার গোড়াপত্তন করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। আমাদের দোয়া, আল্লাহ্‌তা'লা যেন জাতিকে প্রজ্ঞা দান করেন। এ দেশটি সম্বন্ধে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ যে আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা তিনি নিম্নরূপ ভাষায় এক মহতী সনদ হিসেবে জাতিকে দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌ করুন, দেশ যেন সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ ধারণ করে এবং এই মহান চার্টারটি আত্মস্থ করে। তিনি বলেছিলেনঃ

"তোমরা স্বাধীন। এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে তোমরা নিজেদের মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনালয়সমূহে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

তোমাদের ধর্ম, তোমাদের জাত-বংশ এবং তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস যাই হোক না কেন, এই মৌলনীতির সাথে তার কোনও বিরোধ নেই যে, আমরা সবাই একই রাষ্ট্রের সম-অধিকার সম্পন্ন নাগরিক। আমি মনে করি যে, এখন আমাদের উচিত এ লক্ষ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। তবেই তোমরা দেখবে যে কালক্রমে, না হিন্দু হিন্দু থাকবে, না মুসলমান মুসলমান থাকবে – ধর্মীয় অর্থে নয়, কেননা সেটা তো প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস – বরং রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমরা সবাই একই রাষ্ট্রের নাগরিক হব।" (ভাষণঃ ১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭ইং)

যে স্মারকলিপি (মাহ্‌যার নামা) পেশ করার সৌভাগ্য আহমদীয়া জামা'ত লাভ করেছিল, তা হুবহু এক ঐতিহাসিক দলীল স্বরূপ পুস্তক আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ মাহ্‌যার নামাটি পেশ করার পর এগার দিন যাবৎ পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে এটর্নি জেনারেল এবং বিভিন্ন আলেমের পক্ষ থেকে জামা'তে আহমদীয়ার উপর তীব্রভাবে জেরা পরিচালিত হয় এবং জামা'তে আহমদীয়ার তৎকালীন ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) তাদের উত্থাপিত সকল আপত্তি ও প্রশ্নাবলীর সারগর্ভ, যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। ঐ সকল কার্যক্রম সরকারের পক্ষ থেকে যথারীতি রেকর্ড করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, রহস্যজনকভাবে সরকার সেই রেকর্ড গোপন করে রাখেন। এক দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কয়েকটি সরকারও বদল হয়েছে তবুও আজ পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রম জনগণের সামনে আনা হয়নি। খোদা করুন, সে সময় শীঘ্র আসুক যখন কোন সরকার এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে হুবহু প্রকাশ করার সৎসাহস ও

তওফীক লাভ করেন যাতে সমগ্র জাতি এ বাস্তব অবস্থা জানতে পারে যে, আসলে জামা'তে আহমদীয়ার উপস্থাপিত বক্তব্য ও অবস্থান প্রকৃতপক্ষেই ধ্রুব সত্য।

সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ হল এই যে, পাকিস্তানের তদানীন্তন সরকার জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রহঃ)-কে বাধ্য করে যেন তিনি ন্যাশনাল এসেম্বলীর উক্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের বক্তব্য সবিস্তারে তুলে ধরেন এবং তৎকালে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে এ অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে অন্য চারজন প্রতিনিধি সঙ্গে নিতে পারেন। মোট কথা, জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিনিধিদলের মোট সংখ্যা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ) সহ পাঁচজন নির্ধারিত হয়ঃ

১। বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

২। মুকার্‌রম ও মোহ্‌তরম জনাব মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (মরহুম)।

৩। মুকার্‌রম ও মোহ্‌তরম জনাব শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব, এডভোকেট ও আমীর, ফয়সালাবাদ।

৪। মুকার্‌রম ও মোহ্‌তরম জনাব মৌলবী দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব (আহমদীয়াতের ইতিহাস রচয়িতা)।

উল্লেখিত অধিবেশনের পুর্বে সংসদের বিশেষ কমিটি সহস্রাধিক আপত্তি ও প্রশ্নাবলী নির্ণয়-নিরীক্ষণ করে কয়েকশত প্রশ্ন বিশেষভাবে জামা'তে আহমদীয়াকে সমালোচনা ও জেরার লক্ষ্যস্থল করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেন। পাকিস্তানের ধর্মবিষয়ক এবং আইন বিভাগের এটর্নি জেনারেল উক্ত কমিটির পুরোপুরি সাহায্যে নিয়োজিত ছিলেন। পরিশেষে ঐ প্রশ্নমালা তৈরী হয়, যেটা এটর্নি জেনারেল স্বয়ং উপস্থাপন করেন। এছাড়াও তাদের কোন কোন আলেমকেও পরবর্তীতে জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করার অনুমতি দেয়া হয়।

এই মাহ্‌যার নামাটি, যা প্রারম্ভেই পেশ করা হয়েছিল এবং সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, তা কোন কোন সংসদ সদস্য পরবর্তীকালে নিজেদের আহমদী বন্ধুদের কাছে অনুগ্রহপূর্বক সরবরাহ করেন। সুতরাং ঐ কপিগুলির মধ্যে একখানা কপি ইংল্যাণ্ড আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কাছেও পৌছায়, যার উপর ভিত্তি করে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হলো। ইংল্যাণ্ড জামা'তে আহমদীয়ার প্রত্যাশা যে, সত্যান্বেষীগণ ইহা পাঠ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে অ-মুসলমান বলে আখ্যায়িত করার সিদ্ধান্তটি কতটা ন্যায়সঙ্গত এবং ইসলামসম্মত।

প্রকাশক

খোদার আশিস ও করুণার সাথে, তিনিই সাহায্যকারী

সংসদের প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির সামনে দু'টি প্রস্তাব বিশেষ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পেশ হয়েছে। প্রস্তাব দু'টির মধ্যে একটি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে এবং অপরটি বিরোধীদলের পক্ষ থেকে।

একটি নীতিগত মৌলিক প্রশ্ন

সরকারের নিকট আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবী সম্বলিত প্রস্তাব দু'টিতে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উপর সবিস্তারে দৃষ্টিপাতের পুর্বে আমরা আমাদের এ বক্তব্যটুকু রাখা জরুরী বলে মনে করি যে, সর্বপ্রথম এই মৌলিক প্রশ্নটির মীমাংসা করা হোক যে, পৃথিবীর কোনও সংসদ–

১। কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় যে কোন ধর্ম গ্রহণ ও পালন করার মৌলিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রাখে কি না?

২। ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ ক'রে সংসদ কোন জামা'ত বা কোন ফের্কার বা ব্যক্তির ধর্ম নিরূপণ ও নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত দিতে পারে কি না?

মানুষের মৌলিক অধিকার ও সংবিধান

আমরা এই দুই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি 'না' বলে প্রদান করছি। আমাদের বিবেচনায় বর্ণ, বংশ ও ভৌগলিক বা জাতিগত ভাগ-বিভাগ ও ভেদাভেদ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের এই মৌলিক অধিকার রয়েছে যে, সে নিজেই তার ইচ্ছামত যে কোনও ধর্মের সাথে নিজেকে নিবদ্ধ রাখতে পারে এবং এ বিশ্বের কোন ব্যক্তি বা সংগঠন বা সংঘ বা সংসদ তাকে এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। জাতিসংঘের দলিলে যেভাবে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের এই

অধিকারটির প্রতিও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যে, সে তার ইচ্ছামত যে কোন ধর্ম গ্রহণ ও পালন করতে পারে। *(পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)*

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের সংবিধানেও ২০ নং ধারার অধীনে প্রত্যেক পাকিস্তানীর উক্ত মৌলিক অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সেইজন্য এ বিষয়টির নীতিগতভাবে মীমাংসা ও নিষ্পত্তি হওয়া উচিত যে, সংবিধান অনুযায়ী সংসদ আলোচ্য প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করার অধিকার আদৌ রাখে কি না? এ প্রসঙ্গে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহঃ)-এর প্রদত্ত একটি জুমুআর খুৎবার ইংরেজী অনুবাদ, যার মধ্যে উল্লিখিত বিষয়টির উপর সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে তা পরিশিষ্ট-২ স্বরূপ এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা গেল।

মানব-প্রকৃতি, স্বভাব ও বিবেক-বুদ্ধি কোন সংসদকেই এই অধিকার দেয় না যে, কোন ব্যক্তি বা ফির্কা বা সম্প্রদায়কে যেকোন ধর্ম ইচ্ছামত গ্রহণ ও পালনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিক।

দিলে পৃথিবীর প্রতিটি সংসদকেই এই অধিকার দিতে হবে। আর এই নীতি স্বীকার করে নেয়ার সাথে সাথে যে বিভিন্ন ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেগুলির মধ্য থেকে গুটি কয়েক হচ্ছে ঃ

(ক) পৃথিবীর প্রতিটি জাতীয় সংসদের স্বতঃই এ অধিকার বর্তাবে যে, খৃষ্টানদের কোন কোন ফির্কাকে অ-খৃষ্টান বলে নির্ধারণ করবে, হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায় বা দলকে অ-হিন্দু ইত্যাদি।

(খ) বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারী প্রতিটি ফির্কার নিজ দেশে জাতীয় সংসদের কাছে এ দাবী উত্থাপনের অধিকার জন্মাবে যে, উহা যেন অমুক অমুক ফির্কাকে অখৃষ্টান বা অহিন্দু বা অমুসলিম বলে সাব্যস্ত করার বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে। এ ভাবে বিষয়টি অনেক দুর পর্যন্ত গড়াতে থাকবে।

(গ) সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত দাঙ্গার কারণে যদি জামাতে আহমদীয়াকে বিশেষভাবে লক্ষ্যস্থল করা হয়ে থাকে, তাহলে এই যুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে এ পর্যন্ত যতগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে অথবা হতে পারে সেগুলির সম্পর্কেও এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বিবেচনা করা জরুরী এবং সমীচীন হবে।

(ঘ) পৃথিবীর অন্যান্য সংসদগুলিরও অধিকার জন্মাবে যে, তারা কোন কোন মুসলমান ফির্কাকে তাদের বিশেষ কোন আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে অমুসলিম বলে আখ্যায়িত করে। যেমন, ভারতের জাতীয় সংসদের এ অধিকার উদ্ভূত হবে যে, উহা মুসলমান ফির্কাসমূহকে তাদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দেয়া ফতওয়াসমূহের ভিত্তিতে

ক্রমান্বয়ে অমুসলিম বলে সাব্যস্ত করে ভারতের অমুসলিম (হিন্দু) সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবে। স্মর্তব্য যে, দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু।

(ঙ) অনুরূপভাবে খ্রীষ্টান দেশগুলিতেও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার বলে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার যথার্থ অধিকারী হবে যে, মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারবে। *(জোশো আফযাল উদ্দীনের প্রেস রিলিজের পরিশিষ্ট)।*

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত পরিস্থিতির রূপরেখা যুক্তি ও বিচার বুদ্ধির দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যথায় ইহা পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অগণিত দাঙ্গা-ফাসাদ ও বিশৃংখলার পথ খুলে দেয়ার কারণ হবে।

জাতীয় সংসদের ধর্মীয় বিষয়াদির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার

অনুরূপ প্রশ্নে কোন জাতীয় সংসদকে মতামত দানের যথার্থ অধিকারী বলে নির্ধারণ করা যেতে পারে না, কারণ কোনও জাতীয় সংসদ ধর্মীয় বিষয়াদির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যও কিনা তারও কোন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা নেই।

দুনিয়ার অধিকাংশ সংসদ রাজনৈতিক কার্যক্রমের ঘোষণাপত্র নিয়ে ভোটারদের কাছে যান এবং তাদের নির্বাচনও রাজনৈতিক যোগ্যতার ভিত্তিতেই করা হয়।

অতএব অনুরূপ কোন সংসদের এই অধিকার কি করে থাকতে পারে যে, উহা কোন্ ফির্কার কি ধর্মমত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়? অথবা কোন একটি আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কেই বা কি করে ফয়সালা করতে পারে যে, অমুক আকীদা অনুযায়ী অমুক ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে কি পারে না?

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের দাবীতে যদি কোন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে কোন ফির্কা বা জামাতের ধর্ম নির্ধারণের ফয়সালা করার যথার্থ অধিকারী বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে এরূপ অভিমত বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। মানব প্রকৃতি ও বিবেকের দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য নয় এবং ধর্মীয় মতেও গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এই জাতীয় বিষয়াদি গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুযায়ীও বিশ্বেব্যাপী গণতন্ত্রের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হয়ে থাকে। কোন কালেই ধর্মের ইতিহাসে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অধিকার স্বীকার করা হয়নি যে, তারা কারও ধর্মমত সম্বন্ধে কোন ফয়সালা দান করে।

যদি উক্ত নীতি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) দুনিয়ার সমগ্র নবীকুল (আলায়হেমুস সালাম) এবং তাঁদের অনুসারী জামাতসমূহ সম্পর্কে সমকালীন

সংখ্যাগরিষ্ঠের ফয়সালাকেই গ্রহণ করতে হবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এমন নির্যাতনমূলক ও ন্যায়নীতি বিবর্জিত ধারণা দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মের অনুসারীই নির্দ্বিধায় ও অবলীলাক্রমে রদ করে দিবে।

কুরআন করীম ও হযরত রসূল পাক (সাঃ)-এর ঘোষণাবলীর আলোকেঃ

কুরআন করীম ও হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ঘোষণাবলী অনুযায়ী জোর-জবরদস্তি করে কারও ধর্ম পরিবর্তন করা যায়, এই ক্ষমতা বা অধিকার কাউকেই দেয়া হয়নি। যেমন, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (البقرہ : ٢٥٧) অর্থাৎ, "ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকারের বল প্রয়োগ বৈধ নয়।" *(সুরা বাকারা ঃ ২৫৬ আয়াত)*

দৈহিক নিপীড়ন ও নির্যাতনের দ্বারা জবরদস্তি কারও ধর্ম পরিবর্তন করা হলেও –

اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ (النحل : ١٠٧)

- "সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে অস্বীকারে বাধ্য করা হয় তথাপি তার হৃদয় ঈমানে অটল ও প্রশান্ত থাকে" সূরা আল্ নাহ্ল ঃ ১০৬ এ আয়াত অনুযায়ী তার অন্তর পূর্ববৎ ঈমানে যদি কায়েম থাকে তবুও এরূপ পন্থা ও পদ্ধতি 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' আয়াত সম্বলিত শিক্ষার পরিপন্থী। আর তেমনি জবরদস্তি কোন মুসলমানকে অমুসলিম অথবা কোন হিন্দুকে মুসলিম বলে নির্ধারণ করাটাও 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' নির্দেশটির অবমাননার শামিল।

ইসলামের উক্ত শিক্ষার অধিকতর সমর্থন করছে এই আয়াত ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (النساء : ٩٣)

অর্থাৎ, "যে তোমাদেরকে মুসলমানদের ন্যায় 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলে তাকে 'তুমি মোমেন নও' একথা বলার অধিকার তোমাদের নেই" (সূরা আল্ নেসা ঃ ৯৪ আয়াত)।

আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট ফরমান এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদকে স্বীকার করে, তাকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যে, সে মুখে তো স্বীকার করছে কিন্তু অন্তরে সে অবিশ্বাসী তাই সে মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়- এমনটি করা সীমালংঘন করা এবং যেকোনও লোকের এখতিয়ার বহির্ভূত। নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি স্পষ্টভাবে উক্ত বিষয়টির উপর আলোকপাত করছে ঃ "হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন

যে, আঁ-হযরত (সাঃ) আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের মরুদ্যানের দিকে পাঠালেন। আমরা উষালগ্নে তাদের ঝর্ণাগুলোতেই তাদেরকে গিয়ে ধরে ফেল্‌লাম। আমি এবং একজন আনসারী দু'জনে তাদের এক ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। যখন আমরা তাকে ধরলাম এবং কাবু করে নিলাম তখন সে বলে উঠলঃ
(আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)। একথা শুনে আমার আনসারী সাথী তাকে আঘাত হানা থেকে বিরত রইলেন; কিন্তু আমি তাকে বর্শার আঘাতে মেরে ফেল্‌লাম। যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং আঁ-হযরত (সাঃ) বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, "হে উসামা! সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে মেরে ফেল্‌লে? আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে কেবল বাঁচার জন্যে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল।" কিন্তু তিনি (সাঃ) প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। এ অবস্থায় আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, "হায়! আজকের পূর্বে যদি আমি মুসলমানই না হতাম!" আর এক বর্ণনায় আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বললেন, "সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' স্বীকার করার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে"? আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে অস্ত্রের ভয়ে ঐরূপ বলেছিল।" তিনি বললেন, "তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে অন্তর থেকে বলেছিল কি-না?" হুযুর (সাঃ) এ বাক্যটি এতবার পুনরাবৃত্তি করলেন যে, আমার মনে হলো, "হায়! আমি যদি আজই মুসলমান হতাম"।
(বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাজী, 'বাবু বা'সিন নাবীয়ে উসামাবুনে যায়েদেন ইলাল হুরকাতে মিন জুহাইনাতাঃ পৃঃ ৬১২)।

প্রস্তাবাবলীর উপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মৌলিক আপত্তি

এ প্রসঙ্গে একান্ত আদবের সাথে এ আরয করাটাও অত্যাবশ্যক যে, ন্যাশনাল এসেম্বলীর সামনে যে আকারে বর্তমান রেজুলিউশনটি পেশ হয়েছে এর উপরে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আপত্তি প্রযোজ্য হয়, যার আলোকে বর্তমান প্রস্তাবটির উপর চিন্তাভাবনা করার পূর্বে এর বৈধতার প্রশ্নে ফয়সালা হওয়া অপরিহার্য।

উহা এই যে, আমাদের আকা ও মাওলা হুযুর খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে-

"سَتَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً"

অর্থাৎ "আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে (ফির্কায়) বিভক্ত হয়ে পড়বে। সবগুলিই জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি ব্যতীত।"

আল ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (রহঃ), – যিনি হিজাযের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফির্কার প্রতিষ্ঠাতা এবং শাহ্ ফয়সালের আকীদা অনুযায়ী বার শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ছিলেন- উপরোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করে এরশাদ করেছেন ঃ

" فَهٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ اَجَلُّ الْمَسَائِلِ فَمَنْ فَهِمَهَا فَهُوَ الْفَقِيْهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ "

অর্থাৎ "তিহাত্তর ফির্কার মধ্যে বাহাত্তরটি নরকবাসী এবং একটি জান্নাতী হওয়ার মসলা বা তত্ত্বটি এক মহতী মস্‌লা বা তত্ত্ব। যে ইহা বুঝে, সে-ই ফকীহ্ (ফিকাহবিদ)। আর যে তদনুযায়ী আমল করে অর্থাৎ বাহাত্তর ফির্কাকে জাহান্নামী এবং একটিকে জান্নাতী বলে আখ্যা দেয়, সে-ই মুসলমান।

(মুখতাসার সীরাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ঃ পৃঃ ১৩, ১৪, আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব প্রণীত, কায়রোয় মুদ্রিত)

জামা'তে ইসলামীর বিখ্যাত মুখপত্র (মৌলানা মওদূদী সম্পাদিত) তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী, ১৯৪৫ ইং এর সংখ্যায় লিখেছে ঃ "ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কোন বিষয়ে ঐক্যমত হওয়া সে বিষয়ে তাদের হক্ ও সত্য হওয়ার দলিল নয়। সংখ্যাধিক্যকেও 'সওয়াদে আযম' (বড় গোষ্ঠী) বলা যায় না। আর তেমনি প্রতিটি ভীড় বা গণসমাবেশকেও জামা'ত বুঝায় না। আর তেমনি কোন স্থানের এক দল মৌলভীদের কোন রায়কে গ্রহণ করে নেওয়াটাকেও 'ইজমা' বলা যায় না।......এই বক্তব্য ও অভিমতটির সত্যতা সেই হাদীস-নব্বীর দ্বারা সমর্থিত হয়, যা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিঃ) থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً. كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً. قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

অর্থাৎ "বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। এদের মধ্যে একটি ব্যতীত আর সবাই জাহান্নামী হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা হবেন? হে রসুলুল্লাহ!' তিনি বল্‌লেন, 'যারা আমার ও আমার সাহাবাদের তরীকায় (পথে) প্রতিষ্ঠিত হবেন তারাই সেই সকল লোক।"

এই দলটি না সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, না সংখ্যাধিক্যকে নিজেদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রমাণ বলে দাবী করবে। বরং তারা এই উম্মতে তিহাত্তরটি ফির্কার মধ্যেই একটি হবে এবং এই জনাকীর্ণ ধরাধামে তাদের অবস্থান অজ্ঞাত ও অপরিচিত লোকদের মত হবে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গিয়েছেন ঃ

بَدَءَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَّسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَءَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ -

------ অতএব যারা কেবল সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নিজেদেরকে ঐ জামা'ত বলে আখ্যায়িত করছে যাদের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে----- এরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীদার দলের জন্য তো এই হাদীসটিতে কোন আশার আলো নেই। কেননা এ হাদীসটিতে ঐ জামাতের দু'টি লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে। এক, তারা আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের তরীকায় হবে। দুই, তারা নিতান্ত সংখ্যালঘু হবে।" *(তরজমানুল কুরআনঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, পৃঃ ১৭৫ ১৭৬, সৈয়্যদ আবুল আলা মওদূদী রচিত)*

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপরোল্লিখিত ফরমানটির সম্পূর্ণ বিপরীতে আলেমদের পক্ষে পেশকৃত দাবী থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহর বাহাত্তরটি ফির্কাতো হলো জান্নাতী এবং শুধু একটি হলো জাহান্নামী-, যা কিনা নিশ্চিতরূপেই হযরত খাতামাল আম্বীয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীসটির পরিপন্থী এবং তাঁর প্রতি নির্জলা ঔদ্ধত্যের নামান্তর।

অতএব আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীর উপর বিচার বিবেচনার জন্যে সংসদে এর উপস্থাপন, ইসলামী রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) সম্মানিত জাতীয় সংসদের পক্ষে কখনও শোভা পায় না। অবশ্য প্রস্তাবটি যদি এইরূপে পেশ হয় যে, হাদীস-নববী (সাঃ)-এর আলোকে একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত সত্য ফির্কাটির নির্ণয় ও নির্ধারণ করা হোক, যে ফির্কাটি এই জনাকীর্ণ ধরাধামে অজ্ঞাত অপরিচিত এবং সংখ্যালঘু হবে, তাহলেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

হক্ ও ইনসাফের দাবী ও চাহিদা পূরণের আবেদন

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে জোরালো আবেদন রাখছি যে, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ এইরূপ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা এবং ফয়সালা থেকে দূরে থাকুক, যে ফয়সালা করা মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের নামান্তর। জাতিসংঘের সনদ এবং পাকিস্তানের সংবিধানের বিরোধী এবং সর্বোপরি কথা এই যে, কুরআন করীমের শিক্ষা এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহেরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর ইহা বহুবিধ খারাপি, ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলাকে ডেকে আনার হাতছানি

দেয়ার কারণ ও পটভূমিস্বরূপ সাব্যস্ত হতে পারে। অধিকন্তু পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ কর্তৃক স্থাপিত এই দৃষ্টান্তটি অন্যান্য দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী এবং ফির্কাগুলোর জন্য কঠিন সমস্যাবলী উদ্ভবের কারণ হতে পারে। মোট কথা, যদি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ উপরোল্লিখিত বক্তব্য ও নিবেদনগুলিকে উপেক্ষা করে নিজেকে এ বিষয়ের ন্যায্য অধিকারী মনে করে যে, উহা ইসলামের দিকে আরোপিত ও সংশ্লিষ্ট কোন ফির্কাকে কোন আকীদা-বিশ্বাস বা কুরআন করীমের কোন আয়াতের ভিন্নতর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত বলে সাব্যস্ত করার সংগত অধিকারীই বটে, তাহলে আমরা এই প্রস্তাবনা পেশ করবো যে, এমতাবস্থায় যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা হোক এবং বিচার-বুদ্ধি এবং ন্যায়-বিচারের মাত্রা, দাবী ও চাহিদাসমূহকে যথাসম্ভব পূরণ করা হোক এবং কখনও এমনতর পন্থায় ও ভঙ্গীতে এই নাজুক বিষয়টির উপর হস্তক্ষেপ করা না হোক যা দুনিয়ার দৃষ্টিতে হাসি ও ঘৃণা উদ্রেকের এবং জাতীয় মর্যাদা হানির কারণ হয়।

প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেবও ১৩ই মে তারিখে জাতির নামে তাঁর প্রচারিত ভাষণে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিবেচনাধীন সমস্যাটির উত্তম উপায়ে এবং ইনসাফের সকল দাবী ও চাহিদা মোতাবেক সমাধান ও নিষ্পত্তি করা হবে। জাতির নেতার এই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের উপর দ্বিগুণ দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় যেন এ জটিল ও নাজুক বিষয়টির উপর চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে ন্যায়-বিচার এবং যৌক্তিকতার চাহিদাকে হাত ছাড়া হতে দেয়া না হয়।

মুসলমানের সংজ্ঞা এবং জা'মাতে আহ্মদীয়ার বক্তব্য

জগদ্ব্যাপী ইহা একটি সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলের শ্রেণী নিরূপণের পূর্বে সে শ্রেণীর ব্যাপক ও সার্বজনীন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়, যা এ বিষয়ের মানদণ্ড। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সংজ্ঞাটি অক্ষুণ্ন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভিত্তিতে এ বিষয়ের ফয়সালা সহজ হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি বা দল সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে কি না। এ দিক থেকে আমাদের দাবী এই যে, আলোচ্য বিষয়টির উপর আরও বিচার বিবেচনার পূর্বে মুসলমানের একটি ব্যাপক ও ত্রুটিমুক্ত এবং সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হোক, যার উপর সকল ফির্কা একমত হয়, বরং প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের সে সংজ্ঞাটিতে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত বলে সাব্যস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ ও গভীর চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে ঃ

(ক) আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে কি মুসলমানের কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় যা স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে বিনা ব্যতিক্রমে প্রয়োগ করা হয়েছে? যদি থাকে তা হলে সেই সংজ্ঞাটি কি?

(খ) ঐ সংজ্ঞাটি যা কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে আঁ-হযরত (সাঃ) নির্ধারণ করেছেন এবং স্বয়ং তাঁর কল্যাণময় যুগে উহার প্রয়োগ হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়, তা বাদ দিয়ে পরবর্তী কোনও যুগে অন্য কোন সংজ্ঞা নির্ণয় করা কি কারও পক্ষে জায়েয (সঙ্গত) বলে গণ্য হতে পারে?

(গ) উল্লেখিত সংজ্ঞা ব্যতীত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আলেম কিম্বা ফির্কাসমূহের পক্ষ হতে যদি মুসলমানের অন্য কোন সংজ্ঞা তৈরী করা হয়ে থাকে তাহলে উহা কি? এবং (ক) দফার উল্লিখিত সংজ্ঞার মোকাবেলায় শরীয়ত মতে সেগুলির অবস্থান কি?

(ঘ) হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর যুগে ধর্মত্যাগ (ইর্তেদাদ) সংক্রান্ত ফেৎনার সময়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) অথবা সাহাবাগণ কি আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের যুগের প্রচলিত সংজ্ঞায় কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন ?

(ঙ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে অথবা খোলাফায়ে-রাশেদীনের যুগে কি এমন কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমাটি গ্রহণ ও পঠন এবং অপরাপর চার আরকানে-ইসলাম অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ পালন ও ঈমান আনয়ন সত্ত্বেও কাউকে অ-মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ?

(চ) ইসলামের পাঁচ আরকানের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও কুরআন করীমের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যা কোন ভিন্ন ফির্কার উলেমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় শুধু এই কারণে কাউকে যদি ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত বলে আখ্যা দেয়ার অনুমতি থাকে অথবা অন্যান্য ফের্কার মতে ইসলাম বিরোধী আকীদা পোষণের কারণে যদি কাউকে ইসলাম বহির্ভূত বলে আখ্যা দেয়া যায়, তাহলে ঐসব ব্যাখ্যা এবং আকীদাসমূহ চিহ্নিত করাও জরুরী, যাতে মুসলমানের ইতিবাচক সংজ্ঞার মধ্যে এই দফাটি অন্তর্ভুক্ত করা যায় যে, ইসলামের পাঁচটি রুক্ন সত্ত্বেও যদি কোন ফির্কার আকীদাসমূহের মধ্যে ঐ চিহ্নিত বিষয়সমূহ প্রক্ষিপ্ত হয় তাহলে তাকে ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত বলে নির্ধারণ করা হবে।

(ছ) ইসলামের পাঁচটি রুকনের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও যদি মুসলমান ফির্কাগুলির কুফরী ফতওয়া দেওয়ার এরূপ কোন দুয়ার খুলে দেয়া হয় যার উল্লেখ ঙ-এর দফায় রয়েছে তাহলে ঐ যাবতীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যুক্তি ও ন্যায়-বিচারের দিক দিয়ে জরুরী, যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আলেম নিজেদের ফির্কা ব্যতীত অন্যান্য ফির্কাকে কাফের, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) অথবা ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ কয়েকটি বিষয় নিম্নে দেয়া গেল ঃ

(১) কুরআন মখলুক (সৃষ্ট) না গয়ের মখলুক সংক্রান্ত আকীদা। (আশায়েরা-হানাবেলা)

(২) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে বাশার (মানব) বলে নয় বরং নূর বলে একীন করা। (বেরেলভী)

(৩) আঁ-হযরত (সাঃ)কে নূর বলে নয় বরং বাশার (মানব) বলে বিশ্বাস করা। (আহ্লে হাদীস)

(৪) আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে ঈমান রাখা যে, তিনি হাযের নাযের (সর্বত্র চির উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা) এবং আলেমুল গায়েবও। (বেরেলভী)

(৫) এই ঈমান রাখা যে, পরলোকগত বুযুর্গগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয এবং পরলোকগত বহু আওলিয়ার কাছে প্রার্থনা করলে তারা যে কারও প্রার্থিত ইচ্ছা ও বাসনা পূরণের ক্ষমতা রাখেন। (বেরেলভী)

(৬) এই আকীদা পোষণ করা যে, কুরআন করীম ছাড়া শরীয়তের ক্ষেত্রে অন্য কোন কিছুই নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব সুন্নতে-রসূল (সাঃ) এবং তাঁর হাদীসাবলীর অনুসরণে বাধ্য নই। সেগুলি যতই ধারাবাহিক এবং শক্তিশালী বর্ণনাসমূহের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছুক না কেন। (চকড়ালভী, পারভেজী)

(৭) এই আকীদা পোষণ করা যে, কুরআন করীম ত্রিশ পারায় লিপিবদ্ধ সূরাসমূহ ছাড়াও কিছু সংখ্যক সূরা এরূপও নাযেল হয়েছিল যেগুলিতে হযরত আলী (রাযিঃ)-এর

উল্লেখ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে সূরাগুলি নষ্ট করে দেয়া হয়। অতএব যে কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাযেল হয়েছিল তা সম্পূর্ণাকারে আমাদের নিকট পৌঁছায়নি। (চরমপন্থী শিয়া)

(৮) এই আকীদা পোষণ করা যে, জামাতখানাগুলিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে কোন বুযুর্গের ছবিকে সামনে রেখে মুনাজাত করা জায়েয এবং খোদাকে সম্বোধন না করে সেই বুযুর্গের ছবিকে সম্বোধন করে দোয়া করা জায়েয এবং এই দোয়াই নামাযের স্থলবর্তী। (ইসমাঈলী ফির্কা)

(৯) এই আকীদা পোষণ করা যে, পাক পাঞ্জাতন এবং আরও ছয়জন সাহাবা ছাড়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী প্রথম তিন খলীফা হযরত আবুবকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম আজমায়ীন) সহ সকলেই ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরা সবাই মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। তেমনি এই আকীদা যে, প্রথম তিনজন খলীফাই নাউযুবিল্লাহ্ গাসেব (অন্যের অধিকার হরণকারী) ছিলেন। সেজন্য তাদের সকলের প্রতি তাবাররা (অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ ইত্যাদি দ্বারা ঘৃণা ও অমর্যাদা প্রদর্শন) শুধু জায়েযই নয় বরং জরুরীও বটে। (শিয়া)

(১০) কোন বুযুর্গ সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, খোদা তাঁর মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে হুলুল করেছেন, নেমে এসেছেন। (হুলুলী ফির্কা নামক একশ্রেণীর সুফী)

উপরে উল্লিখিত বিষয়াবলীর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করা এজন্য জরুরী যে, নিশ্চিত ও অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে মুসলমান ফির্কাসমূহের ওলেমা ও মুজতাহেদীন চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত ফতওয়া জারী করে রেখেছেন যে, এমনতর আকীদা বা বিশ্বাস পোষণকারীগণ দীনের অন্যান্য মৌলিক ও জরুরী বিষয়াবলীর উপর ঈমান রাখলেও নিশ্চিত ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত এবং তাদের কুফরী সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণকারীও ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত বলে সাব্যস্ত হবে। (এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ফির্কার আলেমদের পরস্পর বিরোধী কয়েকটি ফতওয়া ৪নং পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

উপরোল্লিখিত প্রশ্নাবলীর আলোকে আমরা জোরালো আবেদন জানাচ্ছি যে, যদি যথার্থরূপে বিচার-বুদ্ধি এবং আদল-ইনসাফের মাত্রা ও চাহিদাসমূহকে দৃষ্টিগোচরে রেখে ইসলামে জামাতে আহমদীয়ার অবস্থান বিষয়ে বিচার বিবেচনা করাই অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে থাকে অথবা ইসলামে 'খাতামান্নাবীঈন' আয়াতের কোন অর্থ ও ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি বা ফির্কার অবস্থান নির্ধারণ করা যদি সত্যিকার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে অবশ্যই এইরূপ মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হোক, যাতে করে প্রতিটি ইসলামবিরোধী আকীদা পোষণকারীর কুফরীকেও যাচাই ও পরিমাপ করা যায়। বস্তুতঃ এরূপ মাপকাঠিতে কোনক্রমেই জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে কোন কিছুই করার অবকাশ নেই। উপরোল্লিখিত সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার অভিমত ও বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো ঃ

প্রথমতঃ জামাতে আহমদীয়ার মতে মুসলমানদের কেবল সেই সংজ্ঞাটিই গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবহার উপযোগী হতে পারে যা কুরআন করীম থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নিকট হতে নিঃসন্দেহে বর্ণিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সেইটির উপরই আমল সাব্যস্ত। এ মূল নীতিটি থেকে সরে গিয়ে মুসলমানের যে সংজ্ঞাই প্রণয়নের চেষ্টা করা হোক তা ত্রুটি মুক্ত হবে না এবং বহু অনিষ্টের কারণ হবে। বিশেষত: পরবর্তী যুগে যখন কিনা ইসলামে ভাগ বিভাগ হতে হতে বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সে সময়ে প্রণীত সংজ্ঞাবলী এজন্যও রদ করার যোগ্য যে, ঐগুলিতে পরষ্পর বিরোধ ও বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। আর তাই একযোগে সবগুলোকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আর কোন একটিকেও অবলম্বন বা বেছে নেয়া এজন্য সম্ভব নয় যে, তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাপর সংজ্ঞাগুলির নিরিখে অমুসলিম বলে সাব্যস্ত হবে। আর এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসা কারো পক্ষেই সম্ভবপর হবে না। বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীর সাহেব আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

"আলেমরা যে সব বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তা খেয়াল করলে আর মন্তব্য করার দরকার হয় না যে, এই মৌলিক ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনও এক আলেমের মতের সঙ্গেই অন্য কোন আলেমের মিল নেই। প্রত্যেক আলেমের মত আমরাও যদি একটা সংজ্ঞা দিতে যাই আর সেই সংজ্ঞা যদি অন্য সব আলেমদের দেয়া সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয় তবে বিনা মতভেদে আমরা ইসলাম বহির্ভূত হয়ে যাই। আর যদি আমরা যেকোন একজন আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি তবে তার মতে আমরা মুসলিম থাকি কিন্তু অন্য সবার মতে আমরা কাফের হয়ে যাই।" *('৫৩ সালে পাঞ্জাবের গোলযোগ সংক্রান্ত তদন্ত আদালতের রিপোর্ট: ২১৮ পৃঃ)*

জাস্টিস মুনীর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এর দ্বারা এ বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের সংজ্ঞা সম্পর্কে উদ্বৃত রায়টি প্রণয়ন অব্দি কখনও এরূপ 'ইজমা' সংঘটিত হয়নি যাতে সালফে-সালেহীন (বিগত বুযুর্গানে উম্মত) -এর সনদ লাভ হয়। অতএব আজ যদি বাহ্যতঃ সকলের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত কোন সংজ্ঞা পেশ করা হয়, তাহলে ওটাকে উম্মতের সর্বসম্মত সংজ্ঞা বলে কখনও সাব্যস্ত করা যাবে না। বস্তুতঃ ওটা সালফে-সালেহীনের সনদবিহীন হবে, তাদের সমর্থিত সংজ্ঞা হবে না।

অতএব জামাতে আহমদীয়ার অভিমত হলো এই যে, সাংবিধানিক ও আইনানুগভাবে মুসলমানের কেবল ঐ সংজ্ঞাই গ্রহণ করা হোক যা হযরত খাতামুল আম্বীয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ সেটিই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মহিমান্বিত চার্টার বা বিশ্ব মুসলিমের জন্য এক অভিন্ন দলিলের মর্যাদা রাখে। এর জন্য আমরা তিনটি হাদীসে নববী (সাঃ) পেশ করছি ঃ

১। হযরত জিব্রীল (আঃ) মানুষের বেশে আঁ-হযরত (সাঃ) -এর দরবারে আসলেন এবং হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

" يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ: اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا. قَالَ صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْئَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ: فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ "

(مسلم كتاب الايمان)

٢ ۔" جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوٰتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ "

(صحیح بخاری کتاب الایمان جلد ۱ صا۱ مصری)

১ নং হাদীসটির তরজমা ঃ "হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞাত করুন। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রসূল। আর তুমি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখ এবং পথের সঙ্গতি থাকলে তুমি বায়াতুল্লাহ্‌র হজ্জ পালন কর। সে ব্যক্তি বল্‌ল, হুযুর যথার্থই বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা তার ব্যাপারে অবাক হলাম যে, সে প্রশ্নও করে আবার উত্তরের সত্যায়নও করে। তারপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। হুযুর (সাঃ) বললেন, ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ্‌তে ঈমান আন, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আন, তাছাড়া পরকালে ঈমান আন এবং কাযা ও কদর সম্পৃক্ত ভাল ও মন্দের উপরও ঈমান আন। সে ব্যক্তি বল্‌ল যে, আপনি সঠিক বলেছেন।" *(মুসলিম ঃ কিতাবুল ঈমান)*

২নং হাদীসের তরজমাঃ "নাজদবাসীদের মধ্যে এলোমেলো কেশধারী এক ব্যক্তি হুযুর (সাঃ)-এর কাছে হাজির হলো। আমরা তার কথার অস্পষ্ট শব্দ তো শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারছিলাম না। যখন সে ব্যক্তি নিকটতর হল, তখন বুঝা গেল যে, সে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। হুযুর (সাঃ) বললেন, দিবারাত্রিতে পাঁচ ওক্তের নামায নির্দিষ্ট আছে। সে বল্‌ল, ঠিকই পাঁচ ওক্তের নামায নির্দিষ্ট আছে। সে প্রশ্ন করল, এই পাঁচ বারের নামায ছাড়া আরও কি নামায আছে? হুযুর (সাঃ) জবাবে বল্‌লেন, নেই, তবে তাছাড়া যা তুমি নফলস্বরূপ আদায় করতে চাও। হুযুর (সাঃ) আরও বল্‌লেন, রমযানের রোযা রাখ। সে জিজ্ঞেস করল, রমযানের রোযা ব্যতীত আরও রোযা কি ফরয আছে? হুযুর (সাঃ) বল্‌লেন, নেই, তাছাড়া তুমি স্বেচ্ছায় যে রোযা রাখ। তারপর হুযুর (সাঃ) তার সামনে যাকাতের উল্লেখ করলেন। সে প্রশ্ন করল, এ ছাড়াও কি কিছু আছে? হুযুর (সাঃ) উত্তরে বল্‌লেন, নেই, তাছাড়া তুমি যা স্বেচছায় আদায় কর। সে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে বিদায়কালে বলেছিল যে, খোদার কসম! আমি এ সকল আদেশের অতিরিক্ত কিছুই করব না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বল্‌লেন, যদি সে নিজের কথায় সত্য সাব্যস্ত হয় তাহলে নিশ্চয় সফলকাম হবে।" *(সহীহ বুখারীঃ কিতাবুল ঈমান, প্রথম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা মিসরী ছাপা)*

৩। আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন ঃ

۳ - " مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ "

(بخاری جلد اوّل باب فضل استقبال القبلة)

- "যে ব্যক্তি নামায আদায় করে যেরূপে আমরা আদায় করি,সেই কিবলার দিকে মুখ করে যে দিকে আমরা করি এবং আমাদের যবাই করা মাংস খায় সে-ই মুসলমান, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে ধোকাবাজি করো না। *

---

* হাদীসটির উক্ত তরজমা জনাব আবুল আলা মওদূদী সাহেবের পুস্তিকা "দস্তুরী সুফারিশাত পর তনকীদ" পৃষ্ঠা ১৪ও১৫ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত হাদীসটির তরজমা উর্দ্দু ভাষায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

" جس شخص نے وہ نماز ادا کی جو ہم کرتے ہیں۔ اُس قبلہ کی طرف رُخ کیا جس کی طرف ہم رُخ کرتے ہیں اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اُس کے رسُول کا ذمّہ ہے۔ پس تم اللہ کے دئے ہوئے ذمّے میں اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرو۔"

আমাদের পবিত্র নেতা ও প্রভু সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইহা এক অসামান্য বদান্যতা যে, এই সংজ্ঞাটির দ্বারা আঁ- হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত সারগর্ভ ও ব্যাপক এবং সার্বজনীনরূপে ইসলামী জগতের ঐক্যবদ্ধতার আন্তর্জাতিক ভিত্তি রেখে গেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমান সরকারের অবশ্য কর্তব্য এ ভিত্তিটিকে নিজেদের আইনের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দান করা। নচেৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের বন্ধন চিরতরে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়বে এবং ফেৎনা ও বিশৃংখলার দ্বার কখনও বন্ধ করা যাবে না। ইসলামের প্রারম্ভিক তিন শতাব্দীর পর বিগত এগার শতাব্দীব্যাপী সমসাময়িক বিভিন্ন আলেম নিজেদের মনগড়া সংজ্ঞাসমূহের আলোকে কুফরীর যেসব ফতওয়া জারী করেছেন সেগুলির দ্বারা এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন একটিও শতাব্দীর বুযুর্গানে-দীন, ওলামায়ে কেরাম, সুফীয়া এবং আওলিয়া বা ওলী-আল্লাহ্‌র ইসলামও ঐ সকল সংজ্ঞানুযায়ী রক্ষা পায়নি এবং কোন একটি ফির্কা এইরূপ পেশ করা যায় না যাদের কাফের হওয়া অন্য কোন কোন ফির্কার কাছে স্বীকৃত নয়। (এতদ্‌সঙ্গে পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য)।

কুফরী ফতওয়াসমূহের মূল্যায়ন

এখানে এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, এই সব ফতওযার অবস্থান বা মর্যাদা কি এবং কোন আলেমে-দীন ব্যক্তিগত পদমর্যাদায় অথবা নিজের ফির্কার প্রতিনিধিত্বে অপর কোন ব্যক্তি বা ফির্কার বিরুদ্ধে ফতওয়া দিবার বৈধ ক্ষমতার অধিকারী কি না? আর এই ধরনের ফতওয়াসমূহের দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্‌র সামগ্রিক অবস্থা ও মর্যাদার উপর কি রকম প্রভাব পড়ে। জামাতে আহমদীয়ার বিবেচনা মতে এই ধরনের ফতওয়াসমূহের মূল্য এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, কোনো কোনো আলেমের দৃষ্টিতে কোনো কোনো আকীদা বা বিশ্বাস এমনই পর্যায়ের ইসলাম বিরোধী যে, ঐ সকল আকীদা বা বিশ্বাসের ধারক ও বাহক আল্লাহতা'লার দৃষ্টিতে কাফের বলে সাব্যস্ত হয় এবং কিয়ামত দিবসে তার পুনরুত্থান (হাশর-নশর) মুসলমানদের মধ্যে হবে না। এদিক দিয়ে এই ফতওয়াগুলি ইহলোকে কেবল এক প্রকার সতর্কতামূলক সাবধানবাণীর 'মর্যাদা' রাখে। জাগতিক ব্যাপারে যদ্দুর সম্পর্ক সেদিক থেকে এগুলোকে কোন ব্যক্তি বা ফির্কাকে মুসলিম উম্মাহ্‌র সামগ্রিক গণ্ডি হতে বহির্ভূত করার উপযোগী বৈধ ক্ষমতার অধিকারী বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে না। এ ব্যাপারটি বস্তুতঃ খোদা ও বান্দার মাঝে এবং এর প্রসঙ্গে ফয়সালা কিয়ামতে বিচার-দিবসেই হতে পারে। দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে ঐ সকল ফতওয়ার প্রয়োগ মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য ও সংহতির জন্য মারাত্মক সাব্যস্ত হতে পারে। বস্তুতঃ কোন ফির্কার আলেমদের ফতওয়ার প্রেক্ষিতে অন্য কোন ফির্কা বা ব্যক্তিকে ইসলামধর্ম থেকে খারিজ (বহির্ভূত) বলে সাব্যস্ত করা যায় না।

কোন একটি ফির্কার কুফরী সম্পর্কে বাদ বাকী সকল ফির্কার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের গণ্ডি হ'তে সে ফির্কাটির বহিষ্কার বৈধ বলে যদি ধরা যায় তবে এ অভিমত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। কারণ উলামার পরস্পর বিরোধী ফতওয়া মতে মুসলমানদের প্রতিটি ফির্কার মধ্যেই কিছু না কিছু আকীদা-বিশ্বাস এমন ধরনের পাওয়া যায়, যেগুলির সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক ফির্কার ঐক্যমত রয়েছে যে, ঐ সকল আকীদার ধারক ও বাহক ব্যক্তি বা ফির্কা ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত। বাস্তবে এই পরিস্থিতি আল্লাহ্ প্রেরিত ন্যায়- বিচারক মীমাংসাকারী حکم و عدل - কে চায়।

ধর্মীয় কোন মতভেদের কারণে ও ভিত্তিতে যদি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে অন্যান্য সমস্ত ফির্কার ঐক্যমত সম্ভবও হয় তাহলে অনাগত ভবিষ্যতে শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের কোন কোন বিশেষ আকীদা বিশ্বাসের কারণে ও ভিত্তিতে অনুরূপ হওয়া সম্ভব হবে। তেমনি আহলে কুরআন যারা চকড়ালভী বা পারভেজী নামে পরিচিত, তাদের ব্যাপারেও অনুরূপ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বস্তুতঃ আহ্লে-হাদীস; ওহাবী বা দেওবন্দীদের কতিপয় আকীদার ব্যাপারে অন্যান্য ফির্কার আলেমদের ঐকমত্য কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। অতএব বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ('সওয়াদে-আযম') একটা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক ব্যাপার। কোন একটি ফির্কাকে যদি বিশেষভাবে লক্ষ্যস্থল করা হয় তাহলে সে'টির মোকাবেলায় অন্যান্য সকল ফির্কা 'সওয়াদে-আযম'-এর রূপ ধারণ করে ফেলবে। আর এমনি ধারায় পালাক্রমে প্রত্যেকটি ফির্কার বিরুদ্ধেই অবশিষ্ট ফির্কাগুলোর সমন্বয়ে 'সওয়াদে-আযমে'র কুফরী ফতওয়া সাব্যস্ত হতে থাকবে।

আমাদের বিবেচনায় এই সব ফতওয়া কেবল ধর্মের বাহ্যিক স্থূলবিষয় সর্বস্ব ছাড়া কিছু নয়। সাক্ষাৎভাবে এগুলোকে জান্নাতের সনদ অথবা জাহান্নামের ওয়ারেন্ট বলে নির্ধারণ করা যায় না। ইসলামের হাকীকাত তথা এর প্রকৃত স্বরূপ ও মূলতত্বের যদ্দুর সম্পর্ক সে দিক থেকে আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় প্রকৃত মুসলিমের সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করছি ঃ-

"ইসলামের যে পরিভাষাগত অর্থ সে দিকে এ আয়াতে করীমায় ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ, মুসলমান সে, যে খোদাতা'লার পথে নিজের সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ করে দেয়। অর্থাৎ নিজের সত্তাকে আল্লাহ্তা'লার জন্য, তাঁর ইচ্ছাসমূহের অনুবর্তিতার জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে উৎসর্গ করে দেয়। আর তারপর সৎকার্যাবলীতে খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যায় এবং নিজের অস্তিত্বের যাবতীয় ব্যবহারিক

ক্ষমতাগুলিকে তাঁর পথে নিয়োজিত করে। মোদ্দা কথা এই যে, সে বিশ্বাস ও কর্মে কেবল খোদাতা'লার হয়ে যায়।

বিশ্বাসের দিক দিয়ে সে নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে প্রকৃতপক্ষে এরূপ এক বস্তু বলে মনে করে যা খোদাতা'লার সনাক্ত, পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য, তাঁর প্রেম ও ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর কর্মের দিক দিয়ে সে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রকৃত পুণ্যসমুহ যা প্রত্যেক শক্তি ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত এবং খোদাপ্রদত্ত প্রত্যেক তওফীকের সাথে বিজড়িত সব ধরনের পুণ্যকর্ম পালন করে এত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, যেন সে তার আজ্ঞানুবর্তিতার দর্পণে নিজের উপাস্যের চেহারা দর্শন করছে।

এখন উল্লিখিত পবিত্র আয়াতে গভীর দৃষ্টিপাতে প্রত্যেক সরল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন যে, ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপ কারও ক্ষেত্রে তখনই সাব্যস্ত হতে পারে যখন তার সত্তা উহার 'বাতেনী' (অভ্যন্তরীণ) ও 'যাহেরী' (বাহ্যিক) যাবতীয় শক্তিসহ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই পথে উৎসর্গীকৃত হয় এবং খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তাকে যেসব আমানত দান করা হয়েছে তা যেন সে আবার সেই প্রকৃত দাতার নিকট প্রত্যার্পণ করে দেয়। কেবল আকীদাগতভাবেই নয় বরং কর্মের দর্পণেও সে যেন তার ইসলাম এবং উহার প্রকৃত তত্ত্বের পূর্ণ স্বরূপকে দেখিয়ে দেয় অর্থাৎ ইসলামের দাবীদার ব্যক্তি ইহা সপ্রমাণ করে যে, তার হাত, পা, হৃদয়, মস্তিষ্ক, তার বুদ্ধি, বিবেচনা বোধ ও মেধা, তার ক্রোধ, দয়া-মায়া, সংযম ও সহনশীলতা, তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তথা তার যাবতীয় আত্মিক ও দৈহিক শক্তি ও ক্ষমতা তার সম্মান-সম্ভ্রম, তার ধন-সম্পদ, তার সুখ, আরাম ও আনন্দ, তার মাথার চুল থেকে নিয়ে তার পায়ের নখ পর্যন্ত তার যাহের ও বাতেনের দিক থেকে যা কিছু আছে, এমন কি তার নিয়্যত, তার মনের ভাব ও ধ্যান-ধারণা এবং তার আত্মার অনুভূতি ও উচ্ছ্বাস সবই খোদাতা'লার ঐরূপে অধীন ও অনুবর্তী হয়ে পড়েছে, যেরূপে এক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার অধীন ও অনুবর্তী হয়ে থাকে। মোট কথা, যেন প্রমাণ হয়ে যায় যে, 'সিদ্‌কে-কদম' (আনুগত্য ও নিষ্ঠা) ঐ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তার যা কিছু আছে তা যেন তার নয় বরং খোদাতা'লার হয়ে গেছে এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র সেবায় এমনই আত্মনিয়োজিত হয়ে পড়েছে যেন সেগুলি আল্লাহ্‌তা'লারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

অধিকন্তু, এ আয়াতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে যে, খোদাতা'লার পথে জীবন ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করা, যা ইসলামের মূল তত্ত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ - তা হচ্ছে দুই প্রকারের ঃ এক, খোদাতা'লাকেই স্বীয় উপাস্য, লক্ষ্য, কাম্য ও প্রিয় বলে নির্দিষ্ট ও সাব্যস্ত করা এবং তাঁর ইবাদত ও উপাসনা, তাঁর প্রীতি ও ভালবাসা, ভয়ভীতি ও কামনা-বাসনায় অন্য কাউকে অংশীদার না করা এবং তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা (তস্‌বীহ), ইবাদত ও

উপাসনার যাবতীয় রীতি-নীতি, নিয়ম-বিধান, আদেশ-নির্দেশ ও খোদা নির্ধারিত সীমাসমূহ এবং 'ঐশী কাযা ও কদর' (নিয়তি)-এর ব্যাপারাদি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নেয়া এবং পরম আত্মবিলীনতা ও চরম বিনয়ের সাথে ঐ যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ, বিধি-বিধান এবং সীমা ও তক্দীরসমূহকে পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে মাথা পেতে নেয়া। আর তেমনি ঐ যাবতীয় পবিত্র সত্য ও পবিত্র তত্ত্বাবলী- যা তাঁর ব্যাপক ও বিশাল কুদরতের পরিচিতির উপায় স্বরূপ এবং তাঁর সার্বিক কর্তৃত্ব, শাসন ও রাজত্বের উচ্চ শান ও মর্যাদাকে জানার জন্যে এক সূত্র ও মাধ্যম স্বরূপ এবং তার কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজীকে বুঝার জন্যে এক শক্তিশালী পথ নির্দেশিকা স্বরূপ, তা সম্যকরূপে জেনে নেয়া।

আল্লাহতা'লার পথে জীবন ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করার দ্বিতীয় প্রকারটি হলো, তাঁর বান্দাদের ও সৃষ্টজীবের যত্ন ও সেবা, সহানুভূতি ও সাহায্যের উপায়াদির অন্বেষা, তাদের (দুঃখ-কষ্টের) ভারবহন এবং সত্যিকারভাবে দুঃখ মোচনে নিজের জীবনকে ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করা। অপরকে সুখ ও আরাম দেয়ার জন্যে নিজে কষ্ট স্বীকার করা এবং দুঃখ বরণ করা।

এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের 'হাকীকত' বা মৌলিক তত্ত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ অতি উচ্চ ও উৎকৃষ্ট মানের এবং কোন মানুষ কখনও এই সুমহান উপাধি- 'আহলে ইসলাম' তথা 'মুসলিমের' দ্বারা যথার্থরূপে ভূষিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে উহার যাবতীয় সার্বিক ক্ষমতা, শক্তি ও ইচ্ছা-কামনা সহ খোদাতা'লার নিকট সমর্পণ করে, এবং নিজের আমিত্ব ও অহমিকা এবং এর যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াদি হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তাঁরই পথে আত্মনিয়োজিত হয়ে না পড়ে।

অতএব, বস্তুতপক্ষে তখনই কাউকে মুসলমান বলা যাবে যখন তার উদাসীন জীবনের উপর ভীষণ এক বিপ্লব উপস্থিত হয়ে তার কুপ্ররোচণাকারী আত্মা (নফ্সে আম্মারাহ্)-এর অস্তিত্বের চিহ্ন উহার যাবতীয় ভাবাবেগসহ সম্পূর্ণ মুছে যায়, আর এই মৃত্যুর পর "মুহ্সিন লিল্লাহ্" (আল্লাহ্র তরে পুণ্যানুষ্ঠানকারী) হওয়ার দরুন তার মধ্যে নবজীবনের উন্মেষ ঘটে। বস্তুতঃ উহা এরূপ এক পবিত্র জীবন, যার মধ্যে স্রষ্টার আনুগত্য ও সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

স্রষ্টার আনুগত্য এইরূপে যে, তাঁর সম্মান ও প্রতাপ এবং একত্বের নামকে সঞ্জীবিত করার নিমিত্তে আনুগত্যকারী সহস্র মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয় এবং তাঁর ফরমাঁবরদারী ও আজ্ঞানুবর্তিতায় তার একটি হাত অপরটিকে সানন্দে কর্তন করতে পারে এবং তাঁর আদেশাবলীর সম্মান ও মাহাত্ম্যের প্রীতি ও ভালবাসা এবং তাঁর তুষ্টি লাভের পিপাসা তার মধ্যে পাপের প্রতি এরূপ ঘৃণার সৃষ্টি করে দেয় যে, তা যেন ভস্মকারী এক আগুন বা ধ্বংসকারী এক বিষস্বরূপ অথবা প্রজ্জ্বলনকারী এক বিজলী তুল্য, যার কাছ থেকে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে পলায়ন করা উচিত। মোট কথা, তাঁর

ইচ্ছা মান্য করার উদ্দেশ্যে সে নিজের আত্মার যাবতীয় বাসনা-কামনাকে জলাঞ্জলি দেয় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাণঘাতী জখমে জর্জরিত হওয়া বরণ করে নেয় এবং তাঁর সাথে সম্পর্কের প্রমাণ রাখার জন্যে যাবতীয় প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনামূলক সম্পর্কাবলীকে ছিন্ন করে দেয়।

আর আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা এইভাবে (পালন করবে) যে, সৃষ্টজীবের যত ধরনের যে পরিমাণ প্রয়োজনাদি আছে, যতভাবে যে পরিমাণ বিভিন্ন কারণে ও পন্থায় অনাদি ও অনন্ত দাতা ও অনুগ্রহরাজী বিতরণকারী খোদা সৃষ্টির কতককে কতকের মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন-ঐ সমূদয় বিষয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্তা'লার উদ্দেশ্যে ও তাঁর তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের প্রকৃত, নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ, সত্যিকার, খাঁটি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার দ্বারা–যা তার পক্ষে সাধিত হওয়া সম্ভবপর, তাদেরকে উপকৃত করে এবং প্রত্যেক সাহায্য-মুখাপেক্ষীকে খোদাপ্রদত্ত নিজের শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা সাহায্য প্রদান করে এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কল্যাণ, সংশোধন ও উন্নয়নের পক্ষে জোর প্রচেষ্টা চালায়।

অতএব, এই মহান আল্লাহে্ নিবেদিত আনুগত্য ও সেবা, যা প্রেম ও ভালবাসায় সিক্ত, এবং আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ সারবত্তা ও বাস্তবতায় ভরপুর, ইহাই ইসলাম এবং ইসলামের মূল তত্ত্ব ও স্বরূপ এবং ইসলামের সারবত্তা, যা হাসিল হয় নিজসত্তা, সমগ্রসৃষ্টি ও প্রবৃত্তির তাড়না-বাসনা এবং স্বকীয় ইচ্ছা-কামনার মৃত্যুবরণ করার পর।" (আয়না-এ-কামালাতে ইসলামঃ পৃঃ ৫৭-৬৭)

খাতামুন্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মাকাম ও মর্যাদা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ রচনাবলী থেকে

খতমে নবুওয়ত অস্বীকার সংক্রান্ত অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণঃ

"আমাদের ধর্মের সারসংক্ষেপ এবং নির্যাস হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। আমরা ইহলৌকিক জীবনে যে বিশ্বাস পোষণ করি এবং যা নিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে এই নশ্বর জগৎ হতে প্রস্থান করব, তা হলো, আমাদের নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন 'খাতামান্নাবীঈন' এবং খায়রুল মুরসালীন, যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই পুরস্কার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে যদ্বারা মানুষ সত্য পথ গ্রহণ করে খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে ।" (ইযালা-এ-আওহাম)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাউযুবিল্লাহ্ "খাতামান্নাবীঈন" আয়াতকে অস্বীকার করে এবং আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামান্নাবীঈন বলে স্বীকার করে না– এ অভিযোগ বা দোষারোপটি সংশয়াতীতরূপে ভ্রান্ত, সত্যের প্রকাশ্য অপলাপ এবং স্বপ্রণোদিত নির্জলা মিথ্যা রটনার নামান্তর। অদ্ভুত ব্যাপার, অবাক লাগে যে, এ দোষারোপটি মুসলমানদের সকল ফির্কার মধ্য থেকে এরূপ একটি জামা'তের উপর আরোপ করা হয়, যারা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, কুরআন করীমের কোন একটি আয়াত তো দূরের কথা কোন বিন্দু বিসর্গও মনসুখ (রহিত) নয়। অথচ এর বিপরীতে অন্যান্য ফির্কার আলেমদের মতে কুরআন হাকীমের কতিপয় আয়াতের দ্বারা কতিপয় আয়াত রহিত হয়ে গেছে, এবং এখন ওগুলির দৃষ্টান্ত এমনই যেমন মানব দেহে এপেন্ডিক্স। তারপরও কি অবাক হবারই ব্যাপার নয় যে, কুরআন করীমের মধ্যে পাঁচ থেকে পাঁচশ'টি আয়াত মনসুখ বলে বিশ্বাসী ফির্কাসমূহ এরূপ এক ফির্কার উপর কুরআন করীমের কোনও আয়াতকে অস্বীকার করার ইলযাম (আপত্তি) লাগাচ্ছে, যে জামা'ত পাঁচ তো দূরের কথা, একটি আয়াতের কোন একটি বিন্দুও রহিত হওয়া স্বীকার করে না।

ناطقہ سر بگریباں کہ اِسے کیا کہئے (অর্থাৎ, আশ্চর্য! এ অর্বাচীনদের কি বলা যাবে!)

জবরদস্তি ও অবৈধ চাপ প্রয়োগ মাস্তানী ছাড়া এটাকে আর কি বলে অভিহিত করা যেতে পারে? যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ হতে জোর দিয়ে বলা হয় যে, আমাদের আকীদা– দৃঢ়বিশ্বাস এটা বৈ আর কিছুই নয় এবং বার বার আমাদেরকে

আহ্‌মদীয়া সিলসিলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার পক্ষ থেকে জোরালোভাবে তাকিদপূর্ণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন খোদাতা'লার সর্বশেষ এবং পরিণত ও পরিপূর্ণ কিতাব এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর আখেরী ও পূর্ণতম রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন, তখন বিরুদ্ধবাদী আলেমদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জবাব দেয়া হয় যে, তোমরা একথা বলা সত্ত্বেও কোন না কোন অর্থে নবী আসার সম্ভাবনা আছে বলে মনে কর। অতএব, এ আয়াতটির মর্মার্থকে অস্বীকার কর। কার্যতঃ আয়াতটিরই অস্বীকারকারী বলে তোমরা গণ্য হও।

জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের এই সেই বড় রকমের ধাক্কা, যার দ্বারা তারা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তকে ইসলামের গণ্ডি হতে বাইরে ঠেলে দেয়ার সংকল্প নিয়ে দন্ডায়মান হয়েছেন। আসুন, একটু ঠাণ্ডা মাথায় স্থির চিত্তে এই ইলযামটির প্রকৃত স্বরূপ নিরীক্ষণ করে দেখি, এবং গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ বিষয়টির ফয়সালা করি যে, এই দোষারোপকারীগণ কতটুকু ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যাশ্রয়ী। অথবা, আবার এমন তো নয় যে, এরা নিজেরা নিজেদেরই আরোপকৃত ইলযামের আওতায় ও আঘাতের মধ্যে এসে পড়ছেন, এবং তারা বাস্তবে এ আয়াতটির অস্বীকারকারী হিসেবে আখ্যায়িত হবার উপযুক্ত সাব্যস্ত হচ্ছেন?!

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের অভিমত (Stand) হলো এই যে, আমরা খাতামান্নাবীঈন আয়াতের ঐ সব অর্থের উপরই ঈমান রাখি, যা কুরআন ও হাদীস, সালফে সালেহীনের 'ইজমা' (উম্মতের বিগত সর্বমান্য রব্বানী আলেম ও ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত) ও আরবী ভাষার বাগধারা এবং আরবী অভিধান ও ব্যাকরণসম্মত। আমরা এ আয়াতের আক্ষরিক তরজমা ও অর্থের উপরও ঈমান রাখি এবং এর আসল ও মৌলিক অর্থের উপরও ঈমান রাখি। এ সবের সারকথা হলো এই যে, আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কামেল– পূর্ণতম, নবীদের মোহর এবং নবীদের শোভা ও সৌন্দর্য। নবুওয়তের কামালাত– গুণ ও বৈশিষ্ট্যরাজীর তাঁর মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটেছে (কামালাতের শেষ ও শীর্ষ পর্যায়ে তিনি পৌঁছেছেন) এবং প্রত্যেক প্রকারের ফযিলত (ঐশী কল্যাণ ও গৌরব) লাভের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে দেয়া হয়েছে। তাঁর শরীয়ত অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কার্যকারিতা ও কর্তৃত্ব কিয়ামতকাল অব্দি চলতে থাকবে এবং দুনিয়ার প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হতে থাকবে। প্রতিটি মানুষ উহা মানতে বাধ্য থাকবে। এমন কেউ নেই, যে এই শরীয়তের এক কণা পরিমাণও রহিত করতে পারে, বা কোনও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে। অতএব, তিনি আখেরী শরীয়তের ধারক ও বাহক রসূল এবং আখেরী ওয়াজেবুল-ইতায়াত (অবশ্য-মান্য) নেতা ও নবী বটেন। তিনি পূর্ববর্তী সব নবীদের অবসানকারী (খতমকারী) – ইহলৌকিক জীবনের দিক দিয়েও এবং আধ্যাত্মিক জীবনের (কল্যাণ প্রবহমানতার) দিক দিয়েও। তাঁর এই খাতামিয়াতের আঘাত হতে কোন নবী কোনও দিক দিয়ে বাঁচতে পারেন না। তাঁর আবির্ভাবের পর আর সম্ভবই নয় যে, কোন পূর্ববর্তী নবী দৈহিকরূপে তাঁর সমসাময়িকতায় বেঁচে থাকে, আর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে

ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় পরলোকগমন করেন যে, অন্য কোন নবী দৈহিকভাবে জীবিত থেকে, (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে দৈহিক দিক দিয়ে নিঃশেষ হতে দেখার পরে মৃত্যুবরণ করে।

মৌলিক অর্থেও তিনি (সাঃ) সকল নবীদের অবসানকারী। কেননা ইহা সম্ভব নয় যে, কোন পূর্ববর্তী নবীর ফয়েয ও কল্যাণ তাঁর আবির্ভাবের পর জারী থাকে এবং তা কোনও মানুষকে নিম্নতম রূহানী দর্জা ও মর্তবায় উন্নীত করতে পারে। বস্তুতঃ তিনি (সাঃ) অন্যান্য সকল নবীর কল্যাণ-ধারা বিচ্ছিন্নকারী, কিন্তু স্বীয় ফয়েয ও কল্যাণ কিয়ামতকাল ব্যাপী জারী থাকবে এবং যে সব পুরস্কার পূর্ববর্তী নবীদের অনুবর্তিতায় মানুষ পেয়ে থাকতো তা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় কিয়ামতকাল অব্দি একমাত্র তাঁরই কওসার হতে মানুষকে প্রদান করা হবে। মোট কথা, আমরা শাব্দিক এবং মৌলিক উভয় অর্থে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীঈন বলে স্বীকার করি। আর আদবের সঙ্গে এ অপ্রিয় সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পাচ্ছি যে, আমাদের তাবৎ বিরুদ্ধবাদী ফির্কার উলামা আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে এই উভয় অর্থে খাতামান্নাবীঈন স্বীকার করেন না। 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সব নবীদের অবসানকারী' বলা সত্ত্বেও তারা এই স্ব-বিরোধপূর্ণ ঈমান রাখেন যে, আঁ-হুযুর (সাঃ) নাউযুবিল্লাহ হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে না তো দৈহিকভাবে শেষ করতে পেরেছেন, না রূহানী ভাবে। তাঁর আবির্ভাবকালে তাঁদের মতে ঈসা নবী দৈহিকরূপেই জীবিত ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় হযরত ঈসা তাঁর (সাঃ) জীবদ্দশায় শেষ হলেন না! তিনি (সাঃ) নিজে মৃতুবরণ করলেন কিন্তু ঈসা (আঃ) জীবিত থেকে গেলেন! আর এখন তো তাঁর মৃত্যুকাল থেকেও চৌদ্দশ' বছর পার হতে চলেছে, কিন্তু এখনও ইসরাঈলী নবী ঈসা জীবিত চলে আসছেন! একটু ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের আলোকে বলুন, 'খাতাম' শব্দের দৈহিক (স্থুল) অর্থের দিক দিয়ে 'হায়াতে মসীহ'র আকীদা পোষণকারীদের মতে উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কে 'খাতাম' خاتم সাব্যস্ত হলেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম, না ঈসা (আঃ)?

আবার এ সকল উলামাই রূহানী দিক দিয়েও কার্যতঃ মসীহ নাসেরী (আঃ)-কেই 'খাতাম' خاتم বলে স্বীকার করছেন। কেননা তারা ঈমান রাখেন যে, আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ঐশী কল্যাণ সঞ্চারের দিক দিয়েও মসীহ নাসেরীর (আঃ) ঐশী কল্যাণ-ধারাকে খতম করতে পারলেন না! অপরাপর নবীদের ফয়েয তো পূর্বেই নিঃশেষিত হয়েছিল এবং মুক্তির অন্যান্য সব পথই বন্ধ ছিল, কেবল এক মসীহ নাসেরীই জীবিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর ফয়েযের পথ রুদ্ধ হলো না! শুধু তাই নয়, বরং তাঁর ফয়েয বিতরণের শক্তি তো পূর্বাপেক্ষাও অধিক বেড়ে গেল। ঐ সময়ে যখন উম্মতে মুহাম্মদীয়া আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান পবিত্রকরণ শক্তি (কুওয়াতে কুদসীয়া) সত্ত্বেও ভয়াবহ ও মারাত্মক রূহানী ব্যধিসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়লো এবং অসংখ্য রকমের আধ্যাত্মিক রোগ-বালাই তাদের ঘিরে ফেলল, তখন সরাসরি আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কুওয়াতে-কুদসীয়া

তো মুসলিম উম্মাহ্‌কে রক্ষা করতে পারলো না। বরং বনী ইসরাঈলের একজন নবীর 'মসিহী' ফুৎকার তাদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করবে! এক নতুন রূহানী জীবন দান করবে! "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।" ইহাতে কি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে না যে, 'হায়াতে মসীহ্‌'র আকীদার ধারক ও বাহকগণ আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ঐশী ফয়েয বিতরণের দিক দিয়েও সকল নবীদের অবসানকারী বলে বিশ্বাস করেন না ? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, সেই একজন ইস্রাঈলী নবী যিনি এখনও জীবিত আছেন তাঁর ঐশী কল্যাণ সঞ্চারের শক্তিকেও তিনি (সাঃ) খতম করতে পারেন নি! বরং নাউযুবিল্লাহ্‌ ঐ ইসরাঈলী নবী যিনি আখেরী যুগে আকাশ থেকে নেমে আসার পর মৃত্যুবরণ করবেন, তিনিই উম্মতে-মুহাম্মদীয়ার সর্বশেষ আধ্যাত্মিক কল্যাণকারী ও ত্রাণকর্তারূপে সাব্যস্ত হবেন!

গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়ে এবং উভয় অর্থেই হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'খাতামুন্নাবীঈন' বলে ধরে নেয়া হচ্ছে না কি? এতে কি আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি খোলাখুলি অমর্যাদা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা হচ্ছে না? এরূপ আকীদা 'খাতামান্নাবীঈন' আয়াতের মর্মমূলে অন্তর্ঘাত নয় কি? এর মর্মার্থকে বিকৃত ও সাবোটাজ করা হচ্ছে না কি? তার পরেও এই দাবী যে, 'আহমদীরা খাতামান্নাবীঈনের অস্বীকারকারী এবং আমরা হলাম খাতামান্নাবীঈনে বিশ্বাসী ও হেফাযতকারী!" দুনিয়া থেকে কি আদল-ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার একেবারেই উঠে গেছে? বিচার-বুদ্ধির সকল মাত্রা ও চাহিদাকে কি শিকোয় তুলে রাখা হবে? এ বিবাদটি কি আদল ও ইনসাফের দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে না? শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কি সত্য-মিথ্যা এবং পারলৌকিক নাজাতের ফয়সালা চলবে? খোদা না করুন। খোদাতা'লা যেন এমনটি কখনও না করেন। কিন্তু এমনি যদি হয়, তাহলে আবার তাক্‌ওয়া ও আল্লাহ্‌-ভীরুতার দাবী কেন? কেন এটাকে জঙ্গলের কানুন বলা হয় না? কেন এই বে-ইনসাফী ও অবিচারের জন্যে আল্লাহ্‌ ও রসূলের পবিত্র নাম ব্যবহার করা হয়? ধূসর প্রান্তরের নাম ভাল কিছু রাখলেও রাখতে পারেন, মরুভূমি কিন্তু মরুভূমিই থেকে যাবে।

আমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা শর্তহীনভাবে, পরিষ্কার ও সম্পূর্ণরূপে আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী বলে স্বীকার কর না এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে একজন উম্মতি ও যিল্লি নবীর আসার পথ বের করে নাও। আর এইরূপে খতমে-নবুওয়তকে ভঙ্গকারী হয়ে পড়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এরূপ এক উম্মতি নবীর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতে আবির্ভূত হওয়া, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কামেল গোলাম - পরিপূর্ণ অনুগত দাস এবং নিজের সার্বিক রূহানী মার্গ ও মর্তবার ক্ষেত্রে আপাদ-মস্তক তাঁরই (সাঃ) আধ্যাত্মিক ফয়েয ও কল্যাণে ভূষিত – এরূপ উম্মতি নবীর আগমন কখনও 'খাতামান্নাবীঈন' আয়াতের মর্মবিরোধী নয়। কেননা আত্মবিলীন ও সর্বাঙ্গীণ

দাসকে তার প্রভু হতে পৃথক করা যায় না। আমাদের উপরে এ দায়ভার অবশ্য বর্তায় যেন আমরা নিজেদের এই বক্তব্য ও অভিমতকে কুরআনে-হাকীম থেকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ থেকে, বুযুর্গানে-উম্মতের কওল ও উক্তি থেকে এবং আরবী বাগধারা থেকে সপ্রমাণ করি। এ প্রসঙ্গে বিশদ পর্যালোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু এর পূর্বে আমাদেরকে অবকাশ দিন যেন আমরা ঐসব লোকের, যারা আমাদের উপর নবুওতের মোহরকে ভঙ্গ করার দোষ চাপান তাদের সম্বন্ধে কিছুটা পর্যালোচনা করি যে, স্বয়ং তাদের আকীদার কি স্বরূপ? দৃশ্যতঃ তারা এই দাবী করেন যে, আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে তারা শর্তহীনভাবে পরিষ্কার অর্থে আখেরী নবী মানেন এবং তাঁর পরে কোন প্রকারের নবীর আগমনে বিশ্বাসী নন। কিন্তু সেই সঙ্গে, প্রশ্ন করলে তারা নিজেদের এ বিশ্বাসও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে এই উম্মতে আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) একদিন নিশ্চয় নাযেল হবেন'।

যখন আপনি তাদেরকে বলেন যে, "এখনই তো আপনি বলেছিলেন যে, আঁ-হুযুর (সাঃ) কোন রকম ব্যতিক্রম ও শর্ত ব্যতিরেকে এই অর্থে আখেরী নবী যে, তাঁর পরে কোন প্রকারের নবীই আসবেন না। কিন্তু এখনই আবার এই ব্যতিক্রমটি (exception) কায়েম করার অধিকার আপনি কি করে পেয়ে গেলেন?" প্রতিউত্তরে তাঁরা নিতান্ত অর্থহীন নিষ্প্রাণ ব্যাখ্যা পেশ করেন যে, "তিনি (হযরত ঈসা-আঃ) যেহেতু পূর্বে নবী ছিলেন, কাজেই পুনরায় তাঁর আগমন খতমে--নবুওয়তের মোহরকে ভঙ্গ করার কারণ ঘটায় না।" যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, "তিনি কি মুসায়ী শরীয়ত (তওরাত) নিয়ে আসবেন?" তখন জবাব আসে, 'তিনি বিনা শরীয়তেই আসবেন।" আবার যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, "এমতাবস্থায় শরীয়তের আদেশ ও নিষেধাবলীর (আওয়ামির ও নাওযাহীর) কি হবে ?" তখন তারা বলেন যে, "প্রথমে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্য হবেন, তারপর এই শরীয়তের অধীন ও অনুসারী হয়ে নবুওয়তের কাজ করবেন।" অধিক প্রশ্নাবলীর উত্তর তাদের সাধ্যাতীত। যথা, মসীহ নাসেরীকে শরীয়তে-মুহাম্মদীয়ার শিক্ষা কি উলেমা দান করবেন, অথবা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে তাঁকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান দান করা হবে?" বস্তুতঃ উক্ত জেরা থেকেই সুনিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেরাও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে শর্তহীনভাবে পরিষ্কার অর্থে আখেরী নবী বলে মানেন না। বরং ব্যতিক্রমী এই মত (exception) পোষণ করেন যে, এরূপ নবী যিনি পূর্বেকার, শরীয়তধারী নন, উম্মতি এবং আক্ষরিকভাবে শরীয়ত-মুহাম্মদীয়ার অধীন ও অনুবর্তী, আর কেবল এরই শিক্ষা দান করেন- এরূপ নবী নবুওয়তের মোহরকে না ভেঙ্গেই হযরত খাতামান্নবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পরও আসতে পারেন।

আমরা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞ সুধীবৃন্দের কাছে এ প্রশ্ন করার অধিকার রাখি যে, ঐরূপ আকীদা ও বিশ্বাসের ধারক-বাহকদের পক্ষে কোনও যুক্তি-তর্ক বা আদল-ইনসাফের আলোকে এ কথা বলা কি জায়েয (সঙ্গত) যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে কোনও প্রকারের নবী আসতে পারেন না?

ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে এই যে, শুধু আপনারাই নন, বরং আমরা ছাড়াও অপরাপর সকলেই যারা পবিত্র হাদীসে বিশ্বাসী, হযরত খাতামান্নবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের আলোকে এই আকীদা গ্রহণে বাধ্য যে,"عیسیٰ نبی اللہ" 'আল্লাহ্‌র নবী ঈসা' এই উম্মতের মধ্যে নাযেল হবেন। *(মুসলিম শরীফঃ ২য় খণ্ড, বাবু যিক্‌রিদ্দাজ্জাল)*

আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষানুযায়ী এ জ্ঞানও রাখি যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম মারা গিয়েছেন। সেজন্যে উল্লিখিত বাণীসমূহের এ মর্ম গ্রহণ করি যে, আগমনকারী 'ঈসা নবীউল্লাহ্' উম্মতে-মুহাম্মদীয়ার মধ্যে তাঁর (সাঃ) গোলামদের মধ্য হতেই সৃষ্টি হবেন। আর আমরা কুরআন ও হাদীস এবং বুযুর্গানে-উম্মতের বক্তব্য ও অভিমতের দ্বারাই সপ্রমাণ করি যে, প্রতিশ্রুত আগমনকারী একাধারে "আল্লাহ্‌র নবী"ও হবেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতও হবেন। এই আকীদা খাতামিয়তে-মুহাম্মদীয়ার কখনও পরিপন্থী নয়।

কিন্তু অন্যান্য উলামা এই তা'ভীল تاویل বা ব্যাখ্যার দ্বারা নিজেদের মনকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেন যে, পুরোনো নবী যদি পুনরায় এসে যান, তাহলে যেহেতু তিনি পূর্বে জন্ম নিয়েছিলেন এবং পূর্বেই তাঁকে নবুওয়ত দেয়া হয়েছিল, কাজেই তাঁকে আখেরী বলে ধরা যাবে না। অতএব, এইরূপ নবীর আগমনের পথ নবুওয়তের মোহর না ভেঙ্গেও খোলা থাকে।

উপরোক্ত যুক্তি এবং এর প্রতিপাদন-প্রক্রিয়ার কেন্দ্র-বিন্দু হলো এই যে, প্রথম জন্মগ্রহণকারী নবীকে আখেরী নবী বলে ধরা যায় না। যখন আমরা এ যুক্তির নিরীক্ষণ করি, তখন এটাও একান্ত অন্তঃসারশূন্য এবং বাজে বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হলো, আজ যদি একজন বিশ বছরের যুবকের সামনে কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করে এবং দেখতে দেখতেই কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়। তারপর সে যুবক আশি বছর পর (এক শ' বছর বয়সে) মারা যায়, তাহলে ঐতিহাসিক কাকে 'আখেরী' বলে লিখবে? অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ও হুঁশ-হাওয়াস সম্পন্ন ঐতিহাসিক মাত্রই কাকে 'আখেরী' বলে নির্ধারণ করবে ? – সেই বাচ্চাকে, যে পরে জন্ম নিয়েছিল কিন্তু কয়েকদিন জীবিত থেকেই মারা যায়, না, তার বিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী সেই ব্যক্তিকে, যে ঐ বাচ্চার মৃত্যুর আশি বছর পরে মারা যায় ? দুঃখের বিষয়, অবিকল এ

অবস্থাই আমাদের বিরুদ্ধবাদী উলামায়ে-কেরাম পেশ করছেন, অথচ এই যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা তারা দেখতে পাচ্ছেন না। তারা দেখছেন না যে, তাদের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-এর বয়স তখন কম-বেশী ছয় শ' বছর ছিল যখন সৈয়দে-কওনায়ন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। তেষট্টি বছর বয়সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তারপর চৌদ্দশ' বছর আরও অতিবাহিত হতে চলেছে আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) যিন্দা সালামত জীবিত আছেন। বলুন দেখি, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর বহুকাল পর তিনি যখন অবতীর্ণ হয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন ক'রে পরিশেষে মারা যাবেন, তখন একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সময়কালের দিক দিয়ে কাকে 'আখেরী' (সর্বশেষ) বলে নির্ধারণ করবে?

যখন বাহ্যদর্শী আলেমদের দৃষ্টিতে 'খাতামান্নবীঈন' সংক্রান্ত আয়াতটি সময়কালের দিক দিয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কাউকে 'আখেরী নবী' হবার অধিকার দেয় না, তখন আবার সময়কালের দিক দিয়েই হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'আখেরী নবী' হিসেবে সাব্যস্ত করার তাঁদের অধিকার আছে কি ? নিছক মুখে মুখে এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার কোন মানে হয় না, যখন তাঁরা কার্যতঃ ও বাস্তবতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে ইহধামে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের শত শত বছর পরে সর্বশেষ আগমনকারী নবী বলে স্বীকার করে থাকেন।

আহমদীয়া সিলসিলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা 'খাতামিয়তে মুহাম্মদীয়া' সম্পর্কে যে সামগ্রিক সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী দর্শন পেশ করেছেন তা সম্পূর্ণ অনন্য অনুপম, অদ্বিতীয় এবং নযিরবিহীন। তিনি কুরআন পাকের আলোকে 'খাতামান্নবীঈন' সংক্রান্ত আয়াতের তফসীর বিভিন্ন পদ্ধতি ও আঙ্গিকে নিজ গ্রন্থাবলীতে এরূপ মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন যে, উহার প্রতিটি অংশ ঈমান ও ইরফান – তত্ত্বজ্ঞানের অবারিত অফুরন্ত ভাণ্ডারের দিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকছেঃ-

دامنم می کشد کہ جا اینجا است

(অর্থাৎ ঃ-"সে আমার আঁচল টেনে ধরে বলে, এই তো যথাযথ স্থান।")

তিনি কতই না মহিমামন্ডিত, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও অপূর্ব পরিভাষায় বর্ণনা করেছেন, "আমাদের খোদা এক জীবন্ত খোদা, আমাদের কিতাব একটি জীবন্ত কিতাব এবং আমাদের রসূল হযরত খাতামুন্নাবীঈন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম একজন যিন্দা রসূল।" উম্মতে-মুহাম্মদীয়ায় এ ধরনের ভাষা সর্বপ্রথম তিনিই প্রবর্তন করেছেন এবং মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রেমিকদেরকে সঠিক ও সুষ্ঠুরূপে খাতামিয়তে-মুহাম্মাদীয়ার সাথে পরিচয় করিয়েছেন।

আল্লাহ্তে ঈমান, আল্লাহ্র কিতাবে ঈমান এবং তাঁর রসূলের (সাঃ) উপরে ঈমান এ তিনটি মৌলিক বিষয় একটি আর একটির সাথে এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরস্পর এতই গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, একটি বিষয়কে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। অতএব, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় সম্বন্ধে সিলসিলা আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার আকিদা-বিশ্বাস এবং মতবাদসমূহের পর্যালোচনা অপরাপর সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর উল্লেখ ব্যতিরেকে যথাযথরূপে করা সম্ভব নয়। তাই অপরিহার্যভাবেই আমাদেরকে খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি দানের পূর্বে আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব এবং কুরআনে-আযীম সম্পর্কে তাঁর ঈমান, আকীদা ও বিশ্বাস এবং মতবাদ ও ভাব-ধারণাসমূহের উপরও দৃষ্টি দিতে হবে। নচেৎ খতমে-নবুওয়ত সম্পর্কে তাঁর দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্যকরূপে উপলব্ধি হতে পারে না।

তাই এখন আমরা আল্লাহ্তা'লার মহান অস্তিত্বের বিষয় শুরু করতে গিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি, যা ইন্‌শাআল্লাহ্ পরবর্তীতে খতমে-নবুওয়তের বিষয়টি অনুধাবনে সহায়ক হবে।

মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার রচনাবলী থেকে

আহমদীয়া সিলসিলার পবিত্র প্রবর্তক তাঁর বিরচিত 'সুরমা চশ্‌মে আরিয়া' গ্রন্থে বলেন ঃ

"কুরআন করীমের একাধিক স্থানে ইঙ্গিতে ও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম উলুহিয়্যত (ঈশ্বরত্ব)-এর পূর্ণতম প্রকাশস্থল, তাঁর আবির্ভাব যেন খোদার আবির্ভাব।"

"অতএব, যেহেতু আদিকাল হতে, এবং জগতের সৃষ্টি অব্দি খোদাতা'লাকে সনাক্ত করার বিষয়টি নবীকে সনাক্ত করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু নবীর মাধ্যম ব্যতীত তৌহীদকে (একত্ববাদকে) পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। নবী খোদাতা'লার চেহারা দেখার জন্য আয়না বা দর্পণস্বরূপ। এই দর্পণেই খোদার চেহারা অবলোকন করা যায়। যখন খোদাতা'লা নিজেকে প্রকাশ করতে চান তখন তিনি তাঁর কুদরতের বিকাশস্থলরূপে নবীকে জগতে প্রেরণ করেন এবং স্বীয় ঐশীবাণী তাঁর উপরে নাযেল করেন এবং স্বীয় রবুবিয়্যত ও প্রতিপালনের ক্ষমতাবলী তাঁর মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। তখনই জগৎ জানতে পারে যে, খোদা সত্য সত্যই বিদ্যমান আছেন। সুতরাং যে সকল মহাপুরুষের অস্তিত্ব জরুরী ভিত্তিতে খোদাতা'লার অনাদি ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী খোদার পরিচয় লাভের মাধ্যম ও উপায় হিসেবে নিরূপিত, সে সব মহাপুরুষের উপরে ঈমান আনয়ন তৌহীদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ, এবং এই ঈমান ব্যতিরেকে তৌহীদের পরিপূর্ণরূপ প্রকাশিত হতে পারে না। কারণ সেই সকল ঐশী-নিদর্শন এবং খোদার কুদরত ও মহিমা প্রদর্শনকারী বিস্ময়কর অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনাসমূহ ব্যতিরেকে, যা নবীগণ দেখিয়ে থাকেন এবং মানুষকে তদ্বারা মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত করেন- সেই খাঁটি তৌহীদ যা পূর্ণ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের উৎস থেকে সৃষ্টি হয়-তা লাভ করা যেতে পারে না। কেবল নবীরাই সে জাতি, যাঁরা খোদাকে প্রদর্শনকারী, যাঁদের মাধ্যমে সেই খোদা প্রকাশিত হন, যাঁর সত্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অতীব প্রচ্ছন্ন ও অজ্ঞেয়। চিরকাল ধরেই সেই গুপ্ত ভাণ্ডার যাঁর নাম খোদা- তিনি নবীগণের দ্বারাই উম্মোচিত ও পরিচিত হয়ে আসছেন। অন্যথায়, সেই তৌহীদ, যা এক ব্যবহারিক ও বাস্তব রূপ ধারণ করে থাকে তা লাভ করা নবীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে যেমন অযৌক্তিক, তেমনি খোদা প্রাপ্তির পথে পদচারীগণের অভিজ্ঞতারও পরিপন্থী।"

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃঃ-১১২, ১১৩)

"খ্রীষ্টান মহোদয়গণ খুব ভাল করেই স্মরণ রাখুন যে, মসীহ (যিশু) আলায়হেস সালাম 'কিয়ামত সদৃশ' হওয়া লেশমাত্রও প্রমাণিত নন বলেই খ্রীষ্টানরাও সঞ্জীবিত হয় নি বরং তারা মৃত এবং সব মৃতদের চেয়েও চরম পর্যায়ে অবস্থিত। সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার

কবরের মধ্যে পতিত হয়ে আছে। শির্ক বা অংশীবাদিতার গহ্বরে প্রোথিত রয়েছে। তাদের ভিতর না ঈমানী আত্মা আছে, না ঈমানী আত্মার বরকত ও আশিস আছে, বরং অতি নিম্নস্তরের তৌহীদ, অর্থাৎ সৃষ্টি পূজা থেকে বেঁচে থাকাও তাদের ভাগ্যে ঘটেনি। তারা নিজেদের মত একজন অক্ষম ও দুর্বল মানুষকে সৃষ্টিকর্তা ভেবে তার উপাসনা করছে। উল্লেখ্য যে, তৌহীদের তিনটি স্তর রয়েছে। সবচেয়ে নিম্নস্তর হলো, নিজেদেরই ন্যায় কোনও সৃষ্ট জীবের উপাসনা না করা; না প্রস্তরের, না অগ্নির, না মনুষ্যের, না নক্ষত্রের। দ্বিতীয় স্তরটি হলো, পার্থিব উপায়-উপকরণের উপরে এইরূপে ঝুকে না পড়া যেন সেগুলিকে রবুবিয়্যতের সর্বব্যাপক ঐশীব্যবস্থার মধ্যে এক প্রকার সাক্ষাত ক্রিয়াশীল বলে সাব্যস্ত করা। বরং সর্বদা উপায়-উপকরণের নিয়ন্তার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা, উপকরণের উপরে নয়। তৌহীদের তৃতীয় স্তর হলো, ঐশী তাজাল্লী তথা জ্যোতির্বিকাশের পূর্ণ দর্শনলাভ ক'রে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কিছুর অস্তিত্বকে 'নেই' বলে নির্ধারণ করা; এমনকি নিজের অস্তিত্বকেও। মোট কথা, পূর্ণতম গুণাবলীর আধার আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই যেন লয়প্রাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তৌহীদের উক্ত তিন স্তরকে নিজের মধ্যে বিকশিত করার নামই হলো রূহানী তথা আধ্যাত্মিক জীবন। এখন গভীরভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, রূহানী জীবনের চিরন্তন উৎসসমূহ জগতে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই উৎসারিত হয়েছে।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ পৃঃ- ২২৩, ২২৪)

"আধ্যাত্মিক (রূহানী) কাঠামো পরিপুর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্তা'লার সাক্ষাৎ প্রেম-শিখা তাঁর প্রেমিকের হৃদয়ে একটি আত্মার ন্যায় পতিত হয় এবং চিরস্থায়ী ঐশী উপস্থিতির অবস্থা তাকে দান করে এবং পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছায়। আর তখনই রূহানী সৌন্দর্য উহার পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করে। ঐ জ্যোতিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, যাকে আমরা 'হুসনে মুয়ামালা' ('ব্যবহারিক সৌন্দর্য') নামে অভিহিত করতে পারি। ইহা সেই সৌন্দর্য, যা তার প্রবল আকর্ষণী শক্তিতে দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতে উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে। কেননা দৈহিক সৌন্দর্য কেবল একজন কি দুইজন ব্যক্তির নশ্বর (অস্থায়ী) প্রেমের কারণ হয়, যা অচিরেই লয়প্রাপ্ত হয় এবং তার আকর্ষণীশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, যাকে 'হুসনে মুয়ামালা' নামে অভিহিত করা হয়েছে তা তার চৌম্বিক শক্তিতে এতই প্রবল যে, উহা এক জগতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অণু-পরমাণুও তার দিকে আকর্ষিত হয়। বস্তুতঃ দোয়ার কবুলিয়তেরও তত্ত্ব ও দর্শন ইহাই যে, এরূপ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যক্তি যাঁর মধ্যে ঐশী-প্রেমের আত্মা প্রবিষ্ট হয় তিনি যখন কোন অসম্ভব এবং অত্যন্ত কঠিন ব্যাপারেও দোয়া করেন, আর সে দোয়াতে পুরোপুরি জোর দেন, তখন যেহেতু তিনি স্বীয় সত্তায় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ধারক হয়ে থাকেন সেহেতু খোদাতা'লার আদেশ ও অনুমতিক্রমে এ বিশ্বের অণু-পরমাণুও তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

অতএব, ঐরূপ পর্যাপ্ত উপকরণাদির সমাবেশ ঘটে যায় যা তাঁর সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। অভিজ্ঞতা এবং খোদাতা'লার পবিত্র কিতাব থেকে সপ্রমাণিত যে, দুনিয়ার প্রতিটি অণুরই ঐরূপ ব্যক্তির সাথে স্বভাবতঃ এক প্রেমের সম্পর্ক হয়ে থাকে, যার ফলে তাঁর দোয়াসমূহ ঐসব অণু-পরমাণুকে নিজের দিকে ঐরূপে আকর্ষণ করে যেমন চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং অসাধারণ বিষয়াদি ঐ আকর্ষণের কারণে সংঘটিত হয় যার উল্লেখ প্রচলিত বিজ্ঞান ও দর্শনে নেই। আর ঐ আকর্ষণ বস্তুতঃ প্রকৃতির মধ্যে নিহিত এক স্বভাবজ প্রক্রিয়া। যখন থেকে সৃষ্টিকর্তা এই পার্থিব জগতকে অণু-পরমাণু দ্বারা রূপায়ণ করেছেন তখনই প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে সেই আকর্ষণ নিহিত রেখেছেন। বস্তুতঃ প্রতিটি অণু-পরমাণু আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সত্যিকার প্রেমিক, তেমনি প্রত্যেক সদাত্মা মানুষও তাই। কেননা সে সৌন্দর্যটি হক্কতা'লার জ্যোতির বিকাশস্থল স্বরূপ। উহাই ছিল সেই সৌন্দর্য, যার জন্যে আল্লাহ্ বলেছেনঃ اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ (অর্থঃ তোমরা আদমের উদ্দেশ্যে 'সিজদা' কর, অতএব সকলে 'সিজদা' করলো, ইবলীস ব্যতীত)।

এখনও বহু ইবলীস আছে যারা সেই সৌন্দর্যকে সনাক্ত করে না। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় বড় কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে দেখিয়ে এসেছে। নূহের (আঃ) মধ্যে সে সৌন্দর্যই ছিল, যেজন্যে তাঁর সমর্থন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর কাছে পছন্দনীয় হলো এবং সকল অস্বীকারকারীকে পানির আযাবে ধ্বংস করা হলো। অতঃপর, মূসা (আঃ)-ও সে একই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সহকারে আগমন করলেন, যিনি গুটি কয়েকদিন দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার পর অবশেষে ফেরাউনের ভরাডুবির কারণ হলেন। অতঃপর, সবার পরে অনন্য সাধারণ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সহকারে আগমন করলেন সৈয়্যদুল আম্বীয়া ও খায়রুল-ওরা মাওলানা ও সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম- যাঁর প্রশংসাস্থলে এ আয়াত-করিমাই যথেষ্টঃ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ 'সেই নবী মহামহিম আল্লাহ্র অতি নিকটে চলে গেলেন, তারপর সৃষ্ট জীবের দিকে ঝুঁকলেন।' এইরূপে তিনি উভয় হক্- আল্লাহ্র হক্ ও বান্দার হক্ পালন করে দেখালেন এবং উভয় প্রকার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করলেন।" *(যামীমা বারাহীনে আহমদীয়াঃ ৫ম খণ্ড, পৃঃ -৬১, ৬২)*

"স্বীয় মৌলিক সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বভাবজ গুণের অধিকারে 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্য অজ্ঞেয় বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞাত) হওয়া খোদাতা'লার সত্তারই বৈশিষ্ট্য। আদিকাল থেকে 'আহলে হক্' (সত্যের ধারক ও বাহকগণ) 'ওয়াজেবুল ওয়াজুদ' (মৌলিক ও আবশ্যিকভাবে অস্তিত্ববান) খোদার গায়েবের জ্ঞান সম্বন্ধে 'ওয়াজুবে যাতি' (সাক্ষাৎ অপরিহার্যতা)-এর আকীদা রাখেন অর্থাৎ খোদাতালার সত্ত্বার পক্ষে 'আলেমুল গায়েব' হওয়া ওয়াজেব (অপরিহার্য) এবং তাঁর অনাদি অনন্ত সত্ত্বার জন্যে আলেমুল গায়েব

হওয়াই এক মৌলিক বৈশিষ্ট। কিন্তু সকল সৃষ্ট বস্তু ('মুমকিনাত'), যার অস্তিত্ব স্বভাবতঃ ধ্বংসশীল ('হালেকাতুয্যাত') এবং যার মৌলিকতা অবাস্তব ('বাতেলাতুল হাকীকাত') উক্ত গুণে এবং অন্যান্য ঐশী গুণাবলীতেও মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের অংশীদার হওয়া জায়েয (বৈধ) নয়। কেননা সত্তার দিক দিয়ে যেমন সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের শরীক হওয়া অসম্ভব, তেমনি গুণাবলীর দিক দিয়েও অসম্ভব। অতএব যারা 'মুমকিনাত' তথা সৃষ্টজীবের অন্তর্ভূক্ত, তাদের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্বের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলেমুল-গায়েব হওয়া অসম্ভব বিষয়াদির শামিল- তারা নবীই হোন, বা মুহাদ্দাস অথবা ওলী। তবে আল্লাহতালার ইলহাম যোগে অদৃশ্য–অজানা বিষয় ও রহস্যাদির অংশবিশেষকে জানার সৌভাগ্য চিরকালই বিশিষ্ট মনোনীত বান্দারা লাভ করে এসেছেন এবং এখনও লাভ করে থাকেন। আর এটা আমরা একমাত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্যিকার অনুসারীদের মধ্যেই বিদ্যমান বলে প্রত্যক্ষ করি।' *[তাসদীকুন নবী (সাঃ) পৃঃ ২৬, ২৭]*

"আল্লাহতা'লার কুদরতসমূহ অনন্ত ও অপরিসীম এবং তাঁর বিস্ময়কর কার্যাবলী সীমাহীন। তিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জন্যে তাঁর নিয়ম-নীতিকেও বদলে দিতে পারেন। কিন্তু ইহাও তাঁর নিয়ম-নীতিরই আওতাভুক্ত। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দ্বারে পরিবর্তিত এক অভিনব আত্মায় উপস্থিত হয় এবং নিজের মধ্যে বিশেষ এক পরিবর্তন শুধু তাঁর তুষ্টিলাভের জন্যে সৃষ্টি করে তখন খোদাতা'লাও তার জন্যে নিজের মধ্যে একরকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। অন্য কথায়, ঐ বান্দার উপরে যে খোদা প্রকাশিত হলেন তিনি যেন ভিন্ন কোন খোদা। সে খোদা নন যাঁকে সাধারণ লোকে জানে। যার ঈমান দুর্বল সেরূপ ব্যক্তির কাছে তিনি দুর্বলের ন্যায় প্রকাশিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সমীপে এক মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান নিয়ে উপস্থিত হয় তিনি তাকে দেখিয়ে দেন যে, তার সাহায্যকল্পে তিনিও শক্তিশালী খোদা। অনুরূপভাবে মানবীয় পরিবর্তনসমূহের মোকাবেলায় ঐশী গুণাবলীতেও পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয়। ঈমানী অবস্থার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শক্তিহীন – মৃতবৎ, তার জন্যে খোদাতা'লাও যেন মরে যান (নাউযুবিল্লাহ) অর্থাৎ তাকে তাঁর সাহায্য দানে হাত গুটিয়ে নীরব হয়ে যান। কিন্তু এ যাবতীয় পরিবর্তন তিনি তাঁর নিয়ম-নীতির আওতার মধ্যেই স্বীয় পবিত্রতা অনুযায়ী করে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষই তাঁর নিয়মের শেষ সীমারেখা টানতে অক্ষম, সেহেতু কোন অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল ব্যতিরেকে ত্বরিৎ এরূপ আপত্তি করা বোকামী বৈ কিছুই নয় যে, অমুক বিষয়টি প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কেননা যে জিনিসের এখনও সার্বিক সীমারেখা চিহ্নিত হয় নি এবং কোন অকাট্য দলিলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে সম্বন্ধে কে-ই বা রায় দিতে পারে?!"

(চশমা-এ-মা'রেফাতঃ পৃঃ- ৯৬, ৯৭)

"হে শ্রোতাগণ! শ্রবণ কর খোদা তোমাদের নিকট কি চান? শুধু ইহাই যে, তোমরা তাঁহারই হইয়া যাও, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, আকাশেও নয়, ভূ-পৃষ্ঠেও নয়। আমাদের খোদা সেই খোদা-যিনি এখনও জীবিত আছেন যেমন পূর্বে জীবিত ছিলেন, এখনও তিনি কথা বলেন যেমন পুর্বে কথা বলিতেন; এবং এখনও তিনি শুনেন যেমন পূর্বে শুনিতেন; ইহা অলীক ধারণা যে, এ যুগে তিনি শুনেন কিন্তু কথা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। তাঁহার যাবতীয় গুণ অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁহার কোন গুণই নিষ্ক্রিয় নহে এবং এইরূপ কখনও হইবে না। তিনি সেই 'ওয়াহেদ, লা শরীক' খোদা যাঁহার কোন পুত্র নাই এবং যাঁহার কোন স্ত্রী নাই। তিনি সেই অনুপম খোদা, যাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় আর কেহ নাই এবং যাঁহার ন্যায় কেহই কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত নহে। তাঁহার তুল্য কেহ নাই, তাঁহার সমগুণসম্পন্ন কেহ নাই এবং তাঁহার কোন শক্তি কমিবার নহে। তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দুরে। তিনি রূপকভাবে 'আহ্‌লে কাশ্‌ফ' (দিব্যদর্শীগণ)-এর নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার কোন শরীরও নাই, আকারও নাই। তিনি সকলের উপরে, কিন্তু ইহা বলিতে পারিব যে, তাঁহার নিম্নে অন্য কেহও আছে। তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু ইহা বলিতে পারিব না যে, তিনি পৃথিবীতে নাই। তিনি পুর্ণ গুণাবলীর আধার এবং সকল সত্যিকার প্রশংসার সমাহার এবং সকল সৌন্দর্যের উৎস এবং তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সকল কল্যাণের প্রস্রবণ, প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়স্থল এবং তিনি প্রত্যেক রাজ্যের অধিশ্বর, তিনি প্রত্যেক চরম উৎকর্ষের অধিকারী এবং প্রত্যেক ত্রুটি ও দুর্বলতা হইতে মুক্ত। এই বিষয়ে তিনি এক-অদ্বিতীয় যে, পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসী তাঁহারই ইবাদত ও উপাসনা করিবে। তাঁহার নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নহে। সকল রূহ্ (আত্মা) ও উহাদের শক্তিসমূহ এবং অণু-পরমাণু ও উহাদের শক্তিসমূহ তাঁহারই সৃষ্ট। তাঁহার কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোন বস্তুই প্রকাশিত হয় না। তিনি আপন শক্তি, মহিমা ও নিদর্শনসমূহ দ্বারা নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন। এবং তাঁহাকে তাঁহারই সাহায্যে আমরা লাভ করিতে পারি। তিনি সর্বদা সাধুগণের নিকট আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আপন শক্তি ও মহিমা তাহাদিগকে প্রদর্শন করেন। ইহা হইতেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহা দ্বারাই তাঁহার মনোনীত পথের পরিচয় লাভ করা যায়।

তিনি জড় চক্ষু ব্যতিরেকে দেখেন, জড় কর্ণ ব্যতীত শ্রবণ করেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এইরূপে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন তাঁহার কাজ, যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ব্যতীত তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ এরকমভাবেই যাবতীয় কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। মূর্খ সে, যে তাঁহার শক্তির মহিমা অস্বীকার করে। সেই ব্যক্তি অন্ধ যে তাঁহার গভীর শক্তিনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসকল কাজ তাঁহার মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁহার প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, উহা ছাড়া বাকি সবই তিনি করেন এবং করিতে সক্ষম। তিনি আপন সত্তায়, গুণে, কার্যে ও শক্তিতে এক-অদ্বিতীয়, এবং তাঁহার নিকট পৌঁছিবার নিমিত্ত একটি ভিন্ন অপর সকল দ্বারই

রুদ্ধ। এই দ্বার কুরআন মজীদ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।" (আল্ ওসীয়্যত ঃ পৃঃ ১৪-১৭ বাংলা তরজমাঃ - মরহুম এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার)

"কুরআন শরীফে এইরূপ শিক্ষামালা রয়েছে যা খোদাকে বান্দাদের দৃষ্টিতে প্রিয় করে তোলার জন্যে সচেষ্ট। কোথাও তাঁর সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলে দেখাচ্ছে। আবার কোথাও তাঁর 'ইহ্সান' বা অনুগ্রহরাজীকে স্মরণ করান হচ্ছে। কেননা কারও প্রতি ভালবাসা হয়ত সৌন্দর্যের দ্বারা অন্তরে রেখাপাত করে, নয়ত ইহ্সান বা অনুগ্রহের দ্বারা। সুতরাং পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে যে, খোদা তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর দিক দিয়ে এক-অদ্বিতীয়। এতটুকুও তাঁর মধ্যে দোষ-ত্রুটি নেই। তিনি সকল পূর্ণতম গুণাবলীর আধার, সকল পবিত্র কুদরত ও ক্ষমতাসমূহের বিকাশস্থল। এবং সকল সৃজনক্ষমতা ও কল্যাণের উৎস। তিনি সকল পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের মালিক এবং সকল বিষয়াদির প্রত্যাবর্তনস্থল। দূরে হয়েও তিনি নিকটে এবং নিকটে থেকেও তিনি দূরে, তিনি সবার উপরে কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, তাঁর নীচে আরও কেউ আছে এবং তিনি সর্বাপেক্ষা গোপন কিন্তু বলতে পারি না যে, কেউ তাঁর চেয়ে অধিক সুপ্রকাশিত। তিনি জীবিত তাঁর নিজ সত্তায়, এবং প্রতিটি বস্তু তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ববান ও জীবিত। তিনি স্বাধিষ্ঠ, আর সবাই তাঁর দ্বারা অধিষ্ঠানপ্রাপ্ত (কায়েম)। তিনি প্রতিটি জিনিসকে আগলিয়ে রেখেছেন। আর তাঁকে আগলিয়ে রাখে এমন কেউ বা কোন কিছু নেই। এমন কেউ বা কোন কিছু নেই তিনি ব্যতিরেকে যে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে বা তিনি ব্যতিরেকে জীবিত থাকতে পারে। তিনি সব কিছুকেই বেষ্টন করে আছেন কিন্তু কিরূপ বেষ্টন তা আমরা বলতে পারি না। তিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের আলো এবং প্রত্যেক আলোই তাঁর হাত দিয়েই দীপ্তিমান এবং তাঁর সত্তারই প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বন। তিনি নিখিল বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক। তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হয় না এমন কোন আত্মা বা রূহ্ নেই। কোনও আত্মায় নিহিত এমন কোনও শক্তি নেই যা তাঁর কাছ থেকে লাভ করে না, অথবা আপনা-আপনিই তাঁর মধ্যে সে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর রহমত বা করুণা দুই প্রকারের ঃ (১) কারও কোন পূর্ব আমল বা কর্ম ব্যাতিরেকে আদিকাল থেকে যা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যথা, পৃথিবী, আকাশমালা, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র ----- পানি, আগুন এবং বিশ্ব-জগতের সকল অণু-পরমাণু যা আমাদের আরাম ও উপকারার্থে তৈরী করা হয়েছে। আর তেমনি যে জিনিসেরই আমাদের প্রয়োজন ছিল তা সবই আমাদের জন্ম বা সৃষ্টির পূর্বেই আমাদের জন্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এসব কিছু তখন করা হয়েছে যখন আমরা স্বয়ং মওজুদ (অস্তিত্ববান) ছিলাম না। আমাদের কোন আমল বা কর্মও ছিল না। কে বলতে পারে যে, তার সুকর্মের কারণে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে অথবা এই পৃথিবী তার কোন সুকর্মের দরুন সৃষ্টি হয়েছে? মোট কথা, এ সেই রহমত যা মানুষ এবং তার আমল বা কর্মের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, যা কারও কর্মের ফলশ্রুতি নয়। (২) দ্বিতীয় প্রকার কল্যাণ হলো যা কর্মের উপর প্রতিফলিত হয়; এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

কুরআন করীমে এও বর্ণিত হয়েছে যে, খোদাতা'লার সত্তা সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি মুক্ত, তিনি সর্বতঃ পবিত্র। লয় বা ক্ষতি হতে তিনি সম্পূর্ণ বিমুক্ত। তিনি চান, মানুষও যেন তাঁর শিক্ষাকে অনুসরণ ক'রে দোষমুক্ত ও পবিত্র হয়। তিনি বলেন ঃ

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকবে এবং নিরঞ্জন ও মহান সত্তার দর্শন লাভ করবে না, মৃত্যুর পরও সে অন্ধই থাকবে এবং তার কাছ থেকে অন্ধকার দূরীভূত হবে না। কেননা খোদাকে দেখার জন্যে ইহজগতেই মানুষকে ইন্দ্রিয়সমূহ দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঐ সব ইন্দ্রিয় এ দুনিয়া থেকেই সঙ্গে নিয়ে যাবে না, সে পরকালেও খোদাকে দেখতে পারবে না। এ আয়াতটিতে খোদাতা'লা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের কাছে কি রকম উন্নতি প্রত্যাশা করেন এবং মানুষ তাঁর শিক্ষা অনুসরণ ও অনুশীলনে কোথায় পৌছুতে পারে। তারপর তিনি কুরআন শরীফে ঐ শিক্ষা পেশ করেন যদ্বারা এবং যা অনুশীলন করে ইহজগতেই খোদার দর্শন লাভ হতে পারে। যথা, তিনি বলেন ঃ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا অর্থাৎ, যে চায়, ইহজগতে যেন তাঁর খোদা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়, সেই খোদার, যিনি প্রকৃত স্রষ্টা, তার উচিত সে যেন এমনভাবে পূণ্যকর্ম করে যে, তার মধ্যে কোন প্রকারের খারাপি না থাকে অর্থাৎ সে আমল লোক দেখানোর জন্যে না হয়, আর সেজন্য অন্তরে আত্মশ্লাঘা না হয় এই মনে করে, সে যেন খুব একটা কিছু হয়ে গেছে এবং সে কর্ম যেন ক্রটিমুক্ত ও অসম্পূর্ণও না হয়। তাতে এরূপ কোন দুর্গন্ধও না থাকে যা সাক্ষাৎ ঐশী-প্রেম বিরোধী হয়। বরং তা আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশস্তায় ভরপুর হওয়া চাই। সেই সঙ্গে সে যেন প্রত্যেক প্রকারের শির্ককে পরিহার ক'রে সূর্য, চন্দ্র, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং বিশ্ব-জগতের কোন কিছুকেই মাবূদ (উপাস্য) বলে সাব্যস্ত না করে। পার্থিব উপায়-উপকরণাদিকেও যেন এরূপ সম্মান ও মর্যাদা না দেয়, সেগুলির উপর এরূপ আস্থাবান না হয়, যেন সেগুলি খোদাতা'লার অংশীদার (শরীক)। আর তেমনি নিজের সাহস, উদ্যম ও কৌশলকেও যেন তেমন বিশেষ একটা কিছু বলে মনে না করে। কারণ এও এক প্রকারের শির্ক। নিজের জ্ঞান-বিদ্যায় যেন কোন গর্ব ও দম্ভ বোধ না করে এবং নিজের কর্মের উপরও অহংকারে স্ফীত না হয়। বরং নিজেকে বস্তুতপক্ষে অজ্ঞ, শ্রান্ত ও দুর্বল বলেই জ্ঞান করে। খোদাতা'লার দোর-গোড়ায় সর্বক্ষণ যেন তার আত্মা অবনত মস্তকে পড়ে থাকে। নিরন্তর দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ফয়েয, কল্যাণ ও আশিসকে আকর্ষণ ও আহরণ করে। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত, আর সেই সাথে নিরূপায়। এমতাবস্থায় সে তার সামনে এক ঝরণা প্রস্ফুট হতে দেখে, যা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সুপেয়। অতএব, যেমন করে হোক হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সে ঝরণা পর্যন্ত পৌছে যায় এবং উৎসের উপরে মুখ রেখে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তৃপ্ত না হয় সেখান থেকে না সরে। আবার কুরআন করীমে আমাদের খোদা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ অর্থাৎ, তোমাদের খোদা হলেন সেই খোদা, যিনি তাঁর সত্তায় এবং গুণাবলীতে অনন্য। কোনও অস্তিত্ব তাঁর সত্তার ন্যায় অনাদি ও অনন্ত নয়, আর কোন বস্তুর গুণাবলীই তাঁর গুণাবলীর সমতুল্য নয়। মানুষের জ্ঞান কোন না কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাঁর জ্ঞান কোনও শিক্ষকের মুখাপেক্ষী না হওয়া সত্ত্বেও অসীম। মানুষের শ্রবণ শক্তি বায়ুর মুখাপেক্ষী এবং সীমিত, কিন্তু খোদাতা'লার শ্রবণশক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সীমাহীন। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্যের অথবা অন্য কোন আলোর মুখাপেক্ষী আবার সীমাবদ্ধও। কিন্তু খোদাতা'লার দৃষ্টি সাক্ষাৎ ও স্বকীয় শক্তিসম্পন্ন এবং অসীম। মানুষের সৃজন ক্ষমতা কোন না কোন পদার্থের মুখাপেক্ষী, সময়ের মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু খোদাতা'লার সৃজন ক্ষমতা না কোন পদার্থের মুখাপেক্ষী, না সময়ের। তা হলো অসীম। কেননা তাঁর গুণাবলী অনুপম ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সমতুল্য ও সমকক্ষ যেমন নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীরও কোন সমতুল্য-সমকক্ষ নেই। যদি কোন একটি গুণে তিনি ত্রুটিযুক্ত হন, তাহলে সকল গুণেই ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন। সেজন্য তওহীদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর সত্তার ন্যায় তাঁর সকল গুণাবলীতে অনুপম ও অদ্বিতীয় না হন। উক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতসমূহের অর্থ এই যে, খোদাতা'লা কারো পুত্র নন, না কেউ তাঁর পুত্র। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। না তাঁর পিতার প্রয়োজন আছে, না পুত্রের। এ সেই তওহীদ (একত্ববাদ), যা কুরআনের শিক্ষা, আর এই হলো ঈমানের মূল ভিত্তি।" *(লেকচার শিয়ালকোট ঃ পৃঃ ৯-১৩)*

"সর্বশক্তিমান ও বাস্তব সত্য ও সর্বতঃ পরিপূর্ণ এই খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের অস্তিত্বের অণু-পরমাণু সিজদা করে। যাঁর হাতে প্রতিটি আত্মা এবং সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতাসহ অস্তিত্ব লাভ করেছে, এবং যাঁর সত্তার কারণে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব টিকে আছে। কোন বস্তুই তাঁর জ্ঞান ও কর্তৃত্ব এবং সৃজনক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয়। সহস্র সহস্র দরূদ ও সালাম আর রহমত বর্ষিত হোক সেই পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপরে, যাঁর মাধ্যমে আমরা সেই চিরঞ্জীব খোদাকে লাভ করেছি, যিনি কথা বলে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ নিজেই আমাদেরকে দান করেন এবং নিজেই অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে তাঁর অনাদি-অনন্ত শক্তি ও ক্ষমতার দেদীপ্যমান চেহারা আমাদেরকে দেখান। অতএব, আমরা এরূপ রসূলকে পেয়েছি যিনি আমাদের খোদাকে দেখিয়েছেন। এরূপ খোদাকে আমরা পেয়েছি যিনি তাঁর পুর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কুদরত যে কত মাহাত্ম্যপূর্ণ, যা ছাড়া কোন জিনিসই স্বস্তি লাভ করতে পারে না। এবং যাঁর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে কোন বস্তুই টিকে থাকতে পারে না।

তিনি আমাদের সত্য খোদা- অগণীত আশিস ও কল্যাণময় খোদা, অফুরন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন খোদা, কল্পনাতীত সৌন্দর্যমণ্ডিত ও অনুগ্রহশীল খোদা, তিনি ব্যতীত আর কোনও খোদা নেই।" *(নাসীমে দা'ওয়াতঃ পৃঃ ৩)*

"যখন আমি এই বড় বড় জ্যোতিষ্কসমূহ প্রত্যক্ষ করি এবং এগুলোর বিশালত্ব ও বিস্ময়কর রহস্যাবলী সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি এবং অনুধাবন করি যে, কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছা এবং ইঙ্গিতেই এ সবকিছু সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হলো, তখন আমার আত্মা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে, "হে আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি যে কত মহান, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, তোমার কাজ যে কত বিস্ময়কর, দুর্বোধ্য ও জ্ঞানাতীত! অর্বাচীন সে ব্যক্তি, যে তোমার কুদরতসমূহকে অস্বীকার করে এবং আহাম্মক সে ব্যক্তি যে তোমার সম্পর্কে এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তিনি এ বস্তুগুলিকে কোন্ পদার্থের দ্বারা তৈরী করেছেন?" *(নাসীমে দা'ওয়াত ঃ পৃঃ- ৬০ পাদটীকা)*

"জানা আবশ্যক, যে খোদার দিকে আমাদিগকে কুরআন শরীফ আহ্বান করে, তাঁহার নিম্নে বর্ণিত গুণাবলী লিপিবদ্ধ আছেঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ . هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ . اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ . قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ .

অর্থাৎ, 'সেই খোদা এক ও অংশীবিহীন, তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য ও আনুগত্যের যোগ্য নহে। ইহা এই জন্যই বলিয়াছেন যে, তিনি অংশীবিহীন না হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার শক্তির উপর শত্রুর শক্তি প্রবল হইতে পারিত। এই অবস্থায় খোদায়ী মর্যাদা বিপন্ন রহিত এবং তিনি বলিয়াছেন ঃ 'তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য নাই,' ইহার অর্থ, তিনি এমন কামেল খোদা, যাঁহার গুণাবলী ও কামালাত এরূপ উচ্চ ও মহান যে, বিশ্ব চরাচরে কামেল গুণাবলীর জন্য কোন খোদার নির্বাচন করিতে চাহিলে কিংবা মনে মনে শ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়তর এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কোন খোদার গুণাবলী কল্পনা করিতে গেলে, যাঁহাকে ছাড়াইয়া কেহ উত্তম হইতে পারে না, তিনিই হন সেই খোদা,

যাঁহার আরাধনায় তুচ্ছ বস্তুকে শরীক করা অন্যায়। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ 'তিনি আলেমুল্‌গায়েব'। অর্থাৎ, তাঁহার সত্তাকে একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁহার সত্তাকে কেহ পরিবেষ্টন করিতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর আপাদমস্তক আমরা দর্শন করিতে পারি, কিন্তু খোদাকে আপাদমস্তক দর্শনে আমরা অক্ষম। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন ঃ 'তিনি আলেমুশ্‌ শাহাদাহ্‌।' অর্থাৎ, কোন জিনিস তাঁহার দৃষ্টির অগোচর নহে। ইহা হইতে পারে না যে, তিনি খোদা বলিয়া অভিহিত হইয়া বস্তু জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি বিশ্বের অণু-পরমাণু পর্যন্ত দেখেন। কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তিনি জানেন, কখন তিনি এই জগৎ বিধানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, কখন কেয়ামত আনিবেন এবং পুনরুত্থান ঘটাইবেন। তিনি ছাড়া কেহ জানে না যে, এরূপ কখন হইবে। সুতরাং, তিনিই খোদা যিনি সকল প্রকারের সময়কেই জানেন। তিনি আবার বলিয়াছেন ঃ 'হুয়ার্‌ রহ্‌মান।' অর্থাৎ, তিনি প্রাণী সকলের অস্তিত্ব ও উহাদের কর্মের পূর্বে শুধু আপন দয়ায়, কোন স্বার্থ বা কাহারো কর্মফলের জন্যও নহে, কেবল তাহাদের জন্য আরামের সামগ্রী যোগাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য ও পৃথিবী এবং অন্য সব জিনিস আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের কর্মের অস্তিত্বের পূর্বে আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দানের নাম খোদার কিতাবে রহমানিয়্যত এবং এই কাজের দিক হইতে খোদাতা'লার নাম রহমান। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন ঃ- 'আর রহীম।' অর্থাৎ সেই খোদা সাধু কর্মের উত্তম হইতে উত্তম ফল দেন, এবং কাহারও শ্রমকে নষ্ট করেন না। এই কাজের দিক হইতে তিনি রহীম এবং এই গুণের নাম রহীমীয়্যত। তারপর তিনি বলিয়াছেন ঃ 'মালেকে ইয়াওমিদ্দীন।' অর্থাৎ, সেই খোদা প্রত্যেকের পুরস্কার বা শাস্তি স্বহস্তে ধারণ করেন।' তাঁহার এমন কার্য নির্বাহক নাই, যাহাকে তিনি পৃথিবী ও আকাশের আধিপত্য সঁপিয়া দিয়া স্বয়ং পৃথক হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিজে কিছুই করেন না। এমনও নহে যে, সেই কার্য নির্বাহকই যত পুরস্কার ও শাস্তি দেয় বা ভবিষ্যতে দিবে। তারপর তিনি বলিয়াছেন ঃ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ 'আল্‌-মালেকুল কুদ্দুস্‌।' অর্থাৎ, সেই খোদা বাদশাহ্‌, যাঁহার কোনই কলঙ্ক নাই। ইহা সুস্পষ্ট, মানুষের বাদশাহাত কলঙ্কহীন নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি কোন বাদশাহের সব প্রজা কষ্ট পাইয়া বা বিতাড়িত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশ অভিমুখে পলায়ণ করে, তবে তাঁহার বাদশাহী কায়েম থাকে না, কিংবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি সব প্রজা দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কোথা হইতে আসিবে? যদি প্রজাগণ বাদশাহের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দেয় যে, তাঁহার মধ্যে তাহাদের চেয়ে অধিক কি আছে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের নিকট তাঁহার কোন্‌ যোগ্যতা সাব্যস্ত করিবেন ? বস্তুতঃ খোদাতা'লার বাদশাহী এ প্রকারের নহে! তিনি মুহূর্তে সব দেশ লয় করিয়া অন্য সৃষ্টি পয়দা করিতে পারেন। যদি তিনি এইরূপ স্রষ্টা ও শক্তিমান না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাদশাহাত যুলুম নির্যাতন ছাড়া চলিতে পারিত না। কারণ তিনি একবার বিশ্ববাসীকে ক্ষমা এবং মুক্তি দান করিয়া অন্য জগৎ কোথা হইতে আনিতেন ? মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পৃথিবীতে পুনঃ প্রেরণের জন্য আবার ধর পাকড় ও যুলুমের পথে কি প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তিকে প্রত্যাহার করিতে হইত না? তদবস্থায়, তাঁহার খোদায়ীতে পার্থক্য ঘটিত এবং তিনি পৃথিবীর বাদশাহ্‌গণের ন্যায় এক কলঙ্ক কালিমা

লিপ্ত বাদশাহ্ হইয়া পড়িতেন, যাহারা দেশের জন্য আইন তৈরি করে, কথায় কথায় বিগড়াইয়া যায় এবং যাহারা নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যখন দেখিতে পায় যে, যুলুম ছাড়া গতি নাই, তখন তাহারা যুলুমকে মাতৃ-স্তনের দুগ্ধের ন্যায় মনে করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাজকীয় আইনে একটি জাহাজকে বাঁচাইতে একটি নৌকার সকল আরোহীকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করাকে ও কার্যতঃ বিনষ্ট করাকে সিদ্ধ রাখা হইয়াছে। কিন্তু খোদার পক্ষে এই প্রকার নাচার হওয়া অনুচিত। সুতরাং যদি খোদা সর্বশক্তিমান ও অনস্তিত্ব হইতে সৃষ্টিকারী না হইতেন তাহা হইলে তিনি হয় দুর্বল রাজাদের ন্যায় মহিমার পরিবর্তে অত্যাচারের দ্বারা কাজ লইতেন, অথবা বিচারক হইয়া খোদায়ীকেই বিদায় দিতেন। পরন্তু খোদার জাহাজ সকল মহিমার সহিত সাচ্চা ইনসাফের উপরে চালিতেছে। তিনি আবার বলিয়াছেনঃ 'আস্-সালাম' অর্থাৎ, সেই খোদা, যিনি ত্রুটি বিচ্যুতি, বিপদ আপদ ও কঠোরতা হইতে নিরাপদ, বরং শান্তিদাতা। ইহার অর্থও স্পষ্ট। যদি তিনি নিজেই বিপদগ্রস্ত হইতেন, লোকের হাতে মারা পড়িতেন এবং তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে এই মন্দ নমুনাকে দেখিয়া মন কি প্রকারে এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিত যে, এহেন খোদা আমাদিগকে নিশ্চয় আপদ-মুক্ত করিবেন। আল্লাহ্তা'লা মিথ্যা উপাস্যদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

'যেসব মানুষকে তোমরা খোদা বানাইয়া বসিয়া আছ তাহারা সকলে মিলিয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতে চাহিলেও, কখনও তাহা পারিবে না, এমনকি একে অপরকে সাহায্য করিলেও না। বরং যদি মাছি তাহাদের কোন জিনিস ছিনাইয়া লইয়া যায়, তবে সেই মাছি হইতে সেই বস্তু ফেরৎ আনিবার শক্তিও তাহাদের হইবে না।' তাহাদের উপাসকগণ বুদ্ধি এবং শক্তিতে দুর্বল। তিনিই খোদা, যিনি সকল শক্তিমান হইতে অধিক শক্তিশালী এবং সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। কেহ তাঁহাকে ধরিতে বা বধ করিতে পারে না। যাহারা ভ্রমে নিপতিত, তাহারা খোদার মর্যাদা বুঝে না এবং জানে না যে, খোদা কেমন হওয়া উচিত। তারপর বলিয়াছেনঃ 'খোদা শান্তি দাতা, স্বীয় কামালাত ও তৌহীদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকারী।' ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গীত করিতেছে যে, প্রকৃত খোদার মান্যকারী ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে লজ্জিত হইতে পারে না এবং সে খোদার সম্মুখেও লজ্জিত হইবে ন। কারণ তাহার কাছে শক্তিশালী যুক্তি থাকে। কিন্তু কৃত্রিম খোদায় বিশ্বাসী বড়ই বিপদে থাকে। সে যুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে নিরর্থক আজেবাজে কথাকে গোপন তত্ত্বরূপে আখ্যা দেয়, যাহাতে হাস্যাস্পদ হইতে না হয় এবং যেন প্রমাণিত ভ্রান্তিসমূহকে ঢাকা দিতে চাহে।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ اَلْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

অর্থাৎ, "তিনি সকলের রক্ষক, পরাক্রমশালী, নষ্ট হওয়া কাজকেও সুসম্পন্নকারী, তাঁহার সত্তা চূড়ান্তভাবে অভাবের অতীত।" তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ, 'তিনি এমন খোদা যে, তিনি সকল দেহেরও স্রষ্টা এবং সকল আত্মারও স্রষ্টা, গর্ভাশয়ে রূপশিল্পী। যত ভাল ভাল নাম ধারণা করা সম্ভব সব তাঁহারই ' তিনি আরও বলেন ঃ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ, 'আকাশমণ্ডলের প্রাণীরাও তাঁহার নাম পবিত্রতার সঙ্গে স্মরণ করে এবং পৃথিবীর প্রাণীরাও করে।' এই আয়াতে ইশারা রহিয়াছে যে, মহাকাশের অস্তিত্বসমূহে বসতি আছে এবং ঐ সকল প্রাণীরাও খোদার হেদায়তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। পুনরায় বলেন ঃ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ, 'খোদা সর্বশক্তিমান'। এই নাম উপাসকগণের জন্য বড়ই শান্তি প্রদায়ক। কারণ, খোদা যদি দুর্বল হন এবং শক্তিমান না হন, তবে এরূপ খোদার নিকট আমরা কি আশা করিব? তারপর বলেন ঃ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ـ অর্থাৎ, 'তিনিই খোদা, যিনি সকল জগতের পালনকর্তা, রহমান, রহীম এবং বিচার দিনের মালিক'। এই দিনের ক্ষমতা তিনি কাহারও হাতে দেন নাই। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী এবং জবাবদানকারী অর্থাৎ, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী। আবার বলিয়াছেনঃ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ অর্থাৎ, 'সদা বিদ্যমান, সকল প্রাণের প্রাণ এবং সব অস্তিত্বের আশ্রয়।' ইহা বলার কারণ, তিনি অনাদি ও অনন্ত না হইলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা রহিত যে, আমাদের পূর্বেই না তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায়। তারপর বলেনঃ 'সেই খোদা এক-অদ্বিতীয় খোদা। তিনি কাহারও পুত্র নহেন, এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে এবং কেহ তাঁহার স্ব-জাতীয় নহে। *(ইসলামী উসূল কী ফিলাসফী ঃ পৃঃ ১৫৮-১৬২ বাংলা অনুবাদঃ মরহুম এ, ইচ, এম, আলী আনওয়ার)*

"কত সুপ্রকাশিত আলো সেই সদা প্রভুর, সকল আলোকের উৎস যিনি।
দেখিবার তরে যাঁরে ম্রিয়মান সারা বিশ্ব দর্পণ হেন।।
চাঁদের পানে চাহিয়া কাল হয়েছিনু আমি অতি ব্যাকুল হিয়া।
রূপের ঝিলিক দিয়েছিল দেখা উহার মাঝে মম সখার।।
সৌন্দর্যের সেই বসন্তের তরে হৃদয় মোর উচ্ছ্বাসে আকুল।
বলিও না আমায় রূপের কথা তুর্কী বা তাতারীর।।
হে সখা! বিকশিত তব মহিমা অপার আকাশে ভূধরে।
যেদিকে তাকাই, দেখি সেদিকেই দরশনের পথ তোমার।।
সূর্যের কিরণ ধারায় প্রতিফলিত তব রূপের প্রবাহ।

প্রত্যেক তারকার মাঝে তোমারই জ্যোতির শোভা।।
আত্মাগুলির উপর তুমি আপন হস্তে সিঞ্চন করেছ লবন।
বিরহ জর্জরিত প্রাণগুলি হতে উঠেছে বিলাপ প্রেমের।।
প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মাঝে রেখেছ কত তুমি অপূর্ব গুণরাজি!
কে পাঠ করিতে পারে উহাদের মাঝে নিহিত মহা রহস্যাবলী ?
কেহ তব মহিমার নাহি পায় পার।
কে পারে খুলিতে গ্রন্থী জটিল রহস্যাবলীর।।
সুন্দর যারা, তাদের আনন তোমারই সৌন্দর্যের কান্তিতে উজ্জ্বল।
প্রত্যেক ফুল ও বাগিচা তোমারই বাগিচার রং ও সজীবতায় উজ্জ্বল।।
প্রত্যেক সুন্দরীর প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, মনে সদা তোমারই স্মরণ জাগায়।
প্রত্যেক কুঞ্চিত কেশদাম সঙ্কেতমান তোমারই পানে।।
শতেক পর্দার আড়াল পড়িয়াছে হায়, অন্ধগণের চক্ষে।
নচেৎ ছিল তব আনন অবিশ্বাসী বিশ্বাসী দুয়েরই কেবলা।।
হে প্রিয়তম! তীক্ষ্ণধার তরবারী সদৃশ তব প্রেমেভরা চাহনী।
যাহা পরকীয় চিন্তার সকল ঝঞ্ঝাটের ঘটায় অবসান।।
মিলন লাগি তব মাটিতে মিশিয়াছি আমি।
আশা এই, যদি উপশম হয় ইহাতেই ব্যথা বিরহের।।
মুহূর্তের তরে তোমা বিহনে শান্তি আমার নাই।
মুমূর্ষু রোগীর জীবনীসম ডুবিছে হৃদয় আমার।।
তোমার গবাক্ষ পথে কেন এ ক্রন্দন ধ্বনি, শীঘ্র শুধাও।
পাছে প্রেম-বহ্নির আবেষ্টনে এ দীনহীন প্রাণ হারায়"।।

(সুরমা চশ্‌মে আরীয়া ঃ পৃষ্ঠা-৪ - দ্রষ্টব্যঃ
'আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব'ঃ মরহুম মৌঃ মোহাম্মদ)

কুরআন করীমের অত্যুচ্চ শান ও মর্যাদা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে

"খাতামান্নাবীঈন" শব্দগুচ্ছ যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে বলা হয়েছে এর স্বতঃসিদ্ধ চাহিদা ও স্বভাবতঃই এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো যে, যে কিতাব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপর নাযেল হয়েছে তাও যেন "খাতামুল-কুতুব" (সকল কিতাবের খাতাম) হয়, আর সেমতে সার্বিক কামালাত (সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী) এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বস্তুতপক্ষে সার্বিক কামালাত এর মধ্যে মওজুদ রয়েছে। কেননা এলাহী কালামের (ঐশী বাণী) নাযেল হবার প্রণালী ও মূলনীতি এই যে, যে ব্যক্তির উপর সেই কালাম নাযেল হয় তার যে পরিমাণ পবিত্রকরণ শক্তি ও অভ্যন্তরীন কামাল- (গুণ ও বৈশিষ্ট্য) হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ শক্তি, শান ও মর্যাদা ঐ কালামেরও হয়ে থাকে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক) কামাল– গুণ ও বৈশিষ্ট্য যেহেতু সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল যা অপেক্ষা উচ্চতর কোনও মানুষের কখনও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না, সেহেতু কুরআন শরীফও যাবতীয় পূর্ব কিতাব ও সহীফাসমূহ অপেক্ষা সেই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম পর্যায়ে স্থান লাভ করেছে যেখানে অন্য কোনও ঐশী বাণী পৌছায়নি। কেননা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের স্বভাবজাত প্রতিভা ও ক্ষমতা ও পবিত্রকরণ শক্তি সর্বাধিক ছিল এবং কামাল– পূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাকাম ও মার্গসমূহ তাঁর উপর এসেই নিঃশেষ (খতম) হয়েছিল অর্থাৎ চরমত্ব লাভ করেছিল এবং তিনি সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হয়েছিলেন। উক্ত মাকাম ও মার্গে কুরআন শরীফ যেহেতু তাঁর উপরে নাযেল হয়েছে সেহেতু উহা চূড়ান্ত কামাল ও পূর্ণত্বে উপনীত হয়। আর যেমন নবুওয়তের কামালাত তাঁর উপর নিঃশেষিত হয়েগেছে, সেরূপ ঐশীবাণীর ই'জায বা অলৌকিকতার কামালাত- বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী কুরআন শরীফে নিঃশেষিত হয়েছে। তিনি (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন সাব্যস্ত হয়েছেন এবং তাঁর (আনীত) কিতাব 'খাতামুল-কুতুব' সাব্যস্ত হয়েছে। কালামের অলৌকিকত্বের যত মার্গ, মর্তবা ও কারণসমূহ (সম্ভাব্যরূপে) হতে পারে, সেসবগুলোর দিক দিয়ে তাঁর উপর নাযেলকৃত কিতাব চূড়ান্ত বিন্দু ও শীর্ষ-শিখরে উপনীত হয়ে আছে অর্থাৎ 'ফাসাহাত ও বলাগাত' (ভাষাগত উৎকর্ষতা ও প্রাঞ্জলতা)-এর দিক দিয়েই হোক, তার বিষয়বস্তুর পরম্পরতার দিক দিয়েই হোক, কিংবা শিক্ষামালার উৎকর্ষতার দিক দিয়েই হোক বা শিক্ষার পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়েই হোক অথবা শিক্ষার প্রতিফলন ও সুফলসমূহের

দিক দিয়ে হোক। মোট কথা, যে দিকেই তাকান সে দিক থেকেই কুরআন করীমের কামাল- পূর্ণ বৈশিষ্ট্যরাজী পরিলক্ষিত হয় এবং এর অলৌকিকত্ব সাব্যস্ত হয়। সেজন্যেই কুরআন করীম কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করার চ্যালেঞ্জ দেয় নি বরং সাধারণভাবে সর্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত পেশ করার দাবী জানিয়েছে, অর্থাৎ উৎকৃষ্টতার যে কোনও দিক দিয়ে ইচ্ছা মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছে- ভাষাগত উৎকর্ষ ও প্রাঞ্জলতার দিক দিয়ে হোক বা অর্থ, তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যাবলীর দিক দিয়ে হোক, অথবা শিক্ষার দিক দিয়ে কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের দিক দিয়েই হোক যা কুরআন করীমে মওজুদ রয়েছে। মোট কথা, কালামের উৎকর্ষতা ও অলৌকিকত্বের গুণ ও মানের যে কোনও দিক দিয়েই দৃষ্টিপাত করুন না কেন পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে মো'জেযা ও অলৌকিক বটে।" *(মালফুযাত ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬, ৩৭)*

"কুরআন শরীফ এরূপ এক মো'জেযা, না পূর্বে এর কোনও সমতুল্য হয়েছে, আর না পরবর্তীতে হবে। এর কল্যাণ ও আশিস-ধারা সদাসর্বদা অবারিত ও প্রবহমান। বস্তুতঃ ইহা প্রত্যেক যুগে সেরূপই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, দৃশ্যমান ও দেদীপ্যমান, যেমন ইহা ছিল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে। এছাড়া ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কথা তার প্রতিভা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যে পর্যায়ের তার প্রতিভা, সাহস ও উদ্যম; দৃঢ় সংকল্প এবং মহান উদ্দেশ্যাবলী হবে, সে পর্যায়েরই তাঁর কথাও হবে। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার ওহীর (ঐশীবাণীর) ক্ষেত্রেও সে একই রং ও রীতি বলবৎ থাকবে। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁর ওহী আসে সে যে পরিমাণ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল হবে সে পরিমাণ উচ্চ পর্যায়ের কালাম (ঐশীবাণী) সে পাবে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতিভা, ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং উদ্যম, সাহস ও সংকল্পের পরিধি যেহেতু অত্যন্ত প্রসারিত ও ব্যাপক ছিল, সেহেতু তিনি যে ঐশীবাণী লাভ করেছেন, তাও সেই পর্যায় ও স্তরের, যে অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ প্রতিভা, সাহস ও উদ্যমসম্পন্ন কখনও সৃষ্টি হবে না। কেননা তাঁর দাওয়াত (আহ্বান) কোনও সীমিত সময় অথবা কোনও নির্দিষ্ট জাতির জন্যে ছিল না, যেমন তাঁর পূর্ববতী নবীদের বেলায় ছিল। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ "বলে দাও, আমি তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল।") এবং مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "আমি তোমাকে নিখিল বিশ্বের করুণা ও রহমতস্বরূপ করেই প্রেরণ করেছি।" যে ব্যক্তির আবির্ভাবের পরিধি এত বিশাল ও ব্যাপক তাঁর মোকাবেলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে কে? এখন যদি কারও উপর কুরআন শরীফের কোন আয়াতও ইলহাম হয়; তাহলে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস এই যে, তার প্রতি এই ইলহামের মধ্যে (অর্থগত) পরিধি তত ব্যাপক হবে না যত ব্যাপক ছিল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে এবং তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে।" *(মালফুযাত ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭)*

"লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এই যে, কুরআন শরীফের অনুবর্তিতায় আল্লাহ্‌তা'লার আশিস ও বরকতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে থাকে, এক বিস্ময়কর সম্পর্ক মওলা করীমের সাথে কায়েম হয়ে যায় এবং খোদাতা'লার আলোকমালা ও ইলহামরাজি তাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। গোপন রহস্যাবলী ও তত্ত্বজ্ঞান তাদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়। এক শক্তিশালী 'তওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌তে আস্থা) তাদেরকে দান করা হয়। এক সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস তারা প্রদত্ত হন এবং এক অনাবিল ঐশী প্রেম যা আল্লাহ্‌র সুখময় সাক্ষাৎলাভ দ্বারা লালিত ও বিকশিত হয়ে থাকে- তাদের অন্তরে নিহিত করা হয়। যদি তাদের অস্তিত্বকে বিপদাবলীর হামনদিস্তায় পিষা হয় এবং কঠিন পেষণযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চিপা হয়, তাহ'লে ঐশী প্রেমের রস ছাড়া অন্য কিছু তাদের মধ্য থেকে বেরুবে না। দুনিয়া তাদের সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা দুনিয়া হতে দূরে এবং ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাদের সাথে খোদাতা'লার ব্যবহার অলৌকিক পর্যায়ের। তাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, খোদা মওজুদ আছেন। তাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে যে, একজন আছেন- যখন তারা দোয়া করে, তখন তিনি তাদের দোয়া শোনেন। যখন তারা তাঁকে ডাকে, তিনি সাড়া দেন। যখন তারা আশ্রয় ভিক্ষা করে, তখন তিনি তাদের দিকে ধাবিত হন। তিনি পিতাদের চাইতেও অধিক ভালোবাসেন এবং তাদের ঘর দোরে কল্যাণ ও আশিসের বারি বর্ষণ করেন। অতএব, এহেন ব্যক্তিরা তাঁর গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য ও সমর্থনাবলীর দ্বারা পরিচিত হন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাদের সাহায্য করেন কেননা তারা তাঁরই এবং তিনি তাদের। এ বিষয়গুলো প্রমাণবিহীন নয়।" *(সুরমা চাশ্‌মে আরিয়া, পৃঃ ২৪-৩১)*

"সবচেয়ে সোজা পথ এবং বৃহৎ উপায়- যা একীন এবং নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় ভরপুর এবং আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও জ্ঞানোন্মেষের জন্যে পরিপূর্ণ পথনির্দেশক, তা হলো কুরআন করীম, যা সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয় বিরোধ মীমাংসার জন্যে উপযুক্ত অভিভাবক হয়ে এসেছে। এর প্রতিটি আয়াত এবং প্রতিটি শব্দ সহস্র ধরণের ধারাবাহিকতার নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে। এর মধ্যে ভরে রয়েছে আমাদের জীবনের জন্যে বহুল পরিমাণ অমৃতসুধা, আর লুকিয়ে আছে এর ভেতরে বহুল পরিমাণ দুর্লভ অমূল্য মনি-মাণিক্য ও জহরত, যা দৈনন্দিন নিত্য প্রকাশিত হয়ে চলেছে। একমাত্র ইহাই একটি উত্তম কষ্টিপাথর যদ্বারা আমরা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। ইহাই একটি আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ যা সুস্পষ্টতঃ ও নিশ্চিতরূপে সত্যের পথসমূহ দেখায়। নিঃসন্দেহে সত্যের সাথে যাদের মন-মানসিকতার মিল ও এক প্রকার সংশ্রব ও সংযোগ আছে তাদের অন্তঃকরণ কুরআন শরীফের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। বস্তুতঃ খোদাতা'লা এমন করেই তাদের হৃদয় তৈরী করেছেন যে, তারা প্রেমিকের ন্যায় নিজেদের এই প্রেমাস্পদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ইহা ব্যতীত কোথায়ও তারা স্বস্তি

পান না। এর কাছে একটি সরল-সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট কথা শুনে নেয়ার পর আর অন্য কারও কথা তারা শুনেন না। আনন্দচিত্তে ধাবিত হয়ে এর প্রতিটি সত্যকেই তারা গ্রহণ করে নেন। আর ঐ সত্যই পরিশেষে মেধা, মস্তিষ্কের ঔজ্জ্বল্য ও কল্পনাতীত রহস্যাবলী এবং অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কারসমূহ উদ্‌ঘাটনের উপায়স্বরূপ নিরূপিত হয় এবং তাদের সকলকে যোগ্যতানুসারে উন্নতির মে'রাজে (শীর্ষ শিখরে) পৌঁছিয়ে দেয়। সত্যপরায়ণদের পক্ষে কুরআন করীমের আলোকমালার ছত্রছায়ায় চলার প্রয়োজন সর্বদাই হয়ে এসেছে এবং যখনই কোন সময় যুগের পরিবর্তিত কোন নতুন অবস্থা ইসলামের সাথে অন্য কোন ধর্মের সংঘর্ষ বাধিয়েছে, তখনই যে তীক্ষ্ণ ও কার্যকর অস্ত্র তাৎক্ষণিকভাবে কাজে এসেছে তা হলো কেবল কুরআন করীমই। আর তেমনি যখনই কোথাও দার্শনিক ধ্যান-ধারণা বিরূপ ধারায় প্রসার লাভ করেছে তখনই সে অপবিত্র ক্ষতিকর বৃক্ষের মূলোৎপাটন করেছে একমাত্র কুরআন করীমই, এবং ওটাকে এত তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত করে দেখিছে যে দর্শকদের সামনে আয়নার মত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সত্যিকার দর্শন এইটি, ঐটা নয়। বর্তমান যুগেও যখন প্রথম খ্রীষ্টান উপদেষ্টারা মাথা চাড়া দিলো, বিকৃত ধ্যান-ধারণার শিকার বিপথগামী ও নির্বোধ লোকদেরকে তৌহীদ থেকে বিছিন্ন করে একজন অক্ষম-অধম বান্দার উপাসকে পরিণত করতে প্রয়াস পেল এবং নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতারণামূলক পন্থায় সাজিয়ে তাদের সামনে উপস্থাপিত করলো এবং ভারতবর্ষে এক ঝড় তুলে দিল, তখন পরিশেষে কুরআন করীমই ছিল যা তাদেরকে এমনভাবে পশ্চাদপসারণে বাধ্য করলো যে, এখন তারা কোন ওয়াকেফহাল মানুষকে মুখও দেখাতে পারে না। তাদের দীর্ঘ ফিরিস্তির ওজর-আপত্তিকে এরূপ আলাদা করে রেখে দিল, যেরূপ কোন কাগজের পাতাকে ভাঁজ করে দেয়া হয়।"

(ইযালা-এ-আওহাম ঃ পৃঃ ২৮১-২৮২)

"মানুষের পক্ষে আবশ্যক, সে যেন পাপের ধ্বংসকারী আবেগ অনুভূতিমুক্ত হয় এবং খোদাতা'লার মাহাত্ম্য যেন এতখানি তার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিজলীর ন্যায় পতিত কুপ্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনা যা তার তাক্‌ওয়া ও নিষ্ঠার পুঁজিকে ভস্মীভূত করে দেয়, তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু হিস্টেরিয়া রোগের মত আক্রমণ ক'রে পুণ্যকে নষ্ট করে এরূপ নাপাক আবেগের তাড়না কেবল নিজের মনগড়া কল্পিত পরমেশ্বরের দ্বারা কি ক'রে দূর হতে পারে? অথবা কেবল নিজের সাব্যস্তকৃত ধ্যান-ধারণার দ্বারা কি ক'রে দমিত ও প্রশমিত হতে পারে? অথবা এরূপ কোন প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস দ্বারা রোধ হতে পারে কি, যার দুঃখ-বেদনা নিজের আত্মাকে স্পর্শও করেনি? কখনও তা হতে পারে না। এ বিষয়টি উড়িয়ে দেয়ার মত একটা সাধারণ বিষয় নয়। বরং বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা চিন্তা-ভাবনা ও প্রণিধানযোগ্য কেবল এ বিষয়টিই যে, (আল্লাহ্‌র প্রতি) ঔদাসীন্য ও ঔদ্ধত্য, নির্লিপ্ততা ও সম্পর্কহীনতার কারণে যে ধ্বংস নেমে আসে যার মূল হচ্ছে পাপ ও অবাধ্যতা- তা থেকে কি করে সে নিরাপদ থাকবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষ নিশ্চিৎ স্বাদকে কেবলমাত্র কাল্পনিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা ছেড়ে দিতে পারে

না। তবে, একটি একীন ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ই অপর এক নিশ্চিৎ বিষয় হতে নিবৃত্ত করতে পারে। যেমন, কোন অরণ্য সম্বন্ধে একটি একীন বা বিশ্বাস হলো এই যে, সেখান থেকে আমরা বেশ কিছু হরিণ সহজেই ধরতে পারবো এবং আমরা এই একীনের জোরে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন আবার আর একটি একীনের উদ্ভব হবে যে, সেখানে পঞ্চাশটি সিংহও রয়েছে এবং হাজার হাজার ভয়ঙ্কর অজগরও আছে যেগুলি মুখ বিস্ফারিত করে বসে আছে; তখন আমরা পূর্ববর্তী আকাঙ্খা হ'তে নিবৃত্ত হয়ে পড়বো। অনুরূপ, উক্ত পর্যায়ের একীন ব্যতিরেকে পাপ দূর হতে পারে না। লোহা লোহার দ্বারাই ভঙ্গ হয়। খোদাতা'লার মাহাত্ম্য ও প্রতাপের এরূপ একীন চাই, যা গাফলত বা ঔদাসীন্যের পর্দাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় এবং দেহে এক কম্পনের সৃষ্টি দ্বারা মৃত্যুকে নিকটবর্তী দেখায় এবং হৃদয়ে ভীতি এরূপ প্রবল করে তুলে, যদ্দরুন 'নফ্‌সে আম্মারাহ্‌' বা কুপ্ররোচনাকারী আত্মার সমস্ত বেড়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষ এক অদৃশ্য হাতের সাহায্যে খোদার দিকে আকর্ষিত হয় এবং তার অন্তরাত্মা এই একীনে ভরে উঠে যে, বস্তুতপক্ষেই খোদা মওজুদ আছেন, যিনি নির্বিকার উদ্ধত অপরাধীকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেন না। অতএব, একজন সত্যিকার পবিত্রতা-প্রত্যাশী ব্যক্তি সেই শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নিয়ে করবেই বা কি, যদ্বারা উক্ত প্রয়োজনটি পূর্ণ হয় না।

সেজন্যে আমি প্রত্যেকের কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরছি যে, সেই কিতাব (বা গ্রন্থ) যা উক্ত প্রয়োজনগুলিকে পুরা করে তা হলো কুরআন শরীফ। এর মাধ্যমেই খোদার দিকে মানুষের এক আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং দুনিয়ার ভালবাসা বা সংসারাসক্তি শীতল হয়ে পড়ে। তাঁর আজ্ঞানুবর্তিতার দ্বারা পরিশেষে সেই খোদা যিনি অতীব গোপন, নিজেকে প্রকাশিত করেন। সেই সর্বশক্তিমান, যাঁর কুদরত ও ক্ষমতাসমূহ অপরাপর জাতি অবহিত নয়, সেই খোদা পবিত্র কুরআনের অনুশীলন ও অনুবর্তিতাকারী ব্যক্তির নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন এবং প্রকৃত কর্তৃত্ব ও শাসনের আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যাবলী অবারিত করে দেন। 'আমি মওজুদ আছি' বলে স্বীয় কণ্ঠস্বর (বাণী) দ্বারা তিনি নিজের উপস্থিতি ও অস্তিত্বের সংবাদ তাকে দান করেন। কিন্তু বেদশাস্ত্রে সে ক্ষমতা ও দক্ষতা নেই, আলবৎ নেই। বস্তুতঃ বেদ সেই পচা-গলা বস্তার মত, যার মালিক পরলোকগত হয়েছে অথবা যার সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যায় না যে, এটা কার। যে পরমেশ্বরের দিকে বেদ আহ্বান জানায় তার জীবিত থাকা সপ্রমাণিত হয় না। পরমেশ্বর সত্যি যে মওজুদ আছেন তার উপর কোন দলিল প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে না। অধিকন্তু বেদের বিভ্রান্তিকর শিক্ষা সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভের পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। কেননা এর শিক্ষানুযায়ী আত্মা এবং পরমাণু (পদার্থসমূহ) সবই অনাদি এবং অসৃষ্ট। অতএব, অসৃষ্টের দ্বারা সৃষ্টিকারীর কিরূপেই বা সন্ধান পাওয়া সম্ভব? আর তেমনি বেদ ঐশীবাণীর দ্বার রুদ্ধ করে এবং খোদাতা'লার তাজা ও নিত্যনতুন নিদর্শনাবলী প্রদর্শনকে অস্বীকার করে। বেদ অনুযায়ী পরমেশ্বর তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের সমর্থনে কোনও এরূপ নিদর্শন দেখাতে পারেন না, যা সর্বসাধারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও

অভিজ্ঞতার উর্দ্ধতর হয়। অতএব, বেদ সম্বন্ধে যদি খুবই সুধারণা পোষণ করা যায়, তাহলে কেবল এটুকুই বলা যাবে যে, বেদ কেবল সামান্য ও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের ন্যায় খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং খোদার অস্তিত্বের উপর কোন সন্দেহাতীত দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টিকারী সুনিশ্চিত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে না। মোটকথা, বেদ সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে অক্ষম, যা নিত্যনতুন খোদাতা'লার তরফ থেকে আসে এবং মানুষকে পাতাল থেকে তুলে আকাশে পৌছায়। কিন্তু আমাদের চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের সাক্ষ্য এই যে, কুরআন শরীফ স্বীয় আধ্যাত্মিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং সাক্ষাৎ আলোর দ্বারা সত্যনিষ্ঠ অনুসারীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, তার হৃদয়কে আলোকিত করে, তারপর বড় বড় নিদর্শন দেখিয়ে খোদাতা'লার সাথে এরূপ দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে, যা উদ্যত তলোয়ার দ্বারাও ছিন্ন হতে পারে না। কুরআন করীম মানব হৃদয়ের চোখ খুলে দেয় এবং পাপের পঙ্কিল উৎসকে রোধ করে এবং খোদাতা'লার মধুর বাণী ও সম্ভাষণের দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করে, অদৃশ্যের সংবাদ ও জ্ঞান দান করে এবং দোয়া কবুল হওয়া সম্বন্ধে ঐশী-বাণীর দ্বারা অবহিত করে। যারা ঐ ব্যক্তির মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যিনি কুরআন শরীফের সত্যিকার অনুসারী, খোদাতা'লা তাঁর ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাদের উপর সুস্পষ্ট করে দেন যে, তিনি সেই বান্দার সাথে আছেন যে তাঁর এই পবিত্র কালামের অনুবর্তিতা করে।" *(চাশমা-এ মা'রেফাত ঃ পৃঃ ২৯১-২৯৫)*

"কুরআন করীমের অনুসারীগণ যে পুরস্কারসমূহ লাভ করেন এবং যে সকল বিশিষ্ট অনুগ্রহরাজী পাওয়ার সৌভাগ্য তাদের ঘটে, যদিও তা বর্ণনাতীত তথাপি সেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি এরূপ মহান পুরস্কার রয়েছে, যা এখানে সুপথের অন্বেষণকারীদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন হবে বলে সেগুলো নিম্নে লিখিত হলোঃ

সেগুলোর মধ্যে একটি হলো 'উলুম ও মাযারেফ' (জ্ঞানরাশী ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী), যা পূর্ণ অনুসারীগণ ফুরকানী (তথা সত্য ও মিথ্যা প্রভেদকারী কুরআনের) কল্যাণ ভাণ্ডার থেকে লাভ করে থাকেন। যখন মানুষ ফুরকান মজীদের সত্যিকার অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং নিজ সত্তা ও আত্মাকে এর আদেশ ও নিষেধাবলীর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে এবং পরিপূর্ণ প্রীতি ও নিষ্ঠার সাথে এর নির্দেশাবলীর দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হয় এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোনও বিঘ্ন ও বিমুখতা আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন তার দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তিকে মহান দানশীল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক নূর (জ্যোতিঃ) প্রদান করা হয় এবং এরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় তাকে ভূষিত করা হয় যদ্দরুন আল্লাহ্‌র কালামে লুক্কায়িত ঐশীজ্ঞানের বিস্ময়াতীত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী তার কাছে উন্মোচিত হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের বারিধারা তার হৃদয়ের উপর বর্ষিত হয়। এই

সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বকেই ফুরকানে মজীদে 'হিকমত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যথা, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন ঃ

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

"খোদা যাকে চান হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন আর যাকে হিকমত দান করা হয়েছে বস্তুতঃ তাকে ঢের কল্যাণ দান করা হয়েছে।" অর্থাৎ হিকমত বহুল পরিমাণ কল্যাণ সম্বলিত এবং যে হিকমত পেল, সে বহু কল্যাণে ভূষিত হলো। অতএব, এই সকল জ্ঞানরাজী ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী যাকে অন্য কথায় হিকমত বলে অভিহিত করা হয়েছে তা বহুল পরিমাণ কল্যাণের সমষ্টি হওয়ার কারণে এক বিশাল সমুদ্র তুল্য যা কালামে ইলাহীর (ঐশী-বাণীর) অনুসারীদেরকে দান করা হয়। তাদের দৃষ্টি, চিন্তা ও বিশ্লেষণ-শক্তিতে এরূপ এক কল্যাণ ও আশিস নিহিত করা হয়, যার ফলে অতি উচ্চ পর্যায়ের "হাকায়েকে হাক্কা" – সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যসমূহ তাদের আয়নার মত স্বচ্ছ আত্মায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হতে থাকে এবং পূর্ণ সত্যাবলী তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত ও উন্মোচিত হতে থাকে। ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যেক গবেষণা ও বিশ্লেষণ কালে এমন উপকরণ তাদের জন্যে সরবরাহ করে, যার ফলে তাদের বর্ণিত বিষয় কখনও অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত থাকে না। কোন ভুল-ভ্রান্তিও সংঘটিত হয় না। অতএব, যে যে জ্ঞানরাশী ও সূক্ষ্মতত্ত্বলী, অকাট্য যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ তাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয় তা গুণে ও মানে এবং সংখ্যা ও পরিমাণে এরূপ পরিপূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হয়। যা অভূতপূর্ব ও অলৌকিক এবং যার তুলনা ও মোকাবেলা করা অন্য লোকদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা তা আপনা-আপনিই আসে না বরং অদৃশ্যভাবে বুঝানো হয়। স্বয়ম্ভু খোদার সাহায্য সমর্থন তাদের পথপ্রদর্শক হয়। সেই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার দ্বারাই পবিত্র কুরআনের ঐ গোপন রহস্যাবলী ও জ্যোতিসমূহ তাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়, যা নিছক মেধা ও বুদ্ধিমত্তার ধূয়াযুক্ত আলো দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না। ঐ জ্ঞানরাশী ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী যা তাদেরকে দান করা হয় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার মহান সত্তা ও তাঁর পূর্ণ গুণাবলী এবং পরকালীন আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে অতি স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ও গভীর সত্যসমূহ তাদের উপর প্রকাশিত হয়, তা এক আধ্যাত্মিক অলৌকিক ঘটনাবলীর সমষ্টি বটে। ইহা পরিপক্ক ও পরিণত দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকদের দৃষ্টিতে দৈহিকভাবে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীর চাইতে উচ্চতর ও উত্তম বলেই প্রতীয়মান। গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, তত্ত্বদর্শী (আরেফীন) ও আল্লাহ-যুক্ত মহাপুরুষদের শান ও মর্যাদা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে এইসব (জ্ঞানমূলক আধ্যাত্মিক) অলৌকিক বিষয়ের দ্বারাই পরিচিত ও প্রতিভাত হয়। এই শ্রেণীর অলৌকিক ব্যাপারাদিই তাঁদের উচ্চাসনের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার এবং ভূষণবিশেষ, এবং তাদের 'সালাহিয়্যত' – স্বভাবজ ক্ষমতা ও যোগ্যতার মুখশ্রী ও মাধুর্যস্বরূপ হয়ে থাকে। কেননা ইহা মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের অন্তর্গত যে, জ্ঞানরাশী এবং সত্যিকার সূক্ষ্মতত্ত্বলীর প্রতাপ তার উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং সত্যতা ও তাত্ত্বিকতার কাছে অন্য প্রতিটি বিষয়ের চাইতে অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে। বস্তুতঃ

একজন সংসারত্যাগী উপাসক সম্বন্ধে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তিনি কাশ্‌ফ ও দিব্যশক্তির অধিকারী এবং অজ্ঞেয় ও অদৃশ্য সংবাদাদি সম্বন্ধেও তিনি জ্ঞাত হন, কঠোর তপ-যপ ও সাধ্য-সাধনাও পালন করেন এবং আরও অনেক প্রকারের অলৌকিক কান্ডও তার দ্বারা সংঘটিত হয় কিন্তু ইল্‌মে ইলাহী (ঐশী-জ্ঞান) সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ, এমন কি হক্‌ ও বাতিল (সত্য ও মিথ্যা)-এর মধ্যে পার্থক্যই নির্ণয় করতে পারেন না বরং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাসমূহের জঞ্জালেই আবদ্ধ এবং অসত্য আকায়েদের (বিশ্বাসের) মধ্যে পড়ে আছেন, আর প্রত্যেক বিষয়ে অপক্ক এবং প্রতিটি রায়ে বেফাশ ভুল করেন, তাহলে এইরূপ ব্যক্তি সুস্থ-সরল ও রুচীশীল লোকদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও হেয় বলেই প্রতিপন্ন হবেন। কারণ যে ব্যক্তির কাছে জ্ঞানী ব্যক্তি জাহালত ও অর্বাচীনতার গন্ধ পান এবং যখন আহাম্মকসূলভ কোন কথা তার মুখে শুনতে পান, তৎক্ষণাৎ তার দিক থেকে অশ্রদ্ধায় মন ফিরে যায় এবং সে ব্যক্তি বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে আর কোন মতেই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না। যদিও সে যতই আবেদ-জাহেদ হোক না কেন, হাল্কা ও তুচ্ছ বলে মনে হয়। মানুষের এই প্রকৃতিগত স্বভাবের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আধ্যাত্মিক অলৌকিকতা অর্থাৎ 'উলুম ও মায়া'রেফ' (জ্ঞানরাশী ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী) তার দৃষ্টিতে 'আহ্‌লুল্লাহ্‌র' (আল্লাহ্‌যুক্ত মহাপুরুষের) ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্তস্বরূপ এবং 'আকাবেরে দীনের' (ধর্মীয় উচ্চমার্গের ব্যক্তিত্বদের) সনাক্ত ও পরিচিতির জন্যে অনিবার্য বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণাবলীর অন্যতম। অতএব, এই লক্ষণসমূহ কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুসারীদের পরিপূর্ণরূপে দান করা হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশদের প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর "উম্মীয়াত" (নিরক্ষরতা) প্রবল থাকে, অর্থাৎ প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁরা পুরোপুরিভাবে অর্জন না করা সত্ত্বেও চৌম্বিক সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী ও ইল্‌মে-ইলাহীর (ঐশী-জ্ঞানের) ক্ষেত্রে তাদের সমসাময়িকদেরকে এরূপ অতিক্রম করে যান যে, প্রায়শঃ বড় বড় বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁদের বক্তৃতা ও লিখাসমূহ পাঠ করে বিস্ময়াবিভূত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তরূপে বলে উঠেন যে, তাঁদের উলুম ও মায়া'রেফ (জ্ঞান-তত্ত্ব) অন্য কোন এক জগতের, যা ঐশী-সহায়তা ও সমর্থনের বিশেষ রঙে রঙীন। বস্তুতঃ এর আরও একটি প্রমাণ এই যে, কোন অস্বীকারকারী যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্বরূপ 'ইলাহিয়াতে'র (আল্লাহ্‌ ও দীন সম্পর্কীয় জ্ঞানের) পর্যালোচনামূলক বিষয়ে কোনও তাঁদের গবেষণালব্ধ সারগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ (আরেফানা) বক্তব্যের সাথে বিরুদ্ধবাদীর কোনও ভাষ্য তুলনা করতে চায়, তাহলে অনিবার্যরূপে ন্যায়বিচার ও সততার নিরিখে, তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রকৃত ও যথার্থ সত্য তাঁদের মুখ দিয়ে নিঃসৃত বক্তব্যেই ছিল। আর বিতর্ক যতই গভীরে যেতে থাকবে ততই বহুল পরিমাণ আরও এরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব বেরিয়ে আসবে, যার দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় তাঁদের সত্যবাদিতা প্রস্ফুটিত হতে থাকবে। সুতরাং প্রত্যেক সত্যান্বেষীর সামনে এর প্রমাণ পেশ করার জন্যে আমি নিজেই দায়িত্ব নিচ্ছি।

ঐসব অনুগ্রহরাজীর মধ্যে "ইসমাত" عصمة (সংরক্ষণ)ও অন্যতম, ইহাকে 'হিফ্‌যে-ইলাহী' (আল্লাহ্‌র হেফাজত) বলেও অভিহিত করা হয়। এই 'ইসমাত' ও

ফুরকান মজীদের পরিপূর্ণ অনুসারীদেরকে অলৌকিকতা পর্যায়ে দান করা হয়। এস্থলে 'ইসমাত' দ্বারা আমরা এই বুঝাতে চাই যে, যে সব গর্হিত স্বভাবে, নিন্দনীয় অভ্যাস ও ধ্যান-ধারণায় ও অসৎ চরিত্রতায় এবং কুকর্মে অন্য সব লোককে রাত-দিন লিপ্ত দেখা যায়, তাথেকে তাঁদেরকে নিরাপদ রাখা হয়। যদি কোন পদস্খলন ঘটেও যায়, তাহলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যথাশীঘ্র তাঁদের প্রতিকার করে নেয়। ইহা স্পষ্ট যে, 'ইসমাত'-এর মাকাম অত্যন্ত দুর্লভ এবং 'নফ্‌সে আম্মারাহ্‌'র (কুপ্রবৃত্তিমূলক আত্মার) প্রভাব ও আবেদনের বহু উর্ধ্বে, যা লাভ করা আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভবপর নয়। যেমন, কাউকে যদি বলা হয় যে, সে যেন কেবলমাত্র মিথ্যা এই একটি অভ্যাস থেকে নিজের সার্বিক আচার-আচরণ ও ব্যাপারাদিতে এবং কথোপকথনে ও পেশাবৃত্তিতে সম্পূর্ণ বিরত থাকে, তাহলে এটা তার জন্যে কঠিন বরং একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তথাপি তদ্রূপ করতে যদি সে চেষ্টাও করে তাহলে এত বেশী প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধের সে সম্মুখীন হয় যে, পরিশেষে তার এই নীতি হয়ে যায় যে, দুনিয়াদারীতে মিথ্যে ও ঘটনা-বিরুদ্ধ কথা বলা থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যবান লোকদের জন্যে, যাঁরা সত্যিকার প্রেম ও শ্রদ্ধাভরে ফুরকান-মজীদের হেদায়াতসমূহ মেনে চলতে চান, তাদের জন্যে মিথ্যের কু-অভ্যাস হতে বিরত থাকা সহজ করে দেয়া হয়। বরং তাঁরা প্রত্যেক অকরণীয় কাজ ও অনির্বচনীয় কথা সর্বতঃ পরিহারে সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ হতে তওফীক লাভ করেন। খোদাতা'লা তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহের দ্বারা ঐরূপ অবাঞ্ছিত উপলক্ষ্যসমূহ থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখেন যেগুলির কারণে তাঁরা (রূহানী) ধ্বংসের কবলে পড়তে পারেন। কেননা তাঁরা জগতের আলো (নূর) হয়ে থাকেন। তাঁদের সালামত ও নিরাপত্তায় জগতের নিরাপত্তা ও তাদের ধ্বংসে জগতের ধ্বংস। এই দিক থেকেই তাঁরা নিজেদের প্রতিটি ধ্যান-ধারণায়, জ্ঞান-বোধে, কাম-ক্রোধ ও লোভে, ভীতিতে, সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায়, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় সব ধরনের অশিষ্টাচার, অহেতুক ধ্যান-ধারণা, অশুদ্ধ জ্ঞান-বিদ্যা, অবৈধ কাজ-কর্ম, ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও বাসনা-কামনার মাত্রাহ্রাস ও বৃদ্ধি হতে তাঁদেরকে রক্ষা করা হয়। তাঁরা কোনও নিন্দনীয় বিষয়ে থাকতে পারেন না। কেননা স্বয়ং খোদাতা'লা তাঁদের তরবীয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবক হয়ে থাকেন এবং তাঁদের পবিত্র জীবন-বৃক্ষে যে শাখাটি শুষ্ক দেখেন সেটাকে তৎক্ষণাৎ নিজের অভিভাবকসুলভ হাতে কেটে দেন। আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ও সংরক্ষণ সর্বদা ও সর্বক্ষণ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে থাকে। 'মাহফুযীয়্যতে'র (সংরক্ষণের) এই কল্যাণ যা তাদেরকে দান করা হয় এটিও প্রমাণবিহীন নয়। বরং বিচক্ষণ মানুষ কিছু কাল তাঁর সাহচর্যে থেকে সে-ব্যক্তিকে সন্তোষজনকভাবে জানতে ও সনাক্ত করতে পারেন।

সেসব পুরস্কারের মধ্যে আর একটি হলো তওয়াক্কুলের (আল্লাহ্‌তে আস্থা ও নির্ভরতার) মাকাম, যার উপর অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তারা ব্যতীত

অপর কেউ ঐ স্বচ্ছ নির্ঝরণী কখনও লাভ করতে পারে না, বরং তাদের জন্যেই তা উপভোগ্য ও সামনজস্যপূর্ণ করা হয়। তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিঃ তাদেরকে এরূপে আগলিয়ে রাখে যে, তাঁরা প্রায়শঃ নানা ধরনের উপায়হীনতার মাঝে সাধারণ পার্থিব উপকরণাদি হতে সম্পূর্ণ দূরে থেকেও এরূপ আনন্দ ও প্রফুল্লতার সাথে জীবন যাপন করেন ও এত স্বস্তি ও নির্মলতার সাথে সময় কাটান, যেন তাঁদের কাছে সহস্র সহস্র ধনভাণ্ডার মওজুদ। তাদের চেহারায় বিত্তশীলতার সজীবতা পরিলক্ষিত হয়, ধনবান হবার অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততা পরিদৃষ্ট হয়। অভাব-অনটনের অবস্থার মধ্যেও উদারচিত্ত ও পূর্ণ একীনের সাথে মওলা করীমের উপর ভরসা রাখেন। ত্যাগের স্বভাব তাদের আদর্শ হয় এবং সৃষ্টজীবের খেদমত ও মানব-সেবা তাদের অভ্যাস। কখনও সংকীর্ণতা তাদের জীবনের অঙ্গণে পা রাখতে পারে না যদিও সারা জাহান তাদের পোষ্য হয়। বস্তুতপক্ষে খোদাতা'লার 'সাত্তারিয়্যত' (ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখার গুণ) তাদের উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বাধ্যকর করে যা সর্বক্ষেত্রে তাদের পর্দাপোশী করে এবং কোন সাধ্যাতীত বিপদ আসার পূর্বেই তাদেরকে তিনি তাঁর স্নেহ-মমত্বের কোলে তুলে নেন যেমন তিনি নিজেই বলেছেন ঃ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ "তিনি পুণ্য-বানদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেন"- অনুবাদক)। কিন্তু অন্যদেরকে দুনিয়াদারীর বেদনা ও যন্ত্রণা-দায়ক উপায়-উপকরণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয়। বস্তুতঃ ঐ অলৌকিক স্বভাবটি এই বিশিষ্ট লোকদের ক্ষেত্রেই বিকশিত করা হয়। তা অন্য কারও মধ্যে প্রকাশ পায় না। তাঁদের উক্ত বৈশিষ্ট্যও (এই অধমের) সাহচর্যের দ্বারা খুব শীঘ্র সপ্রমাণিত হতে পারে।

ঐ পুরস্কারসমূহের মধ্যে আর একটি হলো 'মহব্বতে যাতি' (সাক্ষাৎ ঐশী-প্রেম)-এর মাকাম, যার উপর কুরআন করীমের পূর্ণ অনুসারীদের প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাদের শিরায় শিরায় ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঐশী-প্রেম এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, উহা তাদের সত্তার মূল ও প্রাণস্বরূপ হয়ে যায়। প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতি এক অদ্ভুত ধরনের প্রেম তাদের অন্তরে উদ্বেলিত ও উচ্ছলিত হয় এবং এক অলৌকিক ধরনের আসক্তি ও অনুরাগ তাদের স্বচ্ছ হৃদয়পটে প্রাধান্য বিস্তার করে, যা তিনি ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় এবং ঐশী-প্রেম-শিখা এমনই প্রজ্জ্বলিত হয়, যা সহচরদের কাছে বিশেষ সময়ে প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয়। খাঁটি প্রেমিকগণ যদি প্রেমের সেই আতিশয্যকে কোনও কৌশলে গোপন রাখতেও প্রয়াস পান, তা তাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তদ্রুপ পার্থিব ('মাজাযী') প্রেমিকদের পক্ষেও তাদের প্রেমাস্পদকে দেখার জন্যে তারা যে মরিয়া হয়ে উঠে, তাঁদের প্রেমের ব্যাপরটিও সাথী-সঙ্গীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বরং ঐ প্রেম যা তাঁদের কথায়, তাঁদের চোখে-মুখে, তাঁদের আচরণে ও স্বভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট ও সঞ্চালিত হয়, যেন তাদের লোমকূপ দিয়েও প্রকাশিত হয়ে পড়ছে- সেই প্রেমকে তাঁরা গোপন রাখার চেষ্টা করলে তা কখনও গোপন থাকতে পারে না। হাজার চেষ্টা করলেও তার কোনও না কোন চিহ্ন বা

লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাপূর্ণ তাদের এই 'সিদ্‌কে কদমে'র (নিষ্ঠাপূর্ণ পদক্ষেপের) লক্ষণ ও চিহ্ন এই যে, তাঁরা তাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদকে যে কোন মূলে গ্রহণ করেন ও প্রত্যেক বিষয়ের উপর অগ্রগণ্য করেন। অতএব, প্রেমাস্পদের দিক থেকে যদি দুঃখ-কষ্টও আসে তাহলে সাক্ষাৎ ঐশী-প্রেমের আতিশয্যে ও প্রাবল্যের দরুন সে দুঃখ-বেদনাকেও পুরস্কারের রঙে দেখেন, আযাবকেও সুমিষ্ট শরবতের মত মনে করেন। কোন তলোয়ারের তীক্ষ্ণধার তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। খুব বড় ধরনের বিপদও প্রেমাস্পদের স্মরণে কোন বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁকেই তারা আপন প্রাণের আত্মা মনে করেন। তাঁর প্রেমেই অশেষ স্বাদ অনুভব করেন। কেবল তাঁর সত্তাকেই একমাত্র সত্তা ভাবেন এবং তাঁরই যিক্‌র-(স্মৃতিচারণ)কে নিজের জীবনের আসল পাওয়া বলে নির্ধারণ করেন। তাঁরা কেবল তাঁকেই চান, আর কেবল তাঁকেই নিজের বলে জানেন এবং তাঁরই হয়ে যান। তাঁরই জন্যে বেঁচে থাকেন আর তাঁরই জন্যে মৃতুবরণ করেন। তাঁরা জগতে বাস করেও করেন না। হুশে থেকেও (তাঁরই জন্যে) বেহুঁশ হয়ে থাকেন। তাঁরা না সম্মান-মর্যাদার জন্যে লালায়িত, না নামের জন্যে। না নিজের প্রাণের পরোয়া, না নিজের আরামের খেয়াল। বরং সবকিছু কেবল একজনের জন্যে জলাঞ্জলি দেন এবং তাঁকে পাবার জন্যে সর্বস্ব দিয়ে ফেলেন। এক অজানা জ্বালায় জ্বলতে থাকেন। কিন্তু বলতে পারেন না কেন এ জ্বালায় জ্বলছেন। আর এ নিয়ে কোনরূপ বোঝা- পড়ার ব্যাপারে صُمٌّ بُكْمٌ "বধির ও বোবা" হয়ে থাকেন এবং সবরকমের বিপদ এবং অপমান-লাঞ্ছনা সইতে প্রস্তুত থাকেন। আর এতেই মজা পান।

عشق است کہ بر خاک مذلّت غلطاند ٭ عشق است کہ بر آتشِ سوزاں بنشاند

کس بہرِ کسے سر ندہد جاں نہ فشاند ٭ عشق است کہ ایں کار بصد صدق کناند

(অর্থাৎ, "ঐশী-প্রেম এমনই (এক শক্তি), যা লাঞ্ছনার (আত্মবিলীনতার) ধূলায় লুটিয়ে দেয়। ঐশী-প্রেম এমনই (এক শক্তি) যা লেলিহান আগুনের উপরে বসিয়ে দেয়। কেউ কারও জন্যে মাথা পেতে দেয় না, কেউ কারও জন্যে প্রাণ বিসর্জন করে না, কিন্তু প্রেম এমনই (এক শক্তি,) যা পরম নিষ্ঠার সাথে তাও করিয়ে দেয়।" -অনুবাদক)

ঐ পুরস্কারসমূহের মধ্যে আর একটি হচ্ছে "আখলাকে ফাযেলা"– উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক গুণাবলী। যেমন বদান্যতা, বীরত্ব, ত্যাগ, উচ্চ সাহস ও উদ্যম, স্নেহ-মমত্বের আধিক্য, গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা, লজ্জাশীলতা, প্রেম-ভালোবাসা। এই সব চারিত্রিক গুণাবলী সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা সমীচীনরূপে তাঁদেরই দ্বারা সাধিত হয়। এই লোকেরাই কুরআন শরীফের অনুবর্তিতার বরকতে ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে আজীবন সর্বাবস্থায় এগুলোকে উত্তম আকারে, সযত্নে এবং শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে পালন করেন।

এরূপ কোনও সংকোচের তাঁরা সম্মুখীন হন না যা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর যথাযথ প্রকাশে বাধা দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে যে সব সদ্‌গুণ – তা জ্ঞানগতই হোক, ব্যবহারিক কিম্বা চারিত্রিক হোক, যা মানুষের দ্বারা সাধিত ও সংঘটিত হতে পারে, তা নিছক মানবীয় ক্ষমতায় হতে পারে না, বরং এর প্রকাশের আসল কারণ হলো 'ফয্‌লে-ইলাহী'- আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ। অতএব, এই সকল লোক যেহেতু ঐশী কৃপার পাত্র হয়ে থাকেন, সেহেতু খোদা ওয়ান্দেকরীম তাঁর অনন্ত কৃপার দ্বারা সবরকমের যাবতীয় সদ্‌গুণে তাঁদেরকে ভূষিত করেন। অন্য কথায়, বস্তুতঃপক্ষে খোদাতা'লা ব্যতীত সর্বগুণে সার্বিক গুণান্বিত- 'নেক' আর কেউই নেই। তাবৎ উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক গুণ এবং যাবতীয় পুণ্য তাঁরই জন্যে স্বীকৃত ও সাব্যস্ত। অতঃপর, কেউ যতই তার নফ্‌সকে (স্বকীয় ইচ্ছা) বিলীন ক'রে ঐ 'সার্বিক কল্যাণ সর্বস্ব সত্তা'র নৈকট্য লাভ করে, ততই ঐশী গুণাবলী (আখলাকে-ইলাহী) তার আত্মার উপর প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়। ব্যাস্‌! মূল কথা এই যে, বান্দা যে যে সদ্‌গুণ এবং সত্যিকার সংস্কৃতি (তাহ্‌যীব) অর্জন করে, তা কেবল খোদাতা'লার নৈকট্যের দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে আর বস্তুতঃ তেমনই অবধারিত। কেননা সৃষ্টজীব (মখলুক) সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ কিছুই নয়। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার উত্তম গুণাবলীর প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বন তাদের হৃদয়ের উপরই অনুষ্ঠিত হয় যাঁরা কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুবর্তিতা অবলম্বন করেন। বস্তুতঃ সঠিক অভিজ্ঞতাই বলে দিতে পারে, যে স্বচ্ছ অন্তঃকরণ ও আধ্যাত্মিক আগ্রহ-অনুরাগ এবং প্রেমপূর্ণ উদ্যম ও উদ্দীপনার সাথে উচ্চাঙ্গীণ চারিত্রিক গুণাবলী ('আখলাকে ফাযেলা') তাঁদের দ্বারা সংঘটিত ও প্রকাশিত হয়, দুনিয়াতে তার নজির পরিদৃষ্ট হয় না। যদিও মুখে প্রত্যেক ব্যক্তি দাবী করতে পারে এবং বাগাড়ম্বর করতে পারে। কিন্তু সঠিক অভিজ্ঞতার যে সক্ষ্ম দ্বার, সে দ্বার দিয়ে নিরাপদে নির্গমনকারীরাই হলেন এই সকল লোক। পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকেরা যদি কিছু উত্তম আখ্‌লাক প্রদর্শনও করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে যা তারা করে থাকেন, তা করে থাকেন অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে ও বানোয়াটরূপে এবং তারা নিজেদের ত্রুটিগুলি গোপন রেখে এবং নিজেদের ব্যাধিগুলি আড়ালে রেখে নিজেদের মিথ্যে কৃষ্টি (শিষ্টাচার) প্রদর্শন করেন। সামান্য সামান্য পরীক্ষাতেই তাদের মুখোশ খুলে যায়। বস্তুতঃ চারিত্রিক গুণ প্রদর্শনে কৃত্রিমতা ও বানোয়াটের আশ্রয় তারা প্রায়শঃ এজন্যে নেন যে, নিজেদের দুনিয়াদারী ও সামাজিক জীবনের স্বার্থ ও লাভজনক উপায় তারা এরই মধ্যে নিহিত বলে দেখেন। আর যদি নিজেদের ভেতরকার কলুষতার অনুসরণ সর্বত্র করেন, তাহলে সামাজিকতার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে বাধা-বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটে। যদিও স্বভাবজ ক্ষমতানুযায়ী আখলাক বা সচ্চরিত্রতার কিছু পরিমাণ বীজ তাদের মধ্যেও নিহিত থাকে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রবৃত্তিমূলক

স্বার্থাবলীর কন্টকের নীচেই চাপা থেকে যায় এবং বাসনা ও স্বার্থাবলীর সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় না, পরিপূর্ণতায় পৌঁছা তো দূরের কথা। বস্তুতঃ ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐসব লোকদের মধ্যেই সে বীজ পরিপূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে যারা খোদারই জন্যে হয়ে যান এবং যাদের আত্মাকে খোদাতা'লা 'অপরত্বে'র (গায়রিয়তে'র) মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও খালি পেয়ে স্বয়ং তাঁর পবিত্র 'আখলাক' (গুণাবলী) দ্বারা ভরে দেন এবং তাদের অন্তরে ও দৃষ্টিতে সে আখলাকগুলোকে এমনই প্রিয় করে দেন, যেরূপ তারা তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে থাকেন। অতএব, এসব ব্যক্তিরা আত্মবিলীন হওয়ার দরুন "তাখাল্লুক বিআখ্‌লাকিল্লাহ্‌"র (আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে চরিত্রবান হওয়ার) এরূপ মর্যাদা লাভ করেন, যার ফলে তাঁরা যেন খোদার এক যন্ত্র বিশেষ হয়ে যান, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত পেয়ে নিজের বিশেষ উৎস থেকে সেই সুপেয় পানি পান করান, যার মধ্যে সৃষ্টের মৌলিকরূপে তাঁর সাথে কোনও অংশীদারিত্ব নেই।

ঐ পুরস্কারসমূহের মধ্যে আর একটি মহান পুরস্কার যা কুরআন করীমের পূর্ণ অনুসারীদেরকে দেয়া হয় তা হলো 'উবুদীয়্যত' (দাসত্ব)। অর্থাৎ তারা বহুল পরিমাণ পূর্ণমানের বৈশিষ্ট্যময় গুণাবলী ও মর্যাদাসমূহ- কামালাত লাভ করা সত্ত্বেও সর্বক্ষণ নিজেদের সাক্ষাৎ ও স্বকীয় অপূর্ণত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'লার মহত্বকে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবনে সদাসর্বদা আত্মবিলীন, আত্মসমর্পিত ও বিনয়াবনত থাকেন, নিজেদের আসল অবস্থা ও স্বরূপ তথা তুচ্ছতা, মুখাপেক্ষিতা, অভাব ও দুর্বলতা এবং ভুল-ত্রুটির প্রবণতাকে অনুধাবন করেন এবং যাবতীয় গুণকে ('কামালত'), যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে, সেই অস্থায়ী আলোর ন্যায় মনে করেন, যা কোন সময় সূর্য থেকে দেয়ালে পতিত হয়েছিল- যা মূলতঃ দেয়ালের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, অথবা সে লব্ধ গুণাবলী অন্যের কাছ থেকে ধার করা পরিধানের ন্যায়, আর তাই লয়প্রাপ্তির অবস্থানে বিদ্যমান। অতএব, তারা নিজেদের সমুদয় কল্যাণ, সদ্‌গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীকে খোদাতা'লাতেই সীমাবদ্ধ ও পর্যবসিত বলে নির্ধারণ করেন। আর সমস্ত নেকী ও পুণ্যের উৎস হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদাতা'লাকেই সাব্যস্ত করেন এবং ঐশী গুণাবলীকে প্রত্যক্ষ দর্শনে তাদের অন্তরে 'হাক্কুল-একীন' (প্রত্যক্ষজ্ঞান) স্বরূপ প্রথিত হয়ে যায় যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু নন। এমন কি তারা নিজেদের অস্তিত্ব, ইচ্ছা ও সংকল্প এবং বাসনা-কামনা থেকেও সম্পূর্ণ হারিয়ে যান এবং ঐশী মাহাত্ম্যের উদ্বেল ও উন্মত্ত সাগর তাদের অন্তরকে এরূপ ছেয়ে ফেলে যে, সহস্র ধরনের আত্মবিলীনতা তাদের উপরে আপতিত হয় এবং সূক্ষ্ম ও গোপন শির্‌কের প্রতিটি শাখা ও শিরা-উপশিরা থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র হয়ে যান।"

- (বারাহীনে আহমদীয়া ঃ পৃঃ ৫১০-৫২৩, পাদটীকার পাদটীকা-৩)

"সত্য ও মিথ্যা প্রভেদকারী কুরআনের আলো সব আলোকমালার চেয়ে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হলো। পবিত্র তিনি, যাঁর নিকট হতে এই আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে।।

খোদার তৌহীদের চারা শুকিয়ে যেতে চলেছিল। দৈবাৎ অজানা হতে সবচেয়ে স্বচ্ছ এই ঝরণা উৎসারিত হয়েছে।।

হে খোদা! তোমার ফুরকান এক বিশ্ব! প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই এতে পাওয়া গেল।।

সারা জগতকে মথিত করেছি, সব দোকান দেখেছি। তত্ত্বজ্ঞানের মদিরার একমাত্র এই আয়নাটিই কাঁচের পানপাত্র পাওয়া গেল।।

কিসের সঙ্গে এ পৃথিবীতে এই নূরের সাদৃশ্য সম্ভব? এতো প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি গুণেই অনন্য নিরূপিত হলো।।

প্রথমে বুঝেছিলাম, মূসার যষ্টি বুঝি ফুরকান। পরে যে চিন্তা করে দেখলাম এর প্রতিটি শব্দই মসীহ্‌তুল্য সাব্যস্ত হলো।।

অন্ধদের নিজেদেরই ভুল, নচেৎ এই নূর এত উজ্জ্বলতা দেখিয়েছে যে, শত শত উজ্জ্বল সূর্য বলে সাব্যস্ত হলো।।

ওসব লোকের জীবন মাটি হলো এ ধরাতে, এই আলোকবর্তিকা থাকা সত্ত্বেও যাদের অন্তর অন্ধ প্রমাণিত হলো।।"

(বরাহীন আহমদীয়া ঃ পৃষ্ঠা, ২৯৫-পাদটিকার পাদটিকা-২)

"কুরআনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রতিটি মুসলমানের প্রাণ। আকাশের চাঁদ অন্যদের (হলে হোক), আমাদের (প্রকৃত) চাঁদ কুরআন।।

চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি এর নজির (সমতুল্য) চোখে ধরে না। ইহা অনন্য-অনুপম কেমন করেই বা হবে না– এ যে রহমান (খোদা)-এর পাক কালাম।।

এর ছত্রে ছত্রে চিরস্থায়ী বসন্ত ছড়ানো– সে সৌন্দর্য না কোন বাগানে আছে। আর না এর তুল্য কোন বাগানই আছে।।

খোদার পবিত্র কালামের কোন দ্বিতীয়টি নেই নিঃসন্দেহে, যদিও ওমানের মনিমুক্তা হোক বা বাদাখশানের হীরকই হোক।।

খোদার বাণীর সমকক্ষ মানুষের বাণী কি করেই বা হতে পারে! তথায় রয়েছে (অসীম) কুদরত, আর হেথায় শ্রান্তি– এ যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।।

ফিরিশ্‌তারা যাঁর দরবারে করে থাকেন অজ্ঞতা স্বীকার, তাঁর বচনের সমকক্ষতার ক্ষমতা মানুষের কি করেই বা থাকতে পারে?!

মানুষ তো একটা কীটের পাও কখনও বানাতে সক্ষম নয়। তাই আবার হক্‌তা'লার আলো (নূর) বানানো তার পক্ষে কি করে সহজ (সম্ভব) হতে পারে।।

হে মানবমণ্ডলী! মহান খোদার মহত্বকে কিছু তো সমীহ কর, সম্মান দেখাও। এখনও (সময় থাকতে এর বিরুদ্ধে) নিজেদের মুখ বন্ধ কর, যদি (তোমাদের মধ্যে) এতটুকুও ঈমানের গন্ধ থেকে থাকে।।

অপর কোনও কিছুকে খোদার সমকক্ষ (শরীক) বানানো তাঁর প্রতি বড়ই অকৃজ্ঞতার নামান্তর। খোদাকে কিছু তো ভয় কর হে বন্ধুরা! এ কেমন ধরনের অপবাদ দেয়ার ও মিথ্যা বলার রীতি?!

খোদার একত্বকেই যদি তোমরা বিশ্বাস ও স্বীকার করে থাক, তাহলে কেন আবার তোমাদের অন্তরে এত শির্‌ক (অংশীবাদিতা) লুকিয়ে আছে?

এ কেমন ধরনের অজ্ঞতার তালা তোমাদের অন্তরে লেগে গেল? ভুল করছো, বিরত হও যদি কিছুটাও তোমাদের মধ্যে খোদা-ভীতি থাকে।।

আমাদের কারো প্রতি কিছুমাত্রও বিদ্বেষ নেই, ভাইয়েরা! এ যে কেবল দরবেশসুলভ বিনয় ভরা নসীহত (সদুপদেশ) বৈ কিছু নয়।।

"পবিত্রচেতা যেজনই হোন তার তরে জীবন ও প্রাণ উৎসর্গীকৃত।।"

(বারাহীনে আহমদীয়া ঃ পৃঃ ১৮৮)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা যে শক্তি, ভক্তি ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে খাতামুন্নাবীঈন ওয়াল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করতেন, তা সরাসরি তাঁর লিখাসমূহ অধ্যয়ন করা ব্যতিরেকে জানা সম্ভব নয়। অতএব, এ প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী থেকে কতক উদ্ধৃতি পেশ করা গেল। তিনি বলেন ঃ-

"আমার এবং আমার জামা'তের উপর অভিযোগ করা হয় যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি না-ইহা আমাদের উপর ডাহা মিথ্যারোপ বৈ আর কিছুই নয়। আমরা যে জোর, দৃঢ়বিশ্বাস ও যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামুল্‌আম্বীয়া বলে বিশ্বাস করি ও মানি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অপরাপর লোকেরা মানেন না এবং ঐরূপে মানার মত তাদের সেই হৃদয়, ক্ষমতা ও যোগ্যতাও নেই। খাতামুল্‌আম্বীয়া (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়তের মধ্যে যে প্রগাঢ় সত্য ও তত্ত্ব এবং রহস্য নিহিত রয়েছে তা তারা বুঝেনই না। তারা কেবল বাপ-দাদাদের কাছ থেকে একটি শব্দমাত্রই শুনে রেখেছেন কিন্তু এর প্রকৃত তত্ত্ব ও হকীকত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তারা জানেন না যে, খতমে নবুওয়ত বিষয়টি কি, এর উপর ঈমান আনার মর্ম কি। কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ ও সংয়্যাতীত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে (যা আল্লাহ্‌তা'লা উত্তমরূপে অবগত আছেন) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি এবং খোদাতা'লা আমাদের নিকট খতমে-নবুওয়তের গুঢ় তত্ত্ব এরূপ প্রাঞ্জলভাবে খুলে দিয়েছেন যে, এর ইরফান (গভীর তত্ত্বজ্ঞান)-এর যে সুপেয় শরবত পান করিয়েছেন তাতে এক অনুপম স্বাদ লাভ করে থাকি যা অন্য কেউ অনুমানও করতে পারে না, অবশ্য ঐ সকল লোক ব্যতীত যাঁরা এই উৎস থেকে পান করে তৃপ্ত হয়েছেন।"

(মলফুযাত ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)

"কুরআন শরীফ ব্যতীত আমাদের কোনও কিতাব নেই এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমাদের কোন রসূল নেই। আর ইসলাম ব্যতীত আমাদের কোন ধর্ম নেই। আমরা এ কথায় ঈমান রাখি যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খাতামুল্‌আম্বীয়া এবং কুরআন করীম খাতামুল্‌কুতুব। অতএব, দীনকে ছেলে-খেলা স্বরূপ বানাবেন না। স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের খাদেম ও

সেবক ব্যতীত তাঁর (সাঃ) মোকাবেলায় আমার আর কোনও দাবী নেই। তাঁর মোকাবেলায় কোনও দাবী করি বলে যদি কেউ আমার দিকে আরোপ করে তা হলে আমার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা দোষারোপ করে থাকে। আমি আমার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই স্বর্গীয় আশিস ও বরকত লাভ করে থাকি এবং কুরআন করীমের মাধ্যমেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞানের ফয়েয পেয়ে থাকি। অতএব, এই হেদায়াতের বিরোধী কোনকিছু যেন কেউ তার অন্তরে স্থান না দেয়। অন্যথায়, খোদাতা'লার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর আমরা যদি ইসলামের খাদেম ও সেবক না হয়ে থাকি তাহলে আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বৃথা ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য। বিনীত-মির্যা গোলাম আহমদ, কাদিয়ান, ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৯ইং" *(মকতুবাতে আহ্‌মদীয়া ঃ ৫ম খণ্ড, পত্র নং ৪)*

"إِنِّيْ أَرَى فِيْ وَجْهِكَ الْمُتَهَلِّلِ   شَأْنًا يَفُوْقُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ

وَجْهُ الْمُهَيْمِنِ ظَاهِرٌ فِيْ وَجْهِهٖ   وَشُئُوْنُهٗ لَمَعَتْ بِهٰذَا الشَّانِ

فَاقَ الْوَرٰى بِكَمَالِهٖ وَجَمَالِهٖ   وَجَلَالِهٖ وَجَنَانِهِ الرَّيَّانِ

لَا شَكَّ أَنَّ مُحَمَّدًا خَيْرُ الْوَرٰى   رِيْقُ الْكِرَامِ وَنُخْبَةُ الْأَعْيَانِ

تَمَّتْ عَلَيْهِ صِفَاتُ كُلِّ مَزِيَّةٍ   خُتِمَتْ بِهٖ نَعْمَاءُ كُلِّ زَمَانِ

هُوَ خَيْرُ كُلِّ مُقَرَّبٍ مُتَقَدِّمٍ   وَالْفَضْلُ بِالْخَيْرَاتِ لَا بِزَمَانِ

يَا رَبِّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ دَائِمًا

فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَبَعْثٍ ثَانِ"

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۵۹۴ تا ۵۹۶)

"নিশ্চয় আমি তোমার আলোকোজ্জ্বল- জ্যোতিঃঝলমল চেহারায় এরূপ এক শান ও ঐশ্বর্য লক্ষ্য করি যা মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর উর্ধ্বে।

তাঁর চেহারাতে 'মুহায়মেন' (রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক) খোদার চেহারা প্রস্ফুট এবং তিনি তাঁর পরিপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য ও প্রতাপ এবং সজীব অন্তঃকরণের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছেন।

নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ-সাঃ) সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সুধী ও সম্মানিত লোকদের প্রাণ-শক্তি এবং নামী-দামী লোকদের মধ্যে বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর সত্তায়

সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠতা, মর্যাদা ও কল্যাণপূর্ণ উৎকৃষ্ট গুণাবলী চরমত্বলাভ করেছে এবং প্রত্যেক যুগের নেয়ামত ও কল্যাণ তাঁর সত্তায় পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি পূর্ববর্তী প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে কারও কীর্তিসমূহের ভিত্তিতে, যুগের ভিত্তিতে নয়।

হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) উপর সদা তোমার দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর - ইহকালেও এবং পরকালেও।" *(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম ঃ পৃঃ ৫৯৪-৫৯৬)*

"নূরুন আলা নূর" (জ্যোতির উপরে জ্যোতিঃ)

"সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতিঃ যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেয়া হয়েছে, উহা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যেও ছিল না, তারকাপুঞ্জেও ছিল না, চন্দ্রে উহা ছিল না, সূর্যে উহা ছিল না, উহা ভূ-পৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদীসমূহে ছিল না, উহা পদ্মরাগ মনি ও নীলকান্ত মণিতে ছিল না, পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, উহা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না। উহা ছিল শুধু মানবের তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে – সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম, মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সৈয়্যদুল আম্বীয়া, সৈয়্যদুল আহ্‌য়ীয়া মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মধ্যে।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম ঃ পৃষ্ঠা, ১৬০-১৬১)

"سیّدِ شاں آنکہ نامش مصطفٰے است
رہبرِ ہر زمرۂ صدق وصفا است

می درخشد رُوئے حق در رُوئے اُو
بُوئے حق آید زِبام و کُوئے اُو

ہر کمالِ رہبری بر وَے تمام
پاک رُوئے و پاک رُویاں را امام"

"ঐ সকল লোকের নেতা, যাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ),

তিনি পবিত্র ও নিষ্ঠাবান লোকদের সকল দলের পথ-প্রদর্শক।

তাঁর চেহারায় খোদাতা'লার চেহারা উদ্ভাসিত এবং তাঁর ঘর-দোর ও পথ-ঘাট থেকে খোদাতা'লার সুগন্ধ আসে।

পথ-প্রদর্শনার প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁর উপরে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পবিত্র চেহারার অধিকারী তিনি এবং সকল পবিত্র চেহারার লোকের তিনি ইমাম ও নেতা।" *(যিয়াউল হক্‌ ঃ পৃষ্ঠা ৪)*

“সূরা আলে ইমরানে তৃতীয় পারায় সবিস্তারে এই বর্ণনা আছে যে, সকল নবীর কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, ‘খতমুর্‌রুসুল’ যিনি হলেন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ঈমান আন এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার প্রচার ও প্রসারে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করো। সে জন্যেই হযরত আদম সফীউল্লাহ্ থেকে নিয়ে হযরত মসীহ্ কালেমাতুল্লাহ্ পর্যন্ত যত নবী-রসূল গত হয়েছেন তাঁরা সকলেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন।” *(সুরমা চশমে-আরিয়া ঃ পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৮০)*

“একজন পূর্ণ মানব এবং সৈয়্যদুর্‌রুসুল (রসূলগণের নেতা) যাঁর মত আর কেউ সৃষ্টি হয়নি এবং হবেও না, তিনি দুনিয়ার হেদায়াতের জন্যে আসেন এবং জগতের জন্যে সেই উজ্জ্বল কিতাব আনেন, যার সমতুল্য কিতাব কোনও চক্ষু দেখেনি।” *(বারাহীনে আহমদীয়া)*

“যেহেতু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্রচিত্ততা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, সততা-সাধুতা ও লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা, আল্লাহ্‌তে নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ও ঐশী-প্রেমের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ, পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন, উজ্জ্বলতম ও পবিত্রতম ছিলেন, সেহেতু খোদা জাল্লাশানুহু তাঁকে চরমোৎকর্ষের বিশিষ্ট গৌরভে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় করেছিলেন এবং তাঁর সে হৃদয়, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের হৃদয়ের চেয়ে প্রশস্ততর, পবিত্রতর ও অধিক নিষ্পাপ, উজ্জ্বলতর এবং আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রেমিক ছিল, তাই তিনি এরই উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হলেন যেন তাঁর উপরে সেই ওহী নাযেল হয় যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ওহী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও পরিণত এবং সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ঐশী গুণাবলী প্রদর্শনার্থে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রশস্ত আয়না স্বরূপ হয়।” *(সুরমা চশমে আরিয়া ঃ পৃষ্ঠা ২৩, ২৪ পাদটীকা)*

“সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কর্ম ও কার্যাবলী এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও পবিত্র ক্ষমতাবলীর তেজস্বী স্রোতধারার দ্বারা পরিপূর্ণতার নমুনা ও দৃষ্টান্ত জ্ঞানে, কর্মে, নিষ্ঠায় ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে দেখালেন এবং পূর্ণ মানব বলে অভিহিত হলেন- সেই মানব যিনি সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ও পূর্ণতম মানব ও পূর্ণতম নবী ছিলেন এবং পূর্ণতম বরকত ও আশিসসমূহের সাথে আগমন করলেন, যাঁর দ্বারা আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও হাশর অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন দুনিয়ার প্রথম কিয়ামত সংঘটিত হলো এবং এক মৃত জগৎ তাঁর আগমনের দ্বারা সঞ্জীবিত হলো- সেই মহা আশিসমণ্ডিত নবীই হলেন খাতামুল্-আম্বীয়া, ইমামুল-আস্‌ফিয়া, খাতমুল্-মুরসালীন, ফাখ্‌রুন্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর উপরে তুমি সেই রহমত ও দরূদ পাঠাও, যা তুমি জগতের সূচনাকাল থেকে কারও উপর পাঠাওনি।

যদি এই মহা শান ও মর্যাদাসম্পন্ন নবী জগতে না আসতেন, তাহলে ছোট যত নবী দুনিয়াতে এসেছেন যেমন, ইউনুস, আইউব, মসীহ ইবনে মরিয়ম, মালাকী, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়্যা (আলায়হিমুস্সালাম) প্রমুখ, তাঁদের সত্যতার উপর আমাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ ছিল না, যদিও তাঁরা সকলেই আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত, মর্যাদাবান ও প্রিয় ছিলেন। ইহা এই মহান নবীরই কৃপা ও ইহসান যে, এহেন ব্যক্তিবর্গও দুনিয়াতে সত্যবাদী সাব্যস্ত হলেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে ও সাল্লেম ও বারেক আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়াসহাবিহি আজমাঈন।" *(ইতমামে হুজ্জত ঃ পৃষ্ঠাঃ-৩৬)।*

"আমাকে বুঝানো হয়েছে যে, রসূলগণের মধ্যে যিনি পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও পবিত্রতম এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময় শিক্ষা প্রদানকারী এবং নিজ সত্তার দ্বারা মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের শ্রেষ্ঠ নমুনা ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী- তিনি হলেন কেবলমাত্র সৈয়্যদনা ও মওলানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম।" *(আরবাঈন -১ ঃ পৃষ্ঠা-৩)*

"যে যুগে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হন প্রকৃতপক্ষে উহা এরূপ একটি যুগ ছিল যে, তখনকার অবস্থা একজন অতি মহান ও অতি মর্যাদাবান ঐশী-সংস্কারক ও স্বর্গীয় পথ-প্রদর্শকের তীব্রভাবে মুখাপেক্ষী ছিল। যে শিক্ষা দেয়া হলো তাও বস্তুতপক্ষে এরূপ সত্য ও যথার্থ ছিল যে, এর অতীব প্রয়োজন ছিল এবং ঐ যাবতীয় বিষয়াবলী সম্বলিত ছিল, যদ্দারা যুগের সকল প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ হতো। আর সে শিক্ষা এরূপ প্রভাব বিস্তার করলো যে, লক্ষ লক্ষ মানবহৃদয়কে সত্যের দিকে আকর্ষিত করলো এবং লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর গভীর রেখাপাত করে দিল। আর নবুওয়তের যে মুক্ষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তথা নাজাত ও পরিত্রাণ লাভের নীতি ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া– তা এরূপ পূর্ণতায় পৌছিয়ে দিল যে, অন্য কোন নবীর হাতে সেরূপ পূর্ণতায় তাঁর শিক্ষা পৌছুতে পারেনি।"

(বারাহীনে আহ্মদীয়া ঃ পৃষ্ঠা ১১২-১১৪)

"রূহুল-কুদুসের স্বভাব ও প্রকৃতির সর্ববৃহদংশ হযরত সৈয়্যদনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামই লাভ করেন। ---জগতে সর্বতঃ নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্করূপে কেবলমাত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই আবির্ভাব ঘটলো"। *(তোহ্ফা গুলড়াভিয়া ঃ পৃষ্ঠা ২৩৮)*

"যখন আমরা ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিতে দেখি, তখন নবুওয়তের সমগ্র সারিতে সর্বোচ্চ স্তরের দৃঢ়সংকল্প প্রিয় নবী হিসেবে কেবলমাত্র একজনকেই জানতে পারি অর্থাৎ সেই নবীগণের নেতা ও অধিনায়ক, রসূলগণের গৌরব ও মুকুট, যাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা ও আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম, যাঁর ছত্রছায়ায় দশদিন কাটালে সেই আলো পাওয়া যায়, যা ইতোপূর্বে হাজার বছর কাটালেও পাওয়া যেতো না।" *(সিরাজে মুনীর ঃ পৃষ্ঠা-৮২)*

"সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! হযরত খাতামুল্‌আম্বীয়া (সাঃ) কত শান ও মর্যাদার নবী! আল্লাহ! আল্লাহ্! কী আজিমুশ্বান নূর তিনি! যাঁর নগণ্য খাদেম, যাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ উম্মত, যাঁর নগণ্য চাকর উল্লিখিত মর্তবা ও আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ (ঐশীবাণী–ওহী ও ইলহাম এবং গায়েবের সংবাদ-ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ইত্যাদি– সংকলক) পর্যন্ত পৌছে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা নাবীয়েকা ওয়া হাবীবেকা সৈয়্যদিল আম্বীয়ায়ে ওয়া আফযালির রুসুলে ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।" *(বারাহীনে আহমদীয়া ঃ পৃঃ ২৫৬-২৬৫, পাদটীকা নং ১১)*

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর উচ্চ মর্যাদার সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোসের বিষয়, যেভাবে সত্যকে সনাক্ত করা উচিত তাঁর মর্যাদাকে সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তৌহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তিনিই একমাত্র শক্তিমান পুরুষ যিনি পুনরায় দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন। তিনি খোদাকে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছেন এবং আদম সন্তানের জন্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের সহানুভূতিতে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই জন্যে খোদা, যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন তিনি তাঁকে সকল নবী এবং সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এবং তাঁর আশা-আকাঙ্খা তাঁর জীবনে পূর্ণ করেছেন। ইনিই তিনি, যিনি প্রত্যেক কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কল্যাণরাজীকে স্বীকার না করেই কোন মর্যাদার দাবী করে সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। প্রত্যেক মর্যাদার চাবিকাঠি তাঁকেই দেয়া হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্পদ তাঁকে দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে পায় না সে চিরবঞ্চিত। আমাদের অস্তিত্ব কি? আমাদের মূলতত্ত্বই বা কি? আমরা নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবো, যদি না আমরা স্বীকার করি যে, আমরা তৌহীদের তত্ত্ব এই নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবন্ত খোদার পরিচয় আমরা এই কামেল নবী এবং তাঁর জ্যোতির মাধ্যমে লাভ করেছি। এবং খোদার সাথে কথা বলার ও সম্বোধনের (ঐশী-বাণীর) মর্যাদা পাওয়া, যদ্বারা আমরা তাঁর চেহারা দেখতে পাই তাও আমরা এই মহামান্য নবীর মাধ্যমে লাভ করেছি। হেদায়াতের আলোকরশ্মি রৌদ্রের ন্যায় আমাদের উপরে পতিত হয় এবং ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা আলোকিত হয়ে থাকতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁর সামনে হাজির থাকি।"

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃঃ- ১১৫, ১১৬)

"হে নির্বোধ এবং জ্ঞানান্ধরা! আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা (তাঁর উপরে হাজার হাজার সালাম বর্ষিত হোক) তাঁর কল্যাণ বিতরণের দিক দিয়ে সমস্ত নবীদেরকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। কেননা বিগত নবীদের কল্যাণ বিতরণ-ধারা একটি সীমায় এসে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং সে সব জাতি এবং সে সব ধর্ম এখন মৃত। তাদের মধ্যে কোনই জীবন নেই। কিন্তু আঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিতরণের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান রয়েছে। কাজেই তাঁর এই কল্যাণ প্রবহমানতা সত্ত্বেও এ উম্মতের জন্যে বাহির থেকে কোন মসীহ্র আগমন প্রয়োজনীয় নয়। বরং তাঁর (অনুবর্তিতার) ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ার কল্যাণ এক অতি নগণ্য ব্যক্তিকেও মসীহ বানাতে পারে, যেমন এই অধমকে করেছে।" *(চশমায়ে মসীহী ঃ পৃষ্ঠা- ৭৪, ৭৫)*

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সমগ্র নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীকে পরিপূর্ণতা প্রদানকারী এবং এখন খোদাতা'লা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর আখেরী নমুনা ও আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।" *(আল্-হাকামঃ ১০ই মার্চ, ১৯০৪ ইং)*

"সিরাতে-মুস্তাকীম (সরল-সুদৃঢ় পথ) হলো একমাত্র ইসলাম ধর্মই এবং আকাশের নীচে এখন রয়েছেন নবী ও রসূল মাত্র একজনই অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম, আর তিনিই সমগ্র নবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম পরিপুর্ণ রসূল, খাতামুলআম্বীয়া এবং সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁর অনুবর্তিতায় খোদাকে পাওয়া যায় এবং সকল প্রকার অন্ধকারের পর্দা অপসারিত হয়, আর ইহকালেই সত্যিকার মুক্তির চিহ্ন ও লক্ষণাবলী প্রষ্ফুট হয়ে উঠে।" *(বারাহীনে আহ্মদীয়া ঃ পৃ-৫৩৫, পাদটীকার পাদটীকা নং-৩)*

"আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে 'খাতাম'-এর অধিকারী করেছেন অর্থাৎ তাঁকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ বিতরণের জন্যে মোহর দান করেছেন যা অন্য কোনও নবীকে কখনও দান করা হয়নি। সে কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'খাতামান্নাবীঈন'। অর্থাৎ তাঁর পায়রবী ও অনুবর্তিতা নবুওয়তের কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ প্রদান করে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নবী গড়ে তোলে। এই পবিত্রকরণ শক্তি ও ক্ষমতা আর কোন নবীকেই দেয়া হয়নি।" *(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃষ্ঠা-৯৭ পাদটীকা)*

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম যে 'খাতামুন্নাবীঈন' এর একটি দিক ইহাও যে, আল্লাহ্তা'লা কেবল মাত্র তাঁর বিশেষ কৃপায় এই উম্মতের মধ্যে বড় বড় সম্ভাবনাময় ক্ষমতা ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন। এমন কি, "উলামাউ উম্মাতী কা আম্বীয়ায়ে বানী ইস্রাঈল" ('আমার উম্মতের এরূপ উলামাও হবে যারা বনী ইস্রাঈলের নবীগণের তুল্য হবে' – অনুবাদক) বলেও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এ হাদীসটির উপর হাদীসবিদগণের মতভেদ রয়েছে; কিন্তু আমার হৃদয়ের (আত্মিক) আলো এ হাদীসটিকে সহী বলে সাব্যস্ত ও নির্ধারণ করে এবং নির্দ্বিধায় ইহাকে গ্রহণ করে। বস্তুতঃ কাশ্ফের মাধ্যমেও কেউ এ হাদীসটিকে অস্বীকার করেন নি বরং তসদীকই (সত্যায়নই) করেছেন।" *(আল-হাকাম ঃ ১৭/২৪শে আগষ্ট, ১৯০৪ ইং)*

"সকল প্রকারের নবুওয়ত ও রিসালত চূড়ান্ত বিন্দুতে এসে, অর্থাৎ আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় এসে পরিপূর্ণতার মার্গে পৌঁছে গিয়েছে।" *(ইসলামী উসূল কি ফিলাসফি ঃ পৃষ্ঠা- ৮০, ৮১)।*

“নিঃসন্দেহে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ‘রূহানীয়্যত’ (আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ) স্থাপনের দিক দিয়ে দ্বিতীয় আদম স্বরূপ ছিলেন, বরং প্রকৃত ও যথার্থ আদম তিনিই ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে ও সুবাদে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ ও মর্যাদাসমূহ পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়েছে এবং পুণ্যের যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতানিচয় স্ব স্ব ক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়েছে। এরূপে মানব প্রকৃতির কোনও শাখা ফুল ও ফলবিহীন থেকে যায়নি। এমনি ধারায় খতমে-নবুওয়ত তাঁর উপরে কেবল যুগের শেষে আসার কারণেই হয়নি বরং এ কারণেও হয়েছে যে, নবুওয়তের ‘কামালাত’ – গুণ, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাসমূহ তাঁতেই চরমত্বলাভ করেছে। আর যেহেতু তিনি ঐশী-গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল ছিলেন সেহেতু তাঁর শরীয়ত হচ্ছে জামালী ও জালালী- সৌন্দর্য ও শক্তি বিকাশক গুণাবলীর ধারক ও বাহক।” *(লেকচার সিয়ালকোট ঃ পৃঃ ৪-৭, প্রথম সংস্করণ)*

“আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কল্যাণময় সত্তা প্রত্যেক নবীর জন্যেই পূর্ণতা সাধনকারী ও পরিপূরক বিশেষ। এই মহীয়ান ও গরীয়ান নবীর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ এবং অন্যান্য নবীদের যা কিছু (বিষয়াদি) সন্দেহের শিকার হয়ে পড়েছিল তা অপনোদিত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ খোদাতা'লা এই পবিত্র সত্তার উপরে এ অর্থেই ওহী ও রিসালতকে পরিসমাপ্তি দান করেছেন যে, সমস্ত কামালাত – আধ্যাত্মিক গুণ, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাসমূহ এই কল্যাণময় সত্তাতেই চরমত্ব লাভ করেছে। “وَهٰذَا فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ” (‘এবং ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা যাকে ইচ্ছা দান করেন’ – অনুবাদক)।” *(বারাহীনে আহমদীয়া ঃ পৃ-২৬৩, পাদটীকা নং ১১)*

“যে ‘কামেল ইনসানের’ (পূর্ণ মানবের) উপর কুরআন শরীফ নাযেল হয়েছে তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল না এবং তাঁর সর্বব্যাপক সহানুভূতি ও সহমর্মিতাতে কোনও অভাব ও ত্রুটি ছিল না । বরং কাল ও স্থান উভয় দিক দিয়ে তাঁর আত্মার মাঝে পূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। সেজন্যেই কুদরতের জ্যোতির্বিকাশসমূহের পরিপূর্ণ অংশ তিনি লাভ করেন এবং তিনি খাতামুন্নবীঈন সাব্যস্ত হন । কিন্তু তা এ অর্থে হন নি যে, ভবিষ্যতে তাঁর সান্নিধ্য থেকে কোনও ‘রূহানী ফয়েয’-আধ্যাত্মিক কল্যাণ পাওয়া যাবে না, বরং এ অর্থেই হয়েছেন যে, তিনি ‘খাতামের’ (মোহরের) অধিকারী। তাঁর মোহর ব্যাতিরেকে কোনও ফয়েয ও কল্যাণ কারও কাছেই পৌঁছতে পারে না এবং এই উম্মতের জন্যে কিয়ামতকাল ব্যাপী ‘মুকালামা ও মুখাতাবা ইলাহীয়া’—ঐশী সম্বোধন ও সম্ভাষণ তথা ওহী–ইলহামের দুয়ার কখনও বন্ধ হবে না। তিনি ব্যতিরেকে আর কোন নবীই ‘খাতামের অধিকারী’ নন। একমাত্র তিনিই যাঁর মোহরের দ্বারা এরূপ নবুওয়তই লাভ হতে পারে যার পক্ষে উম্মতি (অনুবর্তী) হওয়া অপরিহার্য। বস্তুতঃ তাঁর সাহস, উদ্যম ও সহানুভূতি এই উম্মতকে ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় ছাড়তে চায়নি এবং তাদের উপরে ওহী–ইলহামের দুয়ার, যা মা'রেফত (তত্ত্বজ্ঞান) লাভের প্রকৃত উৎস, রুদ্ধ থাকা পসন্দ এবং বাঞ্ছনীয় বলে গ্রহণ করেনি। তবে হ্যাঁ, নিজের খতমে-নবুওয়তের নিশান কায়েম রাখার

উদ্দেশ্যে ইহা চেয়েছে যে, ওহী লাভের কল্যাণ যেন তাঁর পায়রবী ও অনুবর্তিতার মাধ্যমে লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি তাঁর উম্মত (অনুবর্তী) নয় তার উপর ঐশী-বাণীর (ওহী-এলাহীর) দুয়ার বন্ধ থাকে। অতএব, উক্ত অর্থে খোদাতা'লা তাঁকে খাতামান্নাবীঈন বলে আখ্যাত ও নির্ধারণ করেছেন। অতএব, কিয়ামত পর্যন্ত নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হলো, যে ব্যক্তি সত্যিকার পায়রবি ও অনুবর্তিতার দ্বারা নিজের উম্মতি হওয়া প্রমাণিত না করে এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুগমনে নিজের সমস্ত সত্তাকে বিলীন না করে এইরূপ ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত না কোন পরিপূর্ণ ওহী (ঐশী-বাণী) লাভ করতে পারবে, না পূর্ণ ইলহামপ্রাপ্ত হতে পারবে। কেননা 'মুস্তাকিল' (অর্থাৎ অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে সরাসরি– স্বাধীন ও স্বতন্ত্র) নবুওয়ত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু 'যিল্লি' (প্রতিবিম্বিত) নবুওয়ত- যার অর্থ এই যে, কেবলমাত্র মুহাম্মদী ফয়েয ও কল্যাণের দ্বারা ওহী পাওয়া– তা কিয়ামতকাল ব্যাপী অব্যাহত ও সচল থাকবে, যাতে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভের দ্বার রুদ্ধ না হয় এবং যাতে এ চিহ্নটি দুনিয়া থেকে মুছে না যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উচ্চ সাহস ও উদ্যম কিয়ামতকাল ব্যাপী ইহাই চেয়েছে যে, ঐশী-বাণীর ('মুকালামাত ও মুখাতাবাতে ইলাহীয়া'র) দুয়ার খোলা থাকুক এবং ঐশী-তত্ত্বজ্ঞান (মা'রেফাতে-ইলাহীয়া), যা নাজাতের (মুক্তির) ভিত্তিস্বরূপ – লয়প্রাপ্ত না হোক।"

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃষ্ঠা- ২৭, ২৮)

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং দাবীর সাথে বলছি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপর খতমে-নবুওয়তের 'কামালাত'(বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী) শেষ (চূড়ান্ত সীমায় উপনীত) হয়েছে। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী যে তাঁর বিপরীতে আলাদা কোন সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নবুওয়ত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন সত্য পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের উৎসকে ত্যাগ করে। আমি খোলাখুলিভাবে বলছি যে, সে-ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে তাঁর পরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর খতমে-নবুওয়তকে ভঙ্গ করে। এ কারণেই এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার উপর মুহাম্মদী নবুওয়তের মোহর না থাকে।" *(আল্-হাকাম ঃ ১০ই জুন, ১৯০৫ ইং)*

"খোদাতা'লা যেখানে এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খাতামান্নাবীঈন, সেখানে এই ইঙ্গিতও দান করেছেন যে, এই মহিমান্বিত রসূল (সাঃ) স্বীয় পূর্ণতম আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে ঐ সকল সাধু ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্যে পিতার মর্যাদা রাখেন, যাঁদের পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ তাঁরই অনুবর্তিতার মাধ্যমে সাধিত হয় এবং তাঁদেরকে ঐশী-বাণী ও ঐশী- বাক্যালাপে ভূষিত করা হয়। যেমন, আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

অর্থাৎ, 'মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন।"

ইহা স্পষ্ট যে, لَٰكِنْ ('লাকিন' অর্থাৎ 'কিন্তু') শব্দটি আরবী ভাষায় বাক্যের প্রথমাংশে বর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ব্যাকরণে যাকে 'ইস্তেদরাক' বলা হয়)। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম সত্তায় যে ত্রুটি ও বিচ্যুতিমূলক নেতিবাচক বিষয়টির নিরূপণ করা হয়েছে তা হল দৈহিকরূপে তাঁর কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা না হওয়া। অতএব, বাক্যের শেষাংশে لَٰكِنْ ('লাকিন') শব্দের দ্বারা সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নেতিবাচক বিষয়টির প্রতিকার ও অপনোদন ক'রে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে 'খাতামান্নাবীঈন' সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁর পরে প্রত্যক্ষরূপে এবং সরাসরিভাবে নবুওয়ত লাভের ধারা চিরতরে রুদ্ধ ও ছিন্ন হয়েছে। এখন নবুওয়তের পরিপূর্ণ কল্যাণ কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই পেতে পারেন যিনি নিজের সকল আমল বা কর্মের উপর তাঁর (সাঃ) নবুওয়তের পায়রবী ও অনুবর্তিতার মোহর রাখবেন এবং এই রূপে যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর রূহানী পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। *(রিভিউ বর মোবাহিসা বাটালভী ও চকড়ালভী ঃ পৃ- ৬,৭)*

"এরূপ হতভাগ্য মিথ্যে দাবীকারক ব্যক্তি যে নিজে রিসালত ও নবুওয়তের দাবি করে সে কি কুরআন শরীফে ঈমান রাখতে পারে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে ঈমান রাখে এবং "ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীঈন" আয়াতকে খোদার কালাম বলে দৃঢ়বিশ্বাস করে সে কি বলতে পারে যে, সে-ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে নবী ও রসূল? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অধম কস্মিনকালেও মৌলিকভাবে (তথা রসূলুল্লাহ-সাঃ-এর পূর্ণ অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে-অনুবাদক) নবুওয়ত বা রিসালতের দাবি করে নি। তবে অ-মৌলিক বা সাধারণ অর্থে কোন শব্দকে ব্যবহার করায় এবং অভিধানের অর্থে সে-শব্দটিকে বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বোলচালের চলতি ভাষায় প্রয়োগ করাতে 'কুফরী'র আপত্তি আসতে পারে না। তথাপি আমি তাও পসন্দ করি না। কেননা এতে সাধারণ মুসলামানদের ধোকা লাগার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু যে-সকল 'সম্বোধন ও সম্ভাষণ' (ঐশী-বাণী ও ওহী ইলহাম) আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে আমি পেয়েছি সেগুলোতে এই নবুওয়ত ও রিসালত শব্দদ্বয় বহুলরূপে বারংবার এসেছে। তাই সেগুলিকে আমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ('মা'মুর') হওয়া বিধায় গোপন রাখতে পারি না। আমি বার বারই বলছি যে, ঐ ইলহাম (ঐশী-বাণী) গুলোতে মুরসাল বা রসূল বা নবী শব্দটি যে আমার সম্পর্কে এসেছে তা মৌলিক অর্থ সম্বলিত নয় এবং আসল সত্যটি,

সর্বসাধারণ্যে যার সাক্ষ্য আমি দিচ্ছি তা এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হলেন খাতামুন্নাবীঈন এবং তাঁর পরে পুরোনো, কিম্বা নতুন কোন নবী আসবে না।

وَمَنْ قَالَ بَعْدَ رَسُوْلِنَا وَ سَيِّدِنَا اِنِّيْ نَبِيٌّ اَوْرَسُوْلٌ عَلٰى وَجْهِ الْحَقِيْقَةِ وَالْاِفْتِرَاءِ وَتَرَكَ الْقُرْاٰنَ وَاَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّاءِ فَهُوَ كَافِرٌ كَذَّابٌ

("আর যে ব্যক্তি আমাদের রসূল ও প্রভুর (সাঃ) পরে দাবী করে যে, সে স্বকীয়ভাবে মৌলিক অর্থে (স্বাধীন ও স্বতন্ত্র) নবী বা রসূল ও সে কুরআনকে এবং দেদীপ্যমান শরীয়তের হুকুম-আহকামকে পরিত্যাগ করে, সে-ব্যক্তি কাফের এবং মিথ্যেবাদী"-অনুবাদক)। মোট কথা, আমাদের ধর্মমত হচ্ছে, যে ব্যক্তি মৌলিক অর্থে নবুওয়তের দাবী করে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ফয়েয ও কল্যাণের আঁচল থেকে নিজেকে পৃথক রেখে এবং তাঁর পবিত্র উৎস হতে আলাদা হয়ে নিজে নিজেই সরাসরি আল্লাহ্‌র নবী বনতে চায়, সে 'মুলহেদ' (বক্রধর্মী) ও বেদীন (বিধর্মী) বৈ কিছু নয়। ঐরূপ ব্যক্তি হয়ত নিজের নতুন কোন কলেমা তৈরী করবে ও ইবাদতসমূহে কোন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করবে এবং আহ্‌কাম ও বিধি-বিধানে কিছু না কিছু পরিবর্তন ও হের-ফের করবে। অতএব, সে নিঃসন্দেহে 'মুসায়লামা কায্‌যাবের' ভাই এবং কাফের হবার ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এইরূপ অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে কি করে বলা যায় যে, সে কুরআন মানে?" *(আঞ্জামে আথম ঃ পৃ- ২৭, ২৮ পাদটীকা)*

"আমি আমার নেতা রসূলের আত্মিক কল্যাণ লাভ করিয়া এবং তাঁহারই নামে আখ্যায়িত হইয়া, তাঁহারই মাধ্যমে খোদা হইতে আমি গায়েবের (অদৃশ্য বিষয়ের) জ্ঞান পাইয়াছি। এই অর্থে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু আমার কোন নূতন শরীয়ত নাই। এইরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নাই পরন্তু এই অর্থেই আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসূল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অতএব এখনও আমি এই অর্থে নবী ও রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। আমার একটি উক্তিঃ

"من نیستم رسول ونیا وردہ ام کتاب"

ইহার অর্থ এই যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নহি।

হ্যাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং কখনও ভুলিলে চলিবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসুল নামে আখ্যায়িত হইয়াছি, তথাপি খোদাতা'লার তরফ হইতে আমাকে জানানো হইয়াছে যে, আমার প্রতি তাঁহার এই করুণা প্রত্যক্ষভাবে হয় নাই,

পরন্তু আকাশে এক পবিত্র পুরুষ আছেন, যাঁহার আত্মিক শক্তি আমাতে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। তাঁহার নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) । তাঁহার মধ্যবর্তিতা বজায় রাখিয়া এবং তাঁহাতে বিলীন হইয়া তাঁহার মুহাম্মদ ও আহ্‌মদ নাম লাভ করিয়া আমি রসূল ও নবী । অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত এবং আল্লাহ্ হইতে গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত হই। কারণ আমি প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায় প্রেম-দর্পণের মধ্যবর্তিতায় সেই নাম পাইয়াছি। যদি কেহ আল্লাহ্‌র এই ওহীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় যে, কেন খোদাতা'লা আমার নাম নবী ও রসূল রাখিয়াছেন, তাহা হইলে ইহা তাহার মুর্খতা হইবে। কারণ আমার নবী ও রসূল হওয়াতে নবুওয়তের মোহর ভগ্ন হয় না।" *(এক গলতি কা ইযালা ঃ পৃঃ ৬-৭)*

"প্রশ্ন হইতে পারে, আঁ হযরত (সাঃ) যখন খাতামান্নাবীঈন তখন তাঁহার পরে কিভাবে নবী আসিতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, ঠিক সেইভাবে কোন নতুন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসিতে পারেন না, যেভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা (আঃ) নামিয়া আসিবেন, তখনও তিনি নবী থাকিবেন, চল্লিশ বছর ধরিয়া তাঁহার প্রতি নবুওয়তের ওহী হইতে থাকিবে এবং তাঁহার দ্বিতীয় নবুওয়ত কাল আঁ হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়ত কাল হইতেও দীর্ঘতর হইবে। এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয় পাপ। আমরা ইহার ঘোর বিরোধী । কোরআনের আয়াতঃ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এবং হাদীসঃ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ উক্ত আকিদাকে সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে এবং আমরা এইরূপ আকিদার ঘোর বিরোধী, উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাস রাখি। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। আমাদের বিরূদ্ধবাদীগণ তাহা অবগত নহেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াতে জানাইয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহা সম্ভব নহে যে, ইহার পর কোন হিন্দু, ইহুদী, খ্রীষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলিয়া সাব্যস্ত করে। নবুওয়তের সকল পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু একটি পথ অর্থাৎ সিরতে সিদ্দীকির পথ খোলা আছে, যাহাকে 'ফানাফির্ রসূল' (রসূলের মধ্যে বিলীন) বলে। সুতরাং এই পথ দিয়া যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাঁহাকে প্রতিচ্ছায়া রূপে মুহাম্মদী নবুওয়তের বসনে ভূষিত করা হয়। যিনি এই রূপ নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নহেন। ইহা তাঁহার স্বকীয় ও স্বতন্ত্র নবুওয়ত নহে, পরন্তু তিনি ইহা তাঁহার নবীর উৎস হইতে গ্রহণ করেন এবং নিজ গৌরবের জন্য নহে বরং তাঁহার নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। এই কারণে আকাশে তাঁহার নাম মুহাম্মদ (সঃ) ও আহ্‌মদ। ইহার অর্থ এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অবশেষে প্রতিচ্ছায়ারূপে (বুরুজীভাবে) হইলেও মুহাম্মদ (সাঃ)-ই প্রাপ্ত হইলেন, অপরে ইহা পাইল না।

অতএব, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۔

আয়াতটির অর্থ হইবে এইরূপঃ

لَيْسَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِ الدُّنْيَا وَلٰكِنْ هُوَ اَبٌ لِرِجَالِ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ وَلَا سَبِيْلَ اِلٰى فُيُوْضِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِهٖ

(অর্থাৎ- মুহাম্মদ এই মরলোকবাসীদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন; তিনি অমরলোকবাসী পুরুষদিগের পিতা; কেননা তিনি খাতামান্নাবীঈন, তাঁহার সূত্রে ব্যতীত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাইবার আর কোনই পথ নাই)। মোট কথা, আমি মুহাম্মদ ও আহ্‌মদ হওয়ার কারণে আমার নবুওয়ত ও রেসালত লাভ হইয়াছে, স্বকীয়তায় নহে, 'ফানাফির্‌ রসুল' হইয়া অর্থাৎ রসূলের মধ্যে নিজেকে সম্পুর্ণরূপে বিলীন করিয়া পাইয়াছি। সুতরাং ইহাতে 'খাতামান্নাবীঈনের' অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) আবার এই পৃথিবীতে আসিলে 'খাতামান্নাবীঈনে'র অর্থে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটিবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌ হইতে জানিয়া যিনি গায়েবের সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এই অর্থ বুঝাইবে, সেখানে 'নবী' শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়ার শর্ত রহিয়াছে। কারণ, যদি রসূল না হন,তাহা হইলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পাইতে পারেন না ।

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌তা'লা কাহাকেও গায়েবের সংবাদের অধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূল স্বরূপ মনোনীত করেন' -সূরা জিন্নঃ ২৭-২৮) আয়াতটি এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী । যদি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া আল্লাহ্‌র সহিত ব্যক্যালাপের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কারণ যাঁহার উপর আল্লাহ্‌র নিকট হইতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে- لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ আয়াত অনুসারে তাঁহার উপর 'নবী' শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হইবে, তাঁহাকে আমরা রসূল বলিব। তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নূতন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসূল আসিবেন না, অথবা কোন ব্যক্তি 'নবী' নাম লাভের অধিকারী হইবেন না, যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন 'ফানাফির্‌ রসূল' অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে বিলীন হইয়া না যান, যাহার ফলে আকাশে তাহার নাম মুহাম্মদ (সাঃ) ও আহ্‌মদ রাখা হয়। وَمَنِ ادَّعٰى فَقَدْ كَفَرَ ['এবং যে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে সে নিশ্চয়ই কাফের']। ইহার মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান্নাবীঈন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্র্যের লেশমাত্র বাকী থাকিতে কোন ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিলে, সে খাতামান্নাবীঈনের উপরোক্ত

মোহর ভঙ্গকারী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ খাতামান্নাবীঈনের মধ্যে এরূপ বিলীন হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত একান্ত একীভূত হইয়া এবং স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁহারই নাম লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তদীয় সত্তায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে মোহরকে না ভাঙ্গিয়াই তিনি নবী আখ্যা লাভ করিবেন, কারণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মুহাম্মদ। মুহাম্মদ ও আহ্মদ নামে অভিহিত এই প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির নবী ও রসূলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই খাতামান্নাবীঈন থাকেন। কেননা এই দ্বিতীয় মুহাম্মদ সেই প্রথম মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই প্রতিকৃতি এবং তাঁহার নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আঃ) নবী হওয়ার কারণে খতমে- নবুওয়তের মোহর না ভাঙ্গিয়া তিনি আসিতে পারেন না।"

(এক গালতি কা ইযাল ঃ পৃঃ৪-৬)

"স্মরণ রাখা আবশ্যক, আমাদের ঈমান এই যে, আখেরী কিতাব ও আখেরী শরীয়ত হলো পবিত্র কুরআন, এবং এর পরে কিয়ামত অব্দি এ অর্থে কোনও নবী নেই যে শরীয়তধারী হয় অথবা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে ঐশীবাণী (ওহী) লাভ করতে পারে। বরং কিয়ামতকালব্যাপী সে দুয়ার রুদ্ধ। পক্ষান্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুবর্তিতায় ঐশীবাণী (ওহী) লাভের কল্যাণ ও আশিসের দুয়ার কিয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে। ঐ ওহী যা (নবী সাঃ-এর) অনুবর্তিতার ফলশ্রুতি তা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। কিন্তু শরীয়তযুক্ত নবুওয়ত অথবা স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবুওয়ত চিরতরে রুদ্ধ হয়েগেছে।

وَلَاسَبِيْلَ اِلَيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَّعٰى اَنَّهٗ نَبِيٌّ صَاحِبُ الشَّرِيْعَةِ اَوْمِنْ دُوْنِ الشَّرِيْعَةِ وَلَيْسَ مِنَ الْاُمَّةِ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَمَّرَهُ السَّيْلُ الْمُنْهَمِرُ فَاَلْقَاهُ وَرَاءَهٗ وَلَمْ يُغَادِرْهُ حَتّٰى مَاتَ

("কিয়ামত তক্ তা পাবার কোনই পথ নেই। আর যে ব্যক্তি বলবে যে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং দাবী করবে যে, সে শরীয়তধারী নবী, কিম্বা সে শরীয়তবিহীন নবী অথচ এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে ব্যক্তির অবস্থান ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে করাল বন্যায় কবলিত হয়েছে, আর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে মারণাঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।"- অনুবাদক)। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই যে, খোদাতা'লা যেখানে ওয়াদা করেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম 'খাতামান্নাবীঈন', সেখানে (সংশ্লিষ্ট আয়াতে) এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, এই মহিমান্বিত রসূল তাঁর রূহানীয়্যতের দিক দিয়ে ঐ পুণ্যবানদের ('সুলাহার') জন্যে পিতার মর্যাদা রাখেন– তাঁর অনুগমন ও অনুবর্তিতার মাধ্যমে যাদের আত্মিক পরিপূর্ণতা সাধিত করা হয় এবং তাদেরকে ঐশীবাণী ও ঐশী বাক্যালাপের সৌভাগ্য প্রদান করা হয়। যথা, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুরআন শরীফে বলেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

অর্থাৎ, 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারও পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন।' ইহা স্পষ্ট যে, 'লাকিন' (কিন্তু) শব্দটি আরবী ভাষায় 'ইস্তিদ্রাক' তথা বাদ পড়া বিষয় বা ক্রটির প্রতিকারের (বা দোষস্খালনের) উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব, এ আয়াতের প্রথমাংশে বাদ পড়া যে বিষয় (দোষ) নির্ধারণ করা হয়েছিল অর্থাৎ যে বিষয়টি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মহান সত্তা থেকে বাদ দেয়া ও অস্বীকার করা হয়েছে, তা হলো দৈহিকভাবে কোন পুরুষের পিতা হওয়া। অতএব, 'লাকিন' শব্দের দ্বারা ঐরূপ বিচ্যুত বিষয়টির প্রতিকার বা স্খালন করা হয়েছে এভাবে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে 'খাতামান্নাবীঈন' সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাঁর পরে নবুওয়তের সরাসরি ও প্রত্যক্ষ কল্যাণ-ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন থেকে নবুওয়তের কল্যাণ ও মর্যাদা কেবল ঐ ব্যক্তিই লাভ করতে পারবে, যার আমল বা কর্মের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুগমন ও অনুবর্তিতার মোহর থাকবে, আর এইরূপে সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিকভাবে পুত্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। মোট কথা, এ আয়াতটিতে এক প্রকারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে কারও পিতা হওয়া অস্বীকার করা হয়েছে এবং আর এক প্রকারে পিতা হওয়া সাব্যস্তও করা হয়েছে, যাতে إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ('তোমার শত্রুগণই অপুত্রক হবে, তুমি হবে না') আয়াতটিতে কাফেরদের আপত্তির যে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রয়েছে তা দূর করা হয়। এ আয়াতের প্রতিপাদিত মর্ম এই দাঁড়ালো যে, নবুওয়ত শরীয়তবিহীন হলেও এইভাবে তা বিচ্ছিন্ন বা রুদ্ধ যে, কোন ব্যক্তি সরাসরি নবুওয়তের মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু এইভাবে রুদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় যে, সেই শরীয়তবিহীন নবুয়ত মুহাম্মদীয় নবুওয়তের প্রদীপ থেকে অর্জিত ও কল্যাণপ্রসূত হয়। অর্থাৎ এইরূপ কল্যাণ ও মর্যাদাধারী ব্যক্তি এক দিক দিয়ে তো উম্মতি হয় অপর দিকে মুহাম্মদীয় পরিপূর্ণ আলোকমালা আহরণের কারণে নবুওয়তের কল্যাণ ও মর্যাদারও ধারক-বাহক হয়। বস্তুতঃ অনুরূপভাবেও যদি এই উম্মতের উপযুক্ত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের আত্মিক পরিপূর্ণতা লাভকে অস্বীকার করা হয়, তাহ'লে তাতে 'নাউযুবিল্লাহ' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম উভয় দিক দিয়ে 'আবতার' (অপুত্রক) সাব্যস্ত হন- দৈহিকভাবে না তাঁর কোন পুত্র, আর না রূহানীভাবে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে যে আপত্তিকারী 'আবতার' বলে অভিহিত করে সে সত্য সাব্যস্ত হয়।

এবার যখন এ বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ফয়সালা হয়ে গেলো যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে স্বাধীন-স্বতন্ত্র-সরাসরি নবুওয়তের দ্বার কিয়ামত অব্দি রুদ্ধ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ উম্মতি হওয়ার প্রকৃত অধিকারী না হয় এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গোলামী ও দাসত্বের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনক্রমেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে নবীরূপে প্রকাশিত হতে পারে না।"

"পূর্বেকার সকল নবুওয়ত ও সকল ধর্মগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। কেননা মুহাম্মদী নবুওয়ত ইহাদের সকলকে আত্মস্থ এবং পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত সকল পথই বন্ধ। সমুদয় সত্য যাহা খোদা পর্যন্ত উপনীত করে, ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর কোন নূতন সত্য আসিবে না এবং ইতিপূর্বে এমন কোন সত্য ছিল না যাহা ইহাতে বর্তমান নাই। অতএব, এই নবুওয়তের মধ্যে সকল নবুওয়ত শেষ হইয়াছে এবং ইহাই হওয়ার ছিল। কারণ যে জিনিসের একটি সূচনা আছে উহার জন্য এক সমাপ্তিও আছে, কিন্তু এই মুহাম্মদী নবুওয়াত স্বীয় আশিস বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সকল নবুওয়্যত অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফয়েয বা আশিস রহিয়াছে। এই নবুওয়্যতের অনুসরণ অতি সহজে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং ইহার অনুবর্তিতায় খোদাতা'লার প্রেম ও তাঁহার বাক্যালাপের পুরস্কার পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে লাভ করা যায়। কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুসারী শুধু 'নবী' নামে অভিহিত হইতে পারে না কারণ, ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মুহাম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয়। অবশ্য উম্মতী ও নবী এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুহাম্মদী নবুওয়তের অবমাননা হয় না, বরং সেই নবুওয়তের জ্যোতিঃ তার এই আশিস দ্বারা অধিকতর প্রকাশিত হয়। যখন সেই ঐশী বাক্যালাপ মান, গুণ এবং সংখ্যার দিক দিয়া চরম পর্যায়ে পৌঁছে, উহাতে কোনরূপ রুক্ষতা, ত্রুটি ও স্বল্পতা অবশিষ্ট না থাকে এবং প্রকাশ্যভাবে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কথা উহাতে বিদ্যমান থাকে, অন্য কথায় তখন উহাই নবুওয়ত নামে অভিহিত হয়। নবীগণ সকলেই এই ব্যাপারে একমত। সুতরাং যে জাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছিলঃ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হইয়াছে' *(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১১)* এবং যাহাদিগকে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর – তাঁহাদের পথে, যাঁহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ' *(সূরা ফাতেহা ঃ ৬-৭)* এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা কখনও সম্ভবপর ছিল না যে, তাহারা সকলেই এই উচ্চ মর্যাদা লাভে বঞ্চিত থাকিবে এবং কোন একজনও এই মর্যাদা লাভ করিবে না। এমতাবস্থায় ইহাতে শুধু এই দোষই হইত না যে, মুহাম্মদী উম্মত অপূর্ণ ও অপরিণত থাকিত এবং সকলেই অন্ধের ন্যায় হইত বরং এই ত্রুটিও হইত যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর কল্যাণপ্রসারী শক্তি (কুওয়াতে ফয়যান) কলঙ্কিত হইত, তাঁহার পবিত্রকরণ শক্তি অপরিণত বলিয়া প্রতিপন্ন হইত এবং তৎসঙ্গে সেই দোয়া যাহাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঠ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শিখানো বৃথা হইত। অপরদিকে এই দোষও থাকিত যে, কেহ যদি মুহাম্মদী নবুওয়তের জ্যোতিকে অনুসরণ না করিয়া এই পরম মর্যাদা সরাসরি লাভ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে খতমে-নবুওয়তের অর্থ রদ হইয়া যাইত। সুতরাং এই উভয় প্রকার

দোষ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য খোদাতা'লা পবিত্র, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ বাক্যালাপের সম্মান এমন কোন কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা ফানাফির্ রসূল অবস্থায় অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্তে বিলীন হইয়া পূর্ণ স্তরে উপনীত হইয়াছেন এবং যাহার মধ্যে কোন আবরণ থাকে নাই এবং উম্মতী হওয়ার তাৎপর্য ও অনুসরণ করার অর্থ পরম ও চরম মাত্রায় তাঁহাদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপভাবে পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদের স্বীয় অস্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকে নাই বরং তাহাদের আত্মবিলীনতার দর্পণে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর অস্তিত্ব প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অপর দিকে নবীগণের ন্যায় পূর্ণ ও পরিণতভাবে তাঁহারা আল্লাহ্তা'লার সহিত বাক্যালাপ-এর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।" *(আল্ ওসীয়্যত ঃ পৃঃ ১১-১২)*

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর পায়রবী (অনুবর্তিতা) না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পূণ্য-কর্মের উচ্চতা ও ওজন হত, তা হলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুওয়ত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওয়তের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া ঃ ২৪-২৫ পৃঃ)

‘খাতামান্নাবীঈন’

‘খাতামান্নাবীঈন’-আয়াতের তফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ (سورة احزاب ع ٥)

“মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্‌) তোমাদের মধ্য হতে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নন কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন”। কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা না হওয়া, কারও নবী হওয়া বা না হওয়ার আদৌ কোন দলিল নয়। কুরআন করীম যদি এ রকম কোন দলিল পেশ করে থাকতো যে, যে-ব্যক্তি কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা না হন তিনি নবী হতে পারেন না অথবা কুরআন করীমের পূর্বেকার কোন জাতির যদি এই আকীদা-বিশ্বাস হতো, তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে, কুরআন করীমে ওটাকে ঠিক বলে ধরে নিয়েছে অথবা ওটাকে খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু এমনটি তো কোন জাতিরই ধর্ম-বিশ্বাস নয় যে, যিনি কোন পুরুষের পিতা নন তিনি নবী হতে পারেন না। মুসলমান ও খ্রীষ্টানেরা তো ইয়াহিয়া (আঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী এবং ইহুদীরাও তার বুযুর্গী স্বীকার করে, কিন্তু এটা কেউই স্বীকার করে না যে, হযরত ইয়াহিয়ার কোনও সন্তান ছিল। কেননা তিনি তো বিয়েই করেন নি। অতএব, এ আয়াতটির কি মানে হলো যে, “মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যেকার কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নন কিন্তু তিনি নবী”? অনিবার্যতঃ এ বাক্যটির ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণ হওয়া চাই। এটাও চিন্তা করা দরকার যে, এক ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে ভুলবশতঃ বলা হতো যে, তিনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পুত্র, তিনি ছিলেন পোষ্য-পুত্র (Adopted son)। এবং মদীনায় এসে যার সম্বন্ধে ঘোষিত হল যে, তিনি পুত্র নন তার সঙ্গে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়তের উল্লেখ করার কি সম্পর্ক বা যোগসুত্র আছে? হযরত যায়েদ (রাঃ) যদি তাঁর বিবিকে তালাক নাও দিতেন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হযরত যয়নবকে যদি বিয়ে নাও করতেন, তাহলে খতমে-নবুওয়তের বিষয়টি কি গোপনই থেকে যেত? এত গুরুত্বপূর্ণ ও আযিমুশ্বান বিষয় কি এমনিতর প্রাসঙ্গিকরূপেই বর্ণিত হয়ে থাকে? এতদ্ব্যতীত, যেমন আমরা পূর্বেই বলে এসেছি, কোনও পুরুষের পিতা হওয়া বা না হওয়ার সাথে নবুওয়তের কোনই সম্পর্ক নেই। অতএব কুরআন করীমেই আমাদের খুঁজে দেখা উচিত অন্য কোথাও কি এইরূপ কোন কথা বর্ণিত হয়েছে, যার জন্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা বলে সাব্যস্ত না হলে নবুওয়তের দাবী সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়? কেননা لٰكِنْ (লাকিন-কিন্তু) শব্দটি আরবী ভাষায় এবং এর সমার্থক শব্দ দুনিয়ার প্রতিটি ভাষাতেই কোনও সন্দেহকে দূর করবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে। এ জটিলতা ও বিভ্রাট নিরসনের জন্যে আমরা যখন কুরআন করীমে দৃষ্টিপাত করি, স্পষ্ট দেখতে পাই যে,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

(سُورة الكوثر)

"আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত কর এবং কুরবানী পেশ কর, নিশ্চয় তোমার শত্রুই অপুত্রক হবে (- তুমি অপুত্রক হবে না)।" *(সূরা আল-কাওসার)*

এ আয়াতটি মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর মধ্যে মক্কার ঐ সব মুশরেকদের কথাকে রদ্ করা হয়েছে, যারা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর বিরুদ্ধে দোষারোপ করতো। তারা বলতো, তার তো পুত্র সন্তান নেই। সে পুত্রহীন, কাজেই আজ নয় তো কাল তাঁর সিলসিলা খতম হয়ে যাবে। *(আল্-বাহ্‌রুল মুহীত)*

এই সূরাটি অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানদের এই ধারণা জন্মেছিল যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পুত্র সন্তান হবে এবং জীবিত থাকবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো এই যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জীবিত থাকে এরূপ কোন পুত্র সন্তান তাদের ধারণানুযায়ী হলো না। পক্ষান্তরে যে দুশমনদেরকে অপুত্রক 'হুয়াল আবতার' বলা হয়েছিল, তাদের পুত্র সন্তানরা জীবিত থাকল। আবু জাহ্‌লের পুত্রও জীবিত থাকল এবং আ'স, ওলীদ ইত্যাদির পুত্ররাও জীবিত থাকল। (অবশ্য পরবর্তীতে তাদের এই সন্তানরা মুসলমান হয়ে যান এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চস্তরের সাহাবাদের মধ্যেও গণ্য হন)। যখন হযরত যায়েদের (রাঃ)বিবাহ্ বিচ্ছেদের ঘটনাটি ঘটলো তখন মানুষের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হলো যে, তাঁরই (সাঃ) পোষ্যপুত্র যায়েদের (রাঃ) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তিনি (সাঃ) বিয়ে করলেন এবং এটা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। কেননা পুত্রবধুর সঙ্গে বিয়ে জায়েয নয়। তখন আল্লাহ্‌তা'লা বল্‌লেন, তোমরা যেরূপে ধারণা করে নিয়েছ যে, যায়েদ (রাঃ) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পুত্র, সে ধারণা ভুল। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো প্রাপ্তবয়স্ক কোনও পুরুষেরই পিতা নন। বস্তুতঃ مَا كَانَ (মা কানা) শব্দগুলি আরবী ভাষায় কেবল এ অর্থই বহন করে না যে, এখন পিতা নন, বরং এ অর্থও বহন করে যে, ভবিষ্যতকালেও তিনি কোন পুরুষের পিতা হবেন না। যেমন কুরআন করীমে এসেছে ঃ (سورہ نساء) "كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা আযীয ও হাকীম (মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান) ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। উক্ত ঘোষণাটির পর মানুষের মনে আরও একটি সন্দেহের উদ্রেক হবার ছিল যে, মক্কায় তো সূরা কাওসারের মাধ্যমে এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের দুশমনরাই অপুত্রক থেকে যাবে; আঁ-হযরত (সাঃ) তদ্রূপ হবেন না। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল পর এখন ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নন, এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। তাহলে কি এর অর্থ এই

দাঁড়ালো না যে, সূরা কাওসার-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যা এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত সন্দেহযুক্ত? মক্কায় সূরা কাওসারের ঘোষণা ও মদীনায় সূরা আহযাবের ঘোষণা বাহ্যতঃ পরস্পর বিপরীত মনে হয়। তাই নবুওয়ত সম্বন্ধে জনমনে প্রশ্ন জাগতে পারে ও সন্দেহ জন্মাতে পারে। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে (এবং ঐ সন্দেহটি নিরসনের উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ আমাদের এই ঘোষণা দ্বারা তো মানুষের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মিথ্যাবাদী কিন্তু এই ঘোষণা থেকে বস্তুতপক্ষে ঐরূপ ধারণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা নিতান্ত ভুল। কেননা ঐ ঘোষণাটি সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, বরং খাতামান্নাবীঈন অর্থাৎ নবীদের মোহর, তিনি পূর্ববর্তী নবীদের জন্যে শোভা ও সৌন্দর্যের কারণ এবং ভবিষ্যতে কোনও ব্যক্তি নবুওয়তের মাকামে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মোহরে-নবুয়ত তার উপরে ক্রিয়াশীল হয়। এইরূপ ব্যক্তি তাঁর রূহানী পুত্র হবে। বস্তুতঃ এক দিকে, এইরূপ রূহানী পুত্রগণ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মত থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং অন্যদিকে মক্কার বৈরী নেতাদের সন্তানগণ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কারণে সপ্রমাণিত হয়ে যাবে যে, সূরা কাওসারে যা বলা হয়েছিল (ইন্না শানেয়াকা হুয়াল আবতার) তা সঠিক ছিল। আবু জাহ্‌ল, আ'স এবং ওয়ালীদের সন্তানরা নিজেরাই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে আরোপিত হবে এবং তাঁর মোহরবাহী রূহানী সন্তানগণও চিরকাল থাকবে। আর কিয়ামত কাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ সেই মাকামেও অধিষ্ঠিত হতে থাকবে, যে মাকামে কোন মহিলা অধিষ্ঠিত হতে পারে না অর্থাৎ নবুওয়তের মাকাম, যা কেবল পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট।

অতএব, সূরা কাওসারকে সূরা আহ্‌যাবের সম্মুখে রেখে বিবেচনা করলে, উক্ত অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থই হতে পারে না। যদি খাতামান্নাবীঈনের মানে করা হয় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল যার পরে ভবিষ্যতে তাঁর পরে কোন নবী আসতে পারে না, তাহলে আয়াতটি অর্থহীন হয়ে পড়ে, বরং পূর্বাপর সূত্রের সাথে একেবারে খাপছাড়া ও সম্পর্কহীন হয়ে যায়। তাছাড়া,কাফেরদের সেই আপত্তি, যার উল্লেখ সূরা কাওসারে রয়েছে, তা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতসমূহের আলোকে আয়াত 'খাতামান্নাবীঈন'-এর তফসীর ঃ

কুরআনে-আযীম এক পরিণত ও পরিপূর্ণ কিতাব, যার অলৌকিকত্ব এই যে, পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খতমে-নবুওয়ত সংক্রান্ত অনন্য মাকামেরই উল্লেখ করে নি, উপরন্তু বিভিন্ন স্থলে এর অর্থ ও তফসীরের উপরও আলোকপাত করেছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা কুরআন করীমের নিম্নরূপ আয়াতসমূহ পেশ করছিঃ

(১) সূরা আল্ হজ্জে আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ (الحج عٓ)

-"আল্লাহ্তা'লা ফিরিশ্তাদের এবং মানুষদের মধ্যে থেকে কোন কোন ব্যক্তিকে রসূল বানাবার জন্যে মনোনীত করে থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লা সর্বাধিক দোয়া শ্রবণকারী এবং অবস্থাবলী পর্যবেক্ষণকারী।" *(সূরা আল্ হজ্জ ঃ রুকু-১০)*

উক্ত আয়াতের 'মানুষের মধ্য থেকে' বলতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সম্বোধিত সমসাময়িক বা পরবর্তী লোকদেকেই বুঝায় । তাঁর পূর্বেকার লোকদেরকে বুঝায় না। অতএব, এ আয়াতটির অর্থ এই যে, আল্লাহ্তা'লা ফিরিশ্তা এবং মানুষের মধ্য থেকে রসূলদের নির্বাচন করেন এবং করতে থাকবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আয়াতটিতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতকাল ব্যাপী বিস্তৃত রসূলে করীম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত–যুগে আরও মানুষ খোদাতা'লা কর্তৃক মনোনীত হয়ে রসূলরূপে প্রেরিত হবেন।

(২) সূরা ফাতেহা-তে আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও, ঐ সকল লোকের পথ যাদের উপর তোমার পুরস্কারসমূহ বর্ষিত হয়েছে।"

এ দোয়াটি দৈনিক পাঁচ বেলা ফরয হিসেবে এবং আরও কয়েক সময়ে নফল হিসেবে মুসলমানগণ পাঠ করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো, ঐশী পুরস্কার প্রাপ্ত লোকদের পথ কোন্‌টি? কুরআন করীম নিজেই এর ব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ (النسآء عٓ) *(সূরা নিসা, রুকু ৯)*

অর্থাৎ, "যদি মুসলমানেরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ফয়সালাসমূহের অনুবর্তিতা ও অনুশীলন করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার ফরমাঁবরদারী ও আজ্ঞানুবর্তিতা করে, তাহলে আমরা তাদেরকে সিরাতে-মুস্তাকীমে বা সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করবো (অর্থাৎ পরিচালিত করব)।"

তারপর, এই সিরাতে–মুস্তাকীমে হেদায়াত দানের পন্থা ও পুরস্কারসমূহ বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপে ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ

مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝ (النسآء عٓ)

"এবং যে-ব্যক্তিই আল্লাহ্‌তা'লার এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুবর্তিতা করবে-"ফাউলায়কা মায়াল্লাযীনা আন্‌আমাল্লাহু আলায়হিম"- তারা ঐ সকল লোকদের দলভুক্ত হবে যাদেরকে খোদাতা'লা পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, অর্থাৎ নবীদের দলে, সিদ্দীকদের দলে, শহীদদের দলে এবং সালেহীনের দলে। এবং এই সকল লোক সর্বোত্তম সাথী। এটা আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে এক বিশেষ ফযল (অনুগ্রহ) এবং আল্লাহ্‌তা'লা সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" *(সূরা আল্-নিসা, রুকূ-৯)*

এ আয়াতটিতে স্পষ্টতঃ জানান হয়েছে যে, পুরস্কার প্রাপ্তদের পথ হল সেই পথ, যে পথে পরিচালিত ও পদচারণা করে মানুষ নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কোন কোন লোক এস্থলে এ কথা বলে থাকেন যে, এখানে مَعَ (-'মাআ) শব্দ এসেছে এবং এর মানে এই যে, এ সকল লোক পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে হবে, নিজেরা পুরস্কারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথচ এ আয়াতের এমন অর্থ হতেই পারে না। কেননা, এমতাবস্থায় এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, এই সকল ব্যক্তি ঐশী পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে সাথে থাকবে কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না অর্থাৎ নবীদের সাথে থাকবে কিন্তু নবীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, সিদ্দীকদের সাথে থাকবে কিন্তু সিদ্দীকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, শহীদদের সাথে থাকবে কিন্তু শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং সালেহ্‌দের সাথে থাকবে কিন্তু সালেহ্‌দের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অন্য কথায়, উক্ত অর্থ অনুযায়ী মুহাম্মদ (সাল্লাঃ)-এর মুসলিম উম্মাহ্ কেবল নবুওয়ত থেকেই বঞ্চিত হলো না বরং সিদ্দীকীয়ত থেকেও বঞ্চিত হলো! অথচ রসূলে করীম (সাঃ) যে বলেছিলেন, "আবুবকর হলেন সিদ্দীক" তাঁর উক্তি কি (নাউযুবিল্লাহ্) ভ্রান্ত? আর তেমনি কি তাঁরা শহীদদের মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেলেন? অথচ কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, সাহাবা-কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) শহীদের মাকামে আছেন *(আল্-বাকারা রুকূ-১৭)* (شهداء على الناس (البقرة ع) আর তেমনি কি সালেহীনের মধ্যেও এ উম্মতের কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত নন? সুবিদিত নিশ্চিত ধারণা এই যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি সালেহীন হয়েছেন- সেটিও কি সম্পূর্ণ ভুল?! নাউযুবিল্লাহ্।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যার ব্যুৎপত্তি আছে এরূপ কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ঐ অর্থ মেনে নিতে পারেন ? مَعَ (মাআ) শব্দের অর্থ কেবল সঙ্গে নয়, বরং 'মাআ' শব্দের অর্থ 'অন্তর্ভুক্ত'ও হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআন করীমে মুমেনদেরকে এ দোয়া শিখান হয়েছে ঃ (آل عمران ع) تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○ *(আলে-ইমরান, রুকূ- ২০)*

"হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পুণ্যবানদের সঙ্গে মৃত্যু দাও।" বস্তুতঃ প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই এর এ অর্থই করেন যে, "হে আল্লাহ! আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও।" এমন অর্থ কেউ-ই করেন না যে, "হে আল্লাহ্! যে দিন বা যে সময়ে কোন পুণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু হয় সে-দিন সে সময়ে, তার সঙ্গে শয্যাশায়ী হয়ে যেন আমারও মৃত্যু হয়।"

অনুরূপ, কুরআন করীমে আছে ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝ (النّسآء ع ۲۱)

অর্থাৎ "মুনাফেকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি তাদের কোনও সাহায্যকারী পাবে না। অবশ্য, যে তওবা করে এবং সংশোধিত হয় এবং খোদাতা'লার শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে ও খোদাতা'লার জন্যে নিজের আনুগত্যকে নির্দিষ্ট করে, তারা মুমেনদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আল্লাহ্ মুমেনদেরকে শীঘ্রই মহান পুরস্কারে ভূষিত করবেন।" *(আল্-নিসা, রুকূ ঃ ২১)*।

এখানে مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ শব্দাবলী আছে কিন্তু "مَعَ" 'মাআ' শব্দটি "مِنْ" 'মিন' এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর তেমনি সূরা আল্-হিজ্র ৩য় রুকূতে এসেছে ঃ

مَا لَكَ أَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

"হে ইবলীস! কেন তুই সিজদাকারীদের সঙ্গে হলি না ?" কিন্তু সূরা আ'রাফের ২নং রুকূতে আছে ঃ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ "ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি" এখানে 'মাআ'র পরিবর্তে 'মিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব কুরআন করীমে "مَعَ" 'মাআ' مِنْ 'মিন'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন করীমের সুবিখ্যাত অভিধান 'মুফরাদাতুল কুরআনে'ও (ইমাম রাগিব প্রণীত) লিখা আছে ঃ

وَقَوْلُهٗ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ، اَیْ اجْعَلْنَا فِيْ زُمْرَتِهِمْ اِشَارَةً اِلٰى قَوْلِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - (مفردات راغب صفحہ ۴۳۵ زیر لفظ کتب)

(মুফরাদাতে রাগিবঃ পৃঃ ৪৩৫, 'কাতাবা' শব্দের অধীনে)

অর্থাৎ- "ফাক্‌তুব্‌না মায়াশ্-শাহেদীন"-এর মধ্যে "مَعَ" 'মাআ' শব্দটির অর্থ এই যে, আমাদেরকে শাহেদীনের (সাক্ষ্যদাতাদের) দলভুক্ত কর, যেমন "ফাউলায়কা মাআল্লাযীনা আন্‌আমাল্লাহু আলায়হিম" আয়াতে مَعَ 'মাআ' শব্দের অর্থ এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুবর্তিতাকারীরা পুরস্কারপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।" তেমনি আল্-বাহ্‌রুল মুহীত তফসীর গ্রন্থে ইমাম রাগিবের ঐ কথাটির অধিকতর ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে নিম্নরূপঃ

قَالَ الرَّاغِبُ مِمَّنْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفِرَقِ الْاَرْبَعِ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالثَّوَابِ النَّبِيَّ بِالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيْقَ بِالصِّدِّيْقِ وَالشَّهِيْدَ بِالشَّهِيْدِ وَالصَّالِحَ بِالصَّالِحِ -

(تفسیر بحر محیط جلد ۳ صفحہ ۲۸۷ مطبوعہ مصر)

(তাফসীর বাহ্‌রে মুহীত ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭, মিসরে মুদ্রিত)

অর্থাৎ-"ইমাম রাগিবের দৃষ্টিতে এ আয়াতের মর্ম হলো, এই আজ্ঞানুবর্তীগণ মাকাম ও মর্তবার দিক দিয়ে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহগণের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ এই উম্মতের নবী, নবীর সাথে, সিদ্দীক সিদ্দীকের সাথে, শহীদ শহীদের সাথে এবং সালেহ্ সালেহ্র সাথে হবে।"

৩। তেমনিভাবে মুসলমানদের সম্বোধন করে আল্লাহ্তা'লা কুরআন করীমে বলেছেনঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ (الاعراف ع)

অর্থাৎ- "হে আদম-সন্তানগণ! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার রসূলগণ আসে, যারা আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তাহলে যারাই তাক্ওয়া (খোদাভীতি) এবং সংশোধন ব্যবস্থাকে অবলম্বন করবে, তাদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভয় থাকবে না। এবং তারা বিগত কৃতকর্মের জন্যেও দুঃখিত হবে না"।

(আল্-আ'রাফ, রুকূ-৪)

এ আয়াতে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে রসূলগণ আসতে থাকবেন। আর তেমনি কুরআন করীমে আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ○ (المرسلٰت ع)

"এবং যখন রসূলগণকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আনয়ন করা হবে"।

(সূরা আল্- মুরসিলাত, রুকূ-১)

তাফসীরে-'কুম্মী'তে লিখা আছে ঃ

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا مِّنْ لَّدُنْ اٰدَمَ اِلَّا وَيَرْجِعُ اِلَى الدُّنْيَا فَيَنْصُرُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(تفسیر القمّی صفحہ ۲۳)

"আল্লাহ্তা'লা আদম থেকে নিয়ে শেষ অব্দি যত নবী পাঠিয়েছেন, তারা সবাই দুনিয়াতে ফিরে আসবেন এবং আমীরুল মুমেনীন আল্ ইমামুল মাহ্দীকে সাহায্য করবেন।" *(তাফসীর আল্ কুম্মী ঃ পৃঃ ২৩)*

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে সমস্ত নবী-রসূলই আসবেন। তথাপি তাঁর (সাঃ) খতমে-নবুওয়ত ভঙ্গ হবে না।

মোট কথা, কুরআন করীমের ঐ সকল আয়াতের মধ্যে কয়েকটি নমুনা স্বরূপ লিপিবদ্ধ করা হলো, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যপূর্ণ দাসত্বে, তাঁরই কুরআন-সুন্নাহ্র বাহক ও অধীন হয়ে এবং তাঁর দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্যে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে 'উম্মতি নবী' আসতে পারেন, যিনি আঁ-হযরত সালাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম জিন্দা নবী হবার ও কুরআন

করীম জিন্দা কিতাব হবার এবং ইসলাম জিন্দা (চিরঞ্জীব) ধর্ম হবার বিষয়ে চির অম্লান এবং চূড়ান্ত অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ হবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ'লে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ও সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ"।

'খাতামান্নাবীঈন'এর অর্থ আরবী অভিধানের আলোকে ঃ

خَاتَم 'খাতাম' শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে আরবী ভাষায় যে সব মৌলিক অথবা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঐ যাবতীয় অর্থেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে। যেমন-

আখেরী নবী ঃ আয়াতে-কুরআনী এবং আহাদীস-নববী অনুযায়ী হযরত সারওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নবীঈন হওয়া এই অর্থে সপ্রমাণিত এবং সুস্পষ্ট যে, তিনি শরীয়তবাহী নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। তাঁর শরীয়ত চিরস্থায়ী ও চিরবলবৎ। কখনও মনসুখ (রহিত) হবে না। খাতামান্নাবীঈন-এর এ অর্থটি সকল ফির্কাসমূহে স্বীকৃত ও সর্বসম্মত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তও এ অর্থেই বিশ্বাসী এবং এর উপরে ঈমান রাখে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেব 'খতমে-নবুওয়তে'র মাকাম সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর মুহাম্মদীয়্যতের মাকামে অনন্য ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই এ মাকামের অধিকারী নয়। তিনি একাধারে 'খাতামুন্নাবীঈন'; আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ মর্যাদা ও মার্গসমূহের দিক দিয়ে আখেরী নবী। তিনি আখেরী নবী তখন থেকেই, যখন আদম (আঃ)-কে, নবুওয়ত দূরে থাক, এই পার্থিব দৈহিক অস্তিত্বও দান করা হয়নি। মোট কথা, নবীরা সকল প্রকার নবুওয়ত মুহাম্মদী নবুওয়তের অধীনে প্রাপ্ত হন। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা এই মুহাম্মদী নবুওয়তের খাতিরে এবং এই মুহাম্মদীয়্যতের মাকামের উদ্দেশ্যেই নিখিল বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্যেই, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ মার্গ সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উপনীত হওয়া সত্ত্বেও খতমে-নবুওয়তের পরিপন্থী হয়নি। তেমনি হযরত আদম (আঃ)–এর আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ মার্গ প্রথম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছা সত্ত্বেও খতমে-নবুওয়তে কোন ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তো এও বলেছেন যে, তাঁর (সাঃ) আধ্যাত্মিক পুত্রগণ অর্থাৎ রব্বানী (আধ্যাত্মিক) উলামা যারা তাঁর কাছ থেকে কুরআনী জ্ঞান অর্জন ক'রে কুরআন করীমের শরীয়তকে সজীব ও দীপ্তিমান করে রাখবেন এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে আবির্ভূত হতে থাকবেন, তাঁরাও ঐ নবীদের মতই হবেন, যাদের মধ্যে কেউ প্রথম আকাশ পর্যন্ত উপনীত হন, কেউ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত, কেউ তৃতীয়,

কেউ চতুর্থ, কেউ পঞ্চমে এবং কেউ ষষ্ঠ আকাশে উপনীত হন। আর এমনও একজন পয়দা হবেন যিনি পরম বিনয় এবং ঐশী প্রেমের সকল স্তর অতিক্রম করার পর এবং পরিপূর্ণ মহব্বতের উন্নততর শিখরসমূহে আরোহণের কারণে সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পার্শ্বে গিয়ে পৌছবেন এবং সৈয়্যদ ও মাওলা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের চরণে স্থান লাভ করবেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রূহানী উন্নতির মার্গ সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উপনীত হওয়াতে যেমন খতমে নবুওয়তের পরিপন্থী হয় নি, তেমনি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এই মহান আধ্যাত্মিক পুত্রের রূহানী উন্নতির মার্গ সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উপনীত হওয়ায়ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মুহাম্মদীয়্যতের মাকামে কোনও বিঘ্ন ঘটায় না।

মে'রাজের চিত্র এই প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপই আমাদের কাছে তুলে ধরে এবং এই শিক্ষাই দান করে যে, কারও রূহানী উন্নতির স্তর সপ্তম আকাশে উন্নীত হলেও, খতমে-নবুওয়তের মাকামে কোন ব্যাঘাত ও বিঘ্নের সৃষ্টি করে না। কেননা সেই উন্নততম মুহাম্মদী মাকাম তারও উর্ধ্বে অবস্থিত মাকাম। বরং (আল্লাহ্ ও রসূল কর্তৃক) আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, রূহানী উন্নতির মার্গসমূহ লাভ করার জন্যে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টিত হও। আমাদেরকে এ সুসংবাদও দান করা হয়েছে যে, মুহাম্মদী উম্মতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের একজন মহান আধ্যাত্মিক পুত্র জন্মলাভ করবেন যিনি রূহানী উন্নতির সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছবেন। তথাপি তাঁর মাকাম হযরত রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কদমেই অবস্থিত হবে।" *(আল্-ফযল ঃ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩ ইং)*

[বিস্তারিত বিবরণের জন্যে *"মাকামে মুহাম্মদীয়্যত কি তফসীর" নামক প্রচার-পত্র দ্রষ্টব্য]।*

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর রচিত গ্রন্থ "ইযালা-এ-আওহামে" বলেন ঃ

"আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম সেই সর্বোচ্চ মর্তবা ও মর্যাদায় সমাসীন আছেন, যা অপেক্ষা আকাশে উচ্চতর আর কোনও মর্তবা ও মর্যাদা নেই।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

— (উহা 'সিদ্রাতুলমুন্তাহা'র কাছে সর্বোচ্চ সাথী ও বন্ধু আল্লাহ্র সাথে অবস্থিত)। উম্মতের সালাত ও সালাম নিরন্তর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের হুযুরে পৌছান হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرَ مِمَّا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ
اَنْبِيَائِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

('হে আল্লাহ্! তোমার নবীদের মধ্যে যে-কোন নবীর উপরে তুমি যে পরিমাণ কৃপা বর্ষণ করেছ তার চেয়েও অধিক পরিমাণে কৃপা বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুবর্তীদের উপরে' -অনুবাদক)।"

নবীদের সরদার বা শ্রেষ্ঠ ঃ

নবুওয়ত আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যময় গুণ। নবীগণ অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে 'খাতাম' তিনিই হয়ে থাকেন, যিনি ঐ সকল অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তরে উপনীত হন।

এই প্রকৃত সত্যের প্রমাণস্বরূপ পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং আরব দেশসমূহের প্রতিষ্ঠিত একচল্লিশটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ-

১। আবু তামাম (১৮৮ হিঃ/৮০৪ইং - ২৩১হিঃ/৮৪৫ ইং) কবিকে 'খাতামুশ্‌শুয়ারা' বলে লিখা হয়েছে। *(ওয়াফইয়াতুল আইয়ান ঃ ১ম খণ্ড)।*

২। আবুত্-তৈয়্যব (৩০৩ হিঃ/৯১৫ ইং -৩৫৪ হিঃ/ ৯৬৫ ইং)-কে 'খাতামুশ্‌শুয়ারা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।
(মুকাদ্দামা দিওয়ানুল মুতানাব্বী, মিসরে মুদ্রিত, পৃঃ ইয়া (আরবী হরফ)।

৩। আবুল আলা আলমুয়ার্‌রা (৩৬৩ হিঃ/৯৭৩ ইং -৪৪৯ হিঃ/ ১০৫৭ ইং)-কে 'খাতামুশ্‌শুয়ারা' বলে আখ্যাত করা হয়েছে।

৪। শায়খ আলী হাযীন (১১১৩ হিঃ/১৭০১ ইং -১১৮০ হিঃ/১৭৬৭ ইং) কে ভারতবর্ষে 'খাতামুশ্‌শুয়ারা' বলে গণ্য করা হয়। *(হায়াতে সা'দীঃ পৃঃ ১১৭)।*

৫। হাবীব শিরাজীকে ইরানে 'খাতামুশ্‌শুয়ারা' বলে মনে করা হয়।
(হায়াতে সা'দীঃ পৃঃ ৮৭)।

৬। হযরত আলী (রাঃ) 'খাতামুল আওলিয়া'।
(তাফসীর সাফী, সূরা আহ্‌যাব)।

৭। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ১৫০হিঃ/৭৬৭ইং -২০৪হিঃ/৮২০ইং) খাতামুল আওলিয়া ছিলেন। *(আল্ তোহ্‌ফাতু আল্-সুন্নিয়া ঃ পৃঃ ৪৫)*

৮। শায়খ ইবনুল আরাবী (৫৬০হিঃ/১১৬৪ইং -৬৩৮হিঃ/১২৪০ইং) 'খাতামুল আওলিয়া' ছিলেন। *(ফতুহাতে মাক্কীয়া গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা।)*

৯। কাফুর 'খাতামুল কেরাম' ছিলেন।
(শরাহ্ দিওয়ানুল মুতানাব্বী ঃ পৃঃ ৩০৪)

১০। ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু মিসরী 'খাতামুল আইম্মা' ছিলেন।
(তাফসীর আল্-ফাতেহা ঃ পৃঃ ১৪৮)।

১১। আল্-সৈয়্যদ আহ্মদ আল্-সনোসী 'খাতামুল মুজাহেদীন' ছিলেন।
(আখবার আল্-জামেয়াতুল-ইসলামীয়া, প্যালেস্টাইন ২৭শে মহররম, ১৩৫২ হিঃ)।

১২। আহমদ বিন ইদ্রীসকে 'খাতেমাতুল উলাময়েল-মুহাক্কেকীন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। *(আল্-আকদিন্নফীস)।*

১৩। আবুল ফযল আল্-অলুসীকে 'খাতামুল-মুহাক্কেকীন' বলে অভিহিত করা হয়েছে।
(তাফসীর রূহুল-মায়ানীর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা)।

১৪। শায়খুল-আযহার সালীমুল-বুশরাকে 'খাতামুল-মুহাক্কেকীন' বলে আখ্যাত করা হয়েছে। *(আল্-হিরাব ঃ পৃঃ ৩৭২)।*

১৫। ইমাম সুইউতীকে (ওফাত ৯১১ হিঃ/১৫০৫ ইং 'খাতেমাতুল-মুহাক্কেকীন' বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। *(তাফসীর ইতকানের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা)।*

১৬। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহ্লভীকে 'খাতামুল-মুহাদ্দেসীন' বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। *(উজালা নাফেয়া)।*

১৭। আল্-শায়খ শামসুদ্দীন 'খাতেমাতুল-হুফ্ফায' ছিলেন।
(আল্-তাজরীদুস-সারীহ্ মুকাদ্দামা ঃ পৃঃ ৪)।

১৮। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ওলী 'খাতামুল আওলিয়া' হয়ে থাকেন।
(তাযকেরাতুল আওলিয়া ঃ পৃঃ ৪২২)।

১৯। উন্নতি করতে করতে ওলী 'খাতামুল আওলিয়া' হয়ে যান।
(ফুতুহুল গায়ব ঃ পৃঃ ৪৩)।

২০। আল্-শায়খ নাজীবকে 'খাতেমাতুল ফোকাহা' বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।
(আখবার আল্-সিরাতুল মুস্তাকীম, ইয়াফা, ২৭শে রজব, ১৩৫৪ হিঃ)।

২১। শায়খ রাশীদ রেযাকে 'খাতেমাতুল মুফাস্সেরীন' বলে আখ্যাত করা হয়েছে।
(আল্-জামেয়াতুল ইসলামীয়া, ৯ই জমাদিউস সানী, ১৩৫৪ হিঃ)।

২২। আল্-শায়খ আবদুল হক্ (৯৫৮হিঃ/১৫৫১ইং॥১০৫২হিঃ/ ১৬৪২ইং) 'খাতেমাতুল ফোকাহা' ছিলেন। *(তাফসীর আল্-আকলীল ঃ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা)।*

২৩। আল-শায়খ মুহাম্মদ নাজীব 'খাতেমাতুল মুহাক্কেকীন' ছিলেন।
(আল্-ইসলাম মিসরী, শা'বান, ১৩৫৪ হিঃ)।

২৪। শ্রেষ্ঠতম ওলী 'খাতামুল বেলায়েত' হয়ে থাকেন।
(মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন ঃ পৃঃ ২৭১)।

২৫। শাহ্ আব্দুল আযীয (১১৫৯ হিঃ-১২৩৬ হিঃ) 'খাতামুল মুহাদ্দেসীন ওয়াল মুফাস্সেরীন' ছিলেন। *(হাদিইয়াতুশ্-শিয়া ঃ পৃঃ ৪)।*

২৬। ইনসান (মানব) হচ্ছে 'খাতামুল-মখলুকাতিল জেসমানীয়া'
(তাফসীর কবীর ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২, মিসরে মুদ্রিত)।

২৭। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ 'খাতেমাতুল হুফ্ফায' ছিলেন।
(আল্-রাসায়েল-নাদেরা ঃ পৃঃ ৩০)।

২৮। আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী 'খাতেমাতুল মুহাক্কেকীন' ছিলেন।
(শারাহ্ হাদীসুল আরবায়ীন ঃ পৃঃ ১)।

২৯। ইবনে হাজ্র আল্-আসকালানী 'খাতেমাতুল হুফ্ফায'।
(তাবাকাতুল মুদাল্লেসীন ঃ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা)।

৩০। মৌলভী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুভী (১১৪৮ হিঃ-১২৯৭ হিঃ) কে 'খাতামুল মুফাস্সেরীন' বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। *(আস্রারে কুরআনীঃ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা)*

৩১। ইমাম সুইউতী 'খাতেমাতুল মুহাদ্দেসীন' ছিলেন।
(হাদিইয়াতুশ্ শিয়া ঃ পৃঃ ২১০)।

৩২। বাদশাহ্ 'খাতামুল হুক্কাম' হয়ে থাকেন। *(হুজ্জাতুল ইসলামঃ পৃঃ ৩৫)।*

৩৩। হযরত ঈসা (আঃ) হলেন 'খাতামুল আস্ফিয়াইল আইম্মা'।
(বাকীয়াতুল মুতাকাদ্দেমীন ঃ পৃঃ ১৮৪)।

৩৪। হযরত আলী (রাঃ) 'খাতামুল আওলিয়া' ছিলেন। *(মানারুল হুদাঃ পৃঃ ১০৯)।*

৩৫। আল্-শায়খ আল্-সাদ্দুককে 'খাতামুল মুহাদ্দেসীন' বলে লিখিত হয়েছে।
(মান লা ইয়াহ্যুরুহুল ফাকীহ্ গ্রন্থ)।

৩৬। আবুল ফযল শিহাব আল্-অলূসীকে (৭৭৩ হিঃ/১৩৭১ ইং- ৮৫৪ হিঃ ১৪৫০ ইং) 'খাতামুল উদাবা' (শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক) হিসেবে লিখিত হয়েছে।
(রূহুল মায়ানী'র প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা)।

৩৭। আল্-শায়খ ইব্রাহীম আল্-কুরানীকে রূহুল মায়ানী গ্রন্থের রচয়িতা 'খাতেমাতুল মুতায়াখ্খেরীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
(তাফসীর রূহুল মায়ানী ঃ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩)।

৩৮। মৌলভী আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীকে 'খাতামুল মুহাদ্দেসীন' বলে লিখিত হয়েছে।
(কিতাব রাঈসুল আহরারঃ পৃঃ ৯৯)।

৩৯। হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার (৫১৩ হিঃ/১১১৬ ইং-৬২০ হিঃ / ১২২৩ ইং) হযরত উমর (রাঃ)-এর সম্বন্ধে বলেন ঃ

ختم کرده عدل و انصافش بحق
تا فراست برده از مردم سبق (منطق الطیر ص۲۹)

"সত্য-সত্যই তিনি ন্যায়বিচার ও আদল-ইনসাফকে খতম বা নিঃশেষিত করেছেন (অর্থাৎ এর পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন), এমন কি, জ্ঞান-বুদ্ধিতেও সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।" *(মান্তেকুত্ তায়র ঃ পৃঃ ২৯)।*

৪০। জনাব মৌলানা হালী শেখ সা'দী সম্পর্কে লিখেছেন ঃ-

"আমাদের মতে আঘাত-প্রতিঘাত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা যেমন ফিরদৌসীতে খতম, ঠিক তেমনি নৈতিকতা, উপদেশ, প্রেম ও যৌবন, রসভোগ ও কৌতুকতা, নিষ্ঠা ও লৌকিকতা ইত্যাদির বর্ণনা শায়খের উপর খতম"।

(হায়াতে সা'দী (রহঃ)ঃ পৃঃ ১০৮)।

৪১। হযরত মৌলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুভী (১২৪৮হিঃ-১২৯৭হিঃ) লিখেছেনঃ

"অতএব, যে ব্যক্তি সকল গুণের খাতাম তথা খাতামুস-সিফাত গুণের অধিকারী, যার মধ্যে এর বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রকাশমান, তার ঊর্ধ্বে কোনও গুণের প্রকাশ সম্ভব নয় এবং মানবজাতিকে দেবার মত আর কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অবকাশ থাকে না, সে-ব্যক্তিই মাখলুকাতের মধ্যে 'খাতামুল্ মারাতেব' বলে সাব্যস্ত হবেন এবং তিনিই সকলের সেরা (সরদার) এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবেন।"

(রিসালাহ্ ইন্তেসারুল ইসলাম, পৃঃ ৪৫)।

'খাতাম' শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত এইসব দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, খাঁটি আরববাসী ও আরবী ভাষাভাষীগণ এবং ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন গবেষক উলামার মতে যখনই কোন প্রশংসাভাজন ব্যক্তিত্বকে খাতামুশ্শুয়ারা (কবিদের খাতাম), খাতামুল্ ফোকাহা (ফকীহ্দের খাতাম), খাতামুল্ মুহাদ্দেসীন (মুহাদ্দেসদের খাতাম) বা খাতামুল্ মুফাস্সেরীন (তাফসীকারকদের খাতাম) বলা হয়, তখন এর অর্থ হয়ে থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্বাপেক্ষা বড় ফিকাহ্বিদ, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হাদীসবিদ বা সর্বোত্তম তাফসীরকারক।

উক্ত অর্থ অনুযায়ী 'খাতামান্নাবীঈন'-এর অর্থ হবে এই যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মধ্যে নবুওয়ত ও রিসালতের প্রত্যেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিসমাপ্তি তথা পরিপূর্ণতা ঘটেছে। তিনি অপেক্ষা বড় অথবা তাঁর সমান ও সমকক্ষ কোন নবী বা রসূল হয় নি এবং কখনও হবে না। অন্য কথায়, তিনি আফযালুল আম্বীয়া, সৈয়্যদুল মুরসালীন এবং তিনি সকল নবীদের কামালাত—পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি ও আধার। 'খাতামান্নাবীঈন'-এর উক্ত অর্থ সম্বন্ধে এ উম্মতের সকল যুগের সকল শ্রেণীর আলেমদের সর্বসম্মত ঐক্যমত চলে এসেছে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাতামান্নাবীঈনের এ অর্থটিও সর্বতোভাবে স্বীকার করে। আহমদীয়া সিলসিলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেন ঃ

"আমার ধর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে যদি একদিকে রাখা হতো আর অন্যদিকে পূর্ববর্তী সমগ্র রসূলকুল যদি মিলিতভাবে সেই কর্মকাণ্ড ও

সংস্কারকার্য সমাধা করতে চাইতেন যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম একা সমাধা করেছিলেন, তথাপি তাঁরা সকলে মিলিতভাবে তা করতে পারতেন না। কেননা তাঁরা সেই অন্তঃকরণের ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, যে অন্তঃকরণ ও ক্ষমতা আমাদের নবী (সাঃ) প্রদত্ত হয়েছিলেন। যদি কেউ বলে যে, এরূপ উক্তি 'মায়াযাল্লাহ্' নবীগণের বেয়াদবী বা সম্মানহানি বিশেষ, তাহলে ঐ নাদান (অজ্ঞ) আমার প্রতি মিথ্যারোপকারী হবে। আমি নবীকূলের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা আমার ঈমানের অংগ বলে মনে করি। কিন্তু সমগ্র নবীকূলের মধ্যে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার ঈমানের সর্বপ্রধান অংগ, এবং আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট ও শিরায় শিরায় মিশ্রিত। তা আমার মন ও মস্তিষ্ক থেকে বিসর্জন দেয়া বা বের করে দেয়া আমার সাধ্যাতীত।" *(আল্-হাকামঃ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০১ ইং)।*

নবীদেরকে খতম বা নিঃশেষকারী ঃ

যদি 'খাতামান্নাবীঈন'-এর অর্থ 'নবীদেরকে খতম বা নিঃশেষকারী' করা হয়, তা'হলে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হবে এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কিভাবে ও কিরূপে নবীদেরকে খতম করলেন? দৈহিক ও পার্থিব জীবন অবসানের তো প্রশ্ন ছিল না। ঐ সব নবী তো পূর্বেই ইন্তেকাল করে গিয়েছিলেন। যে একজন নবী হযরত ঈসা (আঃ) খ্রীষ্টানদের মতে জীবিত বলে বিবেচিত হতেন, হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরেও তথাকথিত আলেমদের মতে তাঁকে জীবিত বলেই সাব্যস্ত করা হয়। আর রইল আধ্যাত্মিক অর্থে খতম করা, তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, হযরত খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ) সকল নবীদেরকে কামালাত তথা গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর দিক দিয়ে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সকল নবী অপেক্ষা পূর্ণতর, উচ্চতর এবং উৎকৃষ্টতর। তাঁর শান এই যে, তাঁর মধ্যে কেবল নবুওয়তই নয়, বরং সমুদয় রূহানী কামালাত—আধ্যাত্মিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যেমন, সিলসিলা আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেন ঃ

ختم شُد بر نفسِ پاکش ہر کمال　　　لاجرم شُد ختم ہر پیغمبرے

["আপনার পবিত্র ব্যক্তিত্বে প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং কল্যাণ ও মর্যাদা নিঃশেষিত হয়েছে অর্থাৎ সকল গুণে ও মর্যাদায় তিনি পরিপূর্ণতা ও চরমত্ব লাভ করেছেন। এবং নিঃসন্দেহে প্রত্যেক পয়গম্বরও নিঃশেষিত হয়েছেন। এরূপে সব নবীর কল্যাণ-ধারা রুদ্ধ হয়েছে। একমাত্র তিনিই এখন সকল কল্যাণ ও মর্যাদা লাভের উৎস" -অনুবাদক]।

তিনি তাঁর রচিত 'তওযিহে-মারাম' গ্রন্থে আরও বলেন, "আমাদের প্রভু ও নেতা 'সৈয়্যদুল কুল' (সমস্ত সৃষ্টির সেরা) ও 'আফযালুর রুসুল' (সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ) হযরত খাতামুন্নাবীঈন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্য এক উচ্চস্থান ও উন্নত মর্যাদা, যা একমাত্র সেই পূর্ণগুণময় ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কারও

পক্ষে উক্ত মর্যাদা লাভ করা দূরে থাক এমন কি উক্ত মর্যাদার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও কঠিন।"

নবীগণের মোহর ঃ-

আরবী ভাষায় خاتم (খাতাম) মোহরকে বলা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নবীগণের মোহর হিসেবেও দৃঢ়বিশ্বাস রাখে। আহমদীয়া সিলসিলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা তাঁর রচিত 'হাকীকাতুল্-ওহী' গ্রন্থে বলেনঃ

"আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে 'সাহেবে-খাতাম' (মোহরের অধিকারী) বানিয়েছেন অর্থাৎ তাঁকে আধ্যাত্মিক কামাল ও কল্যাণ সঞ্চারের জন্যে মোহর দান করেছেন যা অন্য কোনও নবীকে দান করা হয়নি। সেজন্যেই তাঁর নাম সাব্যস্ত হয় 'খাতামান্নাবীঈন', অর্থাৎ তাঁর অনুগমন ও অনুবর্তিতা নবুওয়তের কামাল ও কল্যাণরাজি প্রদান করে, তাঁর রূহানী মনোনিবেশ নবী গঠনকারী বিশেষ। এই পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোনও নবীকে দেয়া হয়নি। উক্ত অর্থটিই নিম্নরূপ হাদীসটি বহন করে ঃ عُلَمَاءُ اُمَّتِيْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ (আমার উম্মতে বহু আলেম এমনও হবে যারা বনী ইস্রাঈলের নবীগণের তুল্য হবে)। ইস্রাঈল বংশে যদিও বহু নবী এসেছেন, কিন্তু তাঁদের নবুওয়ত মূসা (আঃ)-এর অনুগমনের ফলশ্রুতি স্বরূপ ছিল না। বরং সে সকল নবুওয়ত ছিল খোদাতা'লার সরাসরি অনুদান ও অনুগ্রহ বিশেষ। হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণের তাতে বিন্দুমাত্রও প্রভাব ছিল না।"

সেই সঙ্গে আহমদীয়া সিলসিলার স্থপতি অত্যন্ত জোরালোভাবে ইহাও ঘোষণা করেন যে, মুহাম্মদী মোহরের এই আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবলমাত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গোলামী ও দাসত্বের মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। তদীয় গ্রন্থ 'হাকীকাতুল্ ওহী'-তে তিনি বলেন ঃ-

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম) **কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী!** তাঁর উচ্চ মর্যাদার সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয়। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোসের বিষয়, যেভাবে সনাক্ত করা উচিত তাঁর মর্যাদাকে সেভাবে সনাক্ত করা হয়নি। সেই তৌহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তিনিই একমাত্র মহাবীর তা পুনরায় দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন। তিনি খোদাকে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছেন। আদম-সন্তানের জন্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের সহানুভূতিতে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এইজন্যে খোদা, যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন তিনি তাঁকে সকল নবীর, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের, উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর আশা-আকাঙ্খাকে তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করেছেন। ইনিই তিনি, যিনি প্রত্যেক কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কল্যাণরাজীকে স্বীকার না ক'রে কোনও

মর্যাদালাভের দাবী করে, সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রত্যেক মর্যাদার চাবিকাঠি তাঁকেই দান করা হয়েছে।"

('হাকীকাতুল্ ওহী' পৃষ্ঠা ঃ ১১৫-১১৬)।

সিলসিলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খতমে-নবুওয়তের এই দিকটির উপরে যা-কিছু তাঁর লিখায় আলোকপাত করেছেন তার সমর্থন অধুনা যুগের উলামাও করেছেন। সুতরাং দেওবন্দী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম মৌলানা মাহমুদুল হাসান এবং মৌলানা শাব্বির আহ্‌মদ ওসমানী প্রণীত 'তরজমায়ে কুরআনে' লিখেছেন ঃ-

"পার্থিব উপকরণের জগতে আলোর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত স্তর ও মর্তবার যেমন সূর্যের মধ্যে এসে সমাপ্তি ঘটেছে, তেমনি নবুওয়ত ও রিসালতের সকল মর্তবা ও কামালতের ধারাও মুহাম্মদী আত্মায় সমাপ্ত হয়েছে (চরমত্ব লাভ করেছে)। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, তিনি (সাঃ) কাল এবং পদমর্যাদা উভয় দিক দিয়ে খাতামুন্নাবীঈন। যাঁরাই নবুওয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা (অর্থাৎ সকল নবীগণ) তাঁরই মোহরে মোহরাঙ্কিত হয়ে নবী হয়েছেন।"

তেমনিভাবে, দারুল-উলুম, দেওবন্দের অধ্যক্ষ মৌলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব বলেন ঃ-

"হুযূরের শান কেবল নবুওয়তই সাব্যস্ত হয় না, বরং নবুওয়ত দান ও বিতরণও সাব্যস্ত হয়, এই কারণে যে, নবুওয়তের ক্ষমতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন যে ব্যক্তিই তাঁর মুখোমুখী হলো সে-ই নবী হয়ে গেল।" *(আফতাবে নবুওয়তে কামিলঃ পৃঃ ১০৯, প্রকাশক ঃ ইদারা উসমানিয়া, ৩২ নং আনারকলি, লাহোর)।*

সারকথা এই যে, কুরআন ও হাদীস এবং আরবী ভাষা ও অভিধান– যে আঙ্গিকেই দেখা হোক, এ সত্যটি প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান যে, আজ সমগ্র জগতের মুসলমানদের মধ্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তই এই গৌরবের অধিকারী, যারা সকল দিক দিয়েই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে 'খাতামান্নাবীঈন' বলে স্বীকার করে এবং খতমে-নবুওয়তের পবিত্র আকীদাটির উপরে নিশ্চিত জ্ঞানমূলে সন্দেহাতীতভাবে ঈমান রাখে।

আহমদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা তাঁর রচিত এক কবিতায় বলেন ঃ

"আমরা তো মুসলমানদেরই দীন ও ধর্মের ধারক ও বাহক।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা খাত্‌মুল মুরসালীন (সাঃ)-এর সেবকবৃন্দ।।

শেরক ও বিদয়াতের প্রতি আমরা বিতৃষ্ণ।

আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রিয় আহ্‌মদের (সাঃ) পথের ধূলিকণাবৎ।।

যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কামে আমরা বিশ্বাসী।

হৃদয় ও প্রাণ এই পথে কোরবান।।

তাঁকে আমরা আমাদের হৃদয় উৎসর্গ করেছি, এখন কেবল মাটির দেহটিই অবশিষ্ট আছে।

মনোবাঞ্ছা কেবল এটুকুই, তাও যেন হয় উৎসর্গ।।" *(ইযালা-এ-আওহাম ঃ পৃঃ ৪১৪)*

আয়াত 'খাতামান্নাবীঈন'-এর ব্যাখ্যা হাদীসসমূহের আলোকে

১। 'খাতামান্নাবীঈন' সংক্রান্ত আয়াত নাযেল হবার পর রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এর অর্থ বুঝার জন্য একটি অভ্রান্ত চাবিকাঠি উম্মতের হাতে তুলে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, হিজরী ৫ সনে 'খাতামান্নাবীঈন' সংক্রান্ত আয়াতটি নাযেল হয় এবং হিজরী ৯ সনে হুযূর (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর পুত্র ইবৃরাহীম জন্মগ্রহণ করেন এবং তারপর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ-

لَوْعَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (ابن ماجه كتاب الجنائز)

-"যদি ইবৃরাহীম বেঁচে থাকতো, তাহলে নিশ্চয় সে সত্যনবী হতো।"

(ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয)

হুযূর (সাঃ)-এর উক্ত ইরশাদটি 'খাতামান্নাবীঈন' আয়াত নাযেল হওয়ার পরবর্তীকালের। তাই এই হাদীসটির দ্বারা 'খাতামান্নাবীঈন'-এর সুস্পষ্ট তফসীর ও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। হুযূর পাকের (সাঃ) এই ইরশাদ অনুযায়ী 'খাতামান্নাবীঈন' শব্দগুচ্ছটি সিদ্দীক নবী বা উম্মতিনবী হবার পথে কোন প্রতিবন্ধক নয়। যদি হুযূর (সাঃ)-এর মতে 'খাতামান্নাবীঈন'-এর এইরূপ অর্থ হতো যে, তাঁর পরে কোন প্রকারের নবী আসতে পারে না, তাহলে তিনি ঐ উপলক্ষে বলতেন, "আমার পুত্র ইবৃরাহীম জীবিত থাকলেও নবী হতে পারত না, কেননা আমি 'খাতামান্নাবীঈন'।" কিন্তু হুযূর পাক (সাঃ) যদিও খাতামান্নাবীঈন, তথাপি বলেছেন, তাঁর পুত্র বেঁচে থাকলে নিশ্চয় নবী হতো। অন্য কথায়, সাহেবযাদা ইবৃরাহীমের নবী হবার পথে তাঁর মৃত্যুই প্রতিবন্ধক ছিল, 'খাতামান্নবীঈন' সংক্রান্ত আয়াতটি প্রতিবন্ধক ছিল না। ইহা এমনই একটি কথা যেমন কোন মেধাবী ছাত্র মারা গেলে বলা হয়, "সে যদি জীবিত থাকত তাহলে এতদিনে নিশ্চয়. এম, এ পাশ করে ফেলতো।" এ বাক্যটি এমতাবস্থায়ই বলা যাবে, যখন মানুষের পক্ষে এম, এ পাশ করার পথ খোলা থাকে। যদি এম, এ ডিগ্রী লাভের পথই বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কোনও ব্যক্তির এম, এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হওয়াই সম্ভবপর না হয়, তাহলে মেধাবী ছাত্রের মৃত্যুতে একথা বলা যায় না যে, "সে যদি জীবিত থাকত, তাহলে এম, এ পাশ করে ফেলতো'।

"লাও আ'শা লাকানা সিদ্দীকান্নাবীয়া"-হাদীসটির প্রামাণিকতার ব্যাপারে হাদীসবিদ ইমামগণের ঐক্যমত রয়েছে। ইমাম শিহাব লিখেছেন ঃ

" اَمَّا صِحَّةُ الْحَدِيْثِ فَلَا شُبْهَةَ فِيْهَا لِاَنَّهُ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ اِبْنُ حَجْرٍ "

(الشهاب على البيضاوى جلد ٧ ص١٧٥)

-"হাদীসটির সত্যতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা ইবনে মাজা এবং অন্যান্যরা ইহা বর্ণনা করেছেন। এ কথাটি ইবনে হাজরও উল্লেখ করেছেন।"

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিখ্যাত হানাফী ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) হাদীসটি তিনটি সনদে (পন্থায়) বর্ণিত এবং শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত করে লিখেছেন ঃ-

" لَوْعَاشَ اِبْرَاهِيْمُ وَصَارَ نَبِيًّا وَكَذَا لَوْصَارَ عُمَرُ نَبِيًّا لَكَانَا مِنْ اَتْبَاعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَعِيْسٰى وَالْخِضْرِ وَاِلْيَاسَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالٰى خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ اِذِ الْمَعْنٰى اَنَّهُ لَا يَاْتِىْ نَبِىٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اُمَّتِهٖ "

-"যদি ইব্‌রাহীম জীবিত থাকতেন এবং নবী হয়ে যেতেন আর তেমনি হযরত ওমর নবী হয়ে যেতেন, তাহলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুবর্তী তথা উম্মতিই থাকতেন। তাঁরা শরীয়তবিহীন হতেন, যেমন ছিলেন ঈসা, খিজ্‌র এবং ইলিয়াস (আলায়হিমুস্‌সালাম)। এইরূপ (উম্মতি নবী) হলে তা 'খাতামান্নাবীঈন'-এর বিরোধী হতো না। কেননা, 'খাতামান্নাবীঈন'-এর তো অর্থ এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে এরূপ কোন নবী আসতে পারেন না যিনি তাঁর শরীয়তকে রহিত করেন এবং তাঁর উম্মতের অন্তর্ভূক্ত ও তাঁর অনুবর্তী না হন।"

(মওযুয়াতে কবীর- মুল্লা আলী কারী (রহঃ) ঃ পৃঃ ৬৯)।

২। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে এই উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে চারবার 'নবীউল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র নবী) বলে অভিহিত ক'রে তাঁর পদমর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে। *(সহী মুসলিম ঃ ২য় খণ্ড, বাবু যিক্‌রিদ্দাজ্জাল)।*

৩। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিম্ন হাদীসটিও একটি বিখ্যাত হাদীস ঃ-

" اَبُوْبَكْرٍ اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَبِىٌّ " (كنوز الحقائق)

"হযরত আবুবক্‌র (রাঃ) এই উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবে এই উম্মতে কোন নবী পয়দা হলে তিনি ব্যতীত।" *(কুনুযুল হাকায়েক)*

৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

"قُولُوْا اِنَّهُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ" (تکملہ مجمع البحار ص۸۳)

-"হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে তোমরা খাতামুন্নাবীঈন তো বল কিন্তু এমনটি বলো না যে, তাঁর পরে আর কোন প্রকারের নবীই হবে না।" *(তকমেলা মাজমাউল বেহার, পৃষ্ঠা-৮৩)*

তারপর, ইবনে মাজার উল্লিখিত হাদীসটিতে হুযূর পাক (সাঃ) বলেছেন, "যদি আমার পুত্র ইব্‌রাহীম জীবিত থাকতো, তাহলে নবী হতো"।

এসব হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই উম্মতে এক ধরনের নবুওয়তের দুয়ার খোলা আছে। আর তা হলো রসূলের (সাঃ) মধ্যে আত্মবিলীন ('ফানা ফির্ রসূল") হয়ে নবুওয়তকে লাভ করার।

নিঃসন্দেহে এইরূপ হাদীসের মোকাবেলায় অন্যরূপ হাদীস রয়েছে, যেগুলিতে দৃশ্যতঃ নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ বলে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের নিকট নীতিগতভাবে এ সমুদয় হাদীসের সমাধান এই, যে-সব হাদীসে নবুওয়তকে বন্ধ বলে বর্ণিত হয়েছে, তদ্দ্বারা নতুন শরীয়তবাহী অথবা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবুওয়তকে বুঝায়। এবং যে-সব হাদীসে নবুওয়তের সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে শরীয়তবিহীন এবং উম্মতী নবুওয়তকে বুঝানো হয়েছে। এইরূপে সমুদয় হাদীসের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটে এবং এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাব্যস্ত হয়।

(সবিস্তারে এ দিকটির উপর "আল্-কওলুল মুবীন ফী তাফসীরে খাতামান্নবীঈন" পুস্তকটি পরিশিষ্ট-৬ হিসেবে সংযোজিত করা হয়েছে)।

অতএব, মিলিতভাবে সমুদয় হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের পরে নতুন শরীয়ত আনয়নকারী নবীর অথবা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীর আগমন রুদ্ধ। তবে উম্মতি নবী এবং মুহাম্মদী শরীয়তের অধীন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুবর্তী নবীর আগমনের সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ সূত্রেই এবং এ কারণবশতই, সমুদয় ফির্কা আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুগামী নবী হিসেবে স্বীকার করেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতি নবী বলে বিশ্বাস করেন। এটাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেরও বিশ্বাস।

অতীতের ইমামগণ কর্তৃক খতমে নবুওয়তের ব্যাখ্যা ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইহাও দাবী যে, তারা নীতিগতভাবে খতমে নবুওয়তের ঐ যাবতীয় তফসীর ও অর্থকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে, যাতে আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অত্যুচ্চ ও অনন্য শান ও মর্যাদা আরও শক্তিশালী হয় এবং যা বুযুর্গানে-উম্মত ও ইমামগণ বিগত তের শতাব্দী ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

(এ সত্যটির প্রমাণে "খাতামুল আম্বীয়া" নামক পুস্তিকাটি পরিশিষ্ট-৭ হিসেবে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে)।

জিহাদ অস্বীকার করার অভিযোগের প্রকৃত স্বরূপ

১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধাচারীদের পক্ষ থেকে এ অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি 'নাউযুবিল্লাহ্‌' ইসলামের অবশ্য কর্তব্য জিহাদকে রহিত করে দিয়েছেন। এ অপবাদটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 'জিহাদ' ইসলামের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যার বাধ্যকতা এবং গুরুত্ব কুরআন করীম ও আহাদীস-নব্‌বীর আলোকে সুস্পষ্ট। 'জিহাদ' একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। দীনের আলেম ও ফকীহ্‌গণ জিহাদের বহুবিধ শ্রেণীভেদ স্বীকার করেছেন। যেমন, জিহাদ বিন্নাফ্‌স (আত্মশুদ্ধিমূলক জিহাদ), জিহাদ বিল-মাল (অর্থ দ্বারা জিহাদ), জিহাদ বিল-ইল্‌ম (জ্ঞান দ্বারা জিহাদ), জিহাদে আকবার (সর্ববৃহৎ জিহাদ), জিহাদে কবীর (বৃহৎ জিহাদ) এবং জিহাদে আসগার (ক্ষুদ্র জেহাদ)।

জিহাদে-আসগার অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা যে ক্ষুদ্র জিহাদ করা হয়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার পূর্ববর্তী উলামা ও ফুকাহা জিহাদের এই শ্রেণীকে, যা কুরআনের পরিভাষায় 'কিতাল' – বিশেষ অবস্থা এবং শর্তাবলীর সাথে সংযুক্ত বলে নির্ধারণ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে কালক্রমে জিহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ঢুকে পড়েছে যে, ইসলামকে যুদ্ধের মাধ্যমে তলোয়ারের জোরে বিস্তার দেয়ার নাম জিহাদ।

ইসলামী জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার তত্ত্বপূর্ণ বাণীসমূহ পেশ করা হলোঃ

"এখন আমরা এ প্রশ্নটির জবাব লিখতে চাই। জিহাদকে ইসলামের কেন প্রয়োজন পড়েছিল এবং জিহাদ কি বিষয়? জানা উচিত যে, জন্ম হতে না হতেই ইসলামকে বড়ই কঠিন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সকল জাতি ইহার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইহা এক সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার যে, খোদার পক্ষ থেকে যখন কোন নবী বা রসূল আবির্ভূত হন এবং তাঁর অনুসারীগণ মানুষের দৃষ্টিতে প্রতিভাবান, সত্যপরায়ণ, সাহসী ও প্রগতিশীলরূপে পরিলক্ষিত হন, তখন তাদের সম্পর্কে সমসাময়িক জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর অন্তরে এক ধরনের হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম হয়ে থাকে, বিশেষতঃ প্রত্যেক ধর্মের উলামা (পণ্ডিত-পুরোহিত) এবং গদ্দীনশীন পীর-দরবেশরা তো খুবই বিদ্বেষ প্রদর্শন করে। --------- নিতান্ত স্থুল প্রবৃত্তির (নফ্‌সের) বশবর্তী হয়ে অনিষ্ট সাধনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরন্তু প্রায়শঃ তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে যে, তারা খোদার এক পবিত্র বান্দাকে অযথা নির্যাতন ক'রে খোদার ক্রোধের আওতায় এসে পড়েছে এবং বিরুদ্ধাচারী কার্যকলাপ হিসেবে সর্বদা যা তাদের দ্বারা সংঘটিত হতে

থাকে তা তাদের বিবেক ও অন্তরের অপরাধসূলভ অবস্থাকে তাদের নিকট প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে প্রজ্জ্বলিত দ্রুতগামী ইঞ্জিন তাদেরকে শত্রুতার গহ্বর ও গর্তের দিকেই টেনে নিয়ে চলে। এসব কারণই ছিল যা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়কালে মোশরেক, ইহুদী ও খ্রীষ্টান আলেমদেরকে কেবল সত্য গ্রহণ করা থেকেই বঞ্চিত করেনি, বরং চরম শত্রুতায় প্রবৃত্ত ও উদ্যত করে তুলে। অতএব, তারা এই ফিকির-ফঁন্দিতে নিয়োজিত হয়ে পড়ে যাতে যে কোন উপায়ে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। আর যেহেতু মুসলমানগণ ইসলামের প্রারম্ভিককালে স্বল্পসংখ্যক ছিল সেজন্যে তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ঐ অহমিকার কারণে যা স্বভাবতঃ ঐরূপ ফির্কা বা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মন-মস্তিষ্কে বিরাজিত থাকে, যারা নিজেদেরকে ধন-সম্পদে, জনবলে, সম্মান-মর্যাদায় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে, তারা ঐ সময়কার মুসলমান অর্থাৎ সাহাবীদের প্রতি চরম শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহার করে। তারা আদৌ চায়নি যে, এই স্বর্গীয় চারা-গাছটি ধরা-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বরং তারা ঐ সত্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবানদেরকে নিপাত করার জন্যে সর্বাত্মক জোর লাগাতে থাকে এবং নির্যাতন ও উৎপীড়নে কোন রকম ত্রুটি করে না। বস্তুতঃ তাদের ভীতি ছিল, পাছে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এর উন্নতি তাদের ধর্ম এবং জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়, তারা চায় এমনটি যেন না ঘটে। অতএব, এই আশঙ্কাতেই, যা তাদের অন্তরে এক ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় ভয়ের রূপ নেয়, ফলে স্বৈরাচার ও যুলুম-নির্যাতনপূর্ণ কার্যকলাপ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়। তারা বহু রকম বেদনাদায়ক পন্থায় অধিকাংশ মুসলমানকে নিপাত করে। এক দীর্ঘকাল ব্যাপী, যা তেরটি বছর কাল স্থায়ী ছিল, তাদের পক্ষ থেকে এইসব কার্যকলাপ সংঘটিত হতে থাকে। চরম নৃশংসভাবে খোদার বিশ্বস্ত এবং মানবজাতির গৌরবতুল্য বান্দাদেরকে এই সব দুষ্কৃতকারী নরপশুদের তরবারি খণ্ডবিখণ্ড করতে থাকে। এতীম শিশুদের এবং অসহায় নারীদেরকে অলি-গলি ও রাস্তা ঘাটে যবাই করা হয়। তা সত্ত্বেও খোদাতা'লার পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের প্রতি এই তাকিদ ছিল যে, "দুষ্কৃতি ও যুলুম-নির্যাতনের কখনও মুকাবিলা করো না।" আল্লাহ্‌র ঐ সকল মনোনীত ও পসন্দনীয় সত্যাশ্রয়ী বান্দারা তদ্রূপই করেন। তাদের রক্তে রাস্তা-ঘাট রঞ্জিত হয়ে যায়, তথাপি তাঁরা নড়া-চড়া পর্যন্তও করেননি। কুরবানীর পশুর ন্যায় তাদেরকে যবাই করা হয়। তথাপি তারা আহা-উহ্‌ শব্দটুকুও উচ্চারণ করেন নি। খোদাতা'লার পাক, পূত ও পবিত্রতম রসূল, যাঁর উপর স্বর্গ ও মর্ত্য হতে সহস্র-সহস্র সালাম, তাঁকে বহুবার প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার এই পাহাড় তুল্য মহান রসূল ঐ যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট অকুণ্ঠ চিত্তে সাদরে সয়েছেন। বস্তুতঃ ধৈর্য-স্থৈর্য ও বিনয়পূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীদের স্বৈরাচার ও ঔদ্ধত্য দৈনন্দিন বেড়েই যেতে থাকে। তারা এই পবিত্র জামাতটিকে নিজেদের এক সহজ শিকার বলেই মনে করে নেয়। তখন সেই খোদা যিনি চাননি ভূপৃষ্ঠে যুলুম ও নির্দয়তা সীমাতিক্রম করে যাক, তিনি তাঁর নির্যাতিত বান্দাদের স্মরণ করলেন এবং তাঁর

ক্রোধ (গযব) দুষ্টদের উপর উত্তেজিত হলো এবং তিনি তাঁর পাক কালাম কুরআন করীমের মাধ্যমে তাঁর নির্যাতিত বান্দাদেরকে অবহিত করলেন যে, 'যা কিছুই তোমাদের সাথে ঘটে চলেছে তা সবই আমি প্রত্যক্ষ করছি। আমি তোমাদেরকে আজ থেকে তাদের মুকাবিলা করার অনুমতি প্রদান করছি এবং আমি সর্বশক্তিমান খোদা যালিমদেরকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিব না।' ঐ আদেশই ছিল যা ভিন্ন শব্দে 'জিহাদ' বলে নামকরণ করা হয়। ঐ আদেশটির আসল বর্ণনা কুরআন করীমে আজও বিদ্যমান আছে। তা নিম্নরূপ ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ○ إِلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ"

– ['যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায় ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হইয়াছে যে, তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক প্রভু']।" *(গভর্নমেন্ট ইংরেজী আওর জিহাদঃ পৃঃ ১-৪)*

"ইসলাম একমাত্র ঐ লোকদের মোকাবেলায় তলোয়ার ধরবার আদেশ প্রদান করেছে যারা প্রথমে নিজেরা তলোয়ার ধারণ করে এবং তাদেরকে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছে যারা নিজেরা প্রথমে হত্যা করে; এই আদেশ কখনও দেয় নি যে, তোমরা কোন কাফের শাসকের অধীনে থেকে এবং তার ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার দ্বারা উপকৃত হলেও তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আক্রমণ চালাও। কুরআন করীম অনুযায়ী ইহা বদমায়েশদের আচরণ, পুণ্যবানদের নয়। কিন্তু তৌরাতে এই পার্থক্যটি কোথাও খুলে বর্ণনা করা হয় নি। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন করীম তার জালাল (শাস্তি) এবং জামাল (শান্তি) সম্বন্ধীয় হুকুম-আহকাম প্রদানের ক্ষেত্রে আদল-ইনসাফ ও দয়া-মায়া এবং ইহ্সানের এমনই সরল রেখায় চলে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে অন্য কোনও কিতাবে মজুদ নেই।" *(আঞ্জামে আথমঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭)*

"যে যুগে আমরা আছি এতে ধর্মীয় অস্ত্র-যুদ্ধের আদৌ প্রয়োজন নেই। আখেরী যুগে কুরআন ও হাদীস মতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক (বাতেনী) যুদ্ধের আদর্শপূর্ণ নমুনা ও দৃষ্টান্তাবলী প্রদর্শনই অভিপ্রেত ছিল। রূহানী মোকাবিলাই অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল। কেননা সাম্প্রতিককালে অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) ধর্মহীনতা, বক্রতা ও বিভ্রান্তির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বড় বড় উপায়-উপকরণ এবং অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি তৈরী করা হয়েছে। সেজন্যে এইগুলোর মুকাবিলাও জরুরী ছিল একই প্রকারের (বাতেনী) অস্ত্র ও সরঞ্জামাদির দ্বারা। কেননা, আজকাল (এখন থেকে প্রায় একশ' বছর পূর্বে -অনুবাদক) শান্তি ও সন্ধির যুগ এবং সবরকমের স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক-প্রশাসনিক শান্তি-নিরাপত্তা আমাদের পক্ষে সহজলভ্য। স্বাধীনভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার এবং ধর্মীয় হুকুম -আহকাম পালন করতে পারে। তদুপরি ইসলাম যা শান্তি ও নিরাপত্তার সত্যিকার

সহায়ক ও সমর্থক, বরং বস্তুতপক্ষে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধান ও বিস্তারকারী বলতে একমাত্র ইসলাম ধর্মই বটে, এই ধর্ম কি করে এই শান্তি ও স্বাধীনতার যুগে সে পূর্বোল্লেখিত আদর্শ ও নমুনাটি দেখানো পসন্দ করতে পারতো? অতএব, বর্তমান কালে দ্বিতীয় নমুনাটিই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধ্য-সাধনাই অভিপ্রেত।"

(মালফুযাত ঃ ১ম খন্ড, সন পৃঃ ৫৮)

"ইসলামের প্রারম্ভিক কালে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক লড়াই এবং দৈহিক যুদ্ধসমুহের এজন্যেও প্রয়োজন পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীদের জবাব যুক্তি ও দলিল প্রমাণাদির দ্বারা না দিয়ে বরং তলোয়ারের দ্বারাই দেয়া হতো। সেজন্যে নিরূপায় হয়ে প্রত্যুত্তরে তলোয়ার ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তলোয়ারের দ্বারা জবাব দেয়া হয় না, বরং কলম এবং যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। এ জন্যই এ যুগে খোদাতা'লা চেয়েছেন, তলোয়ারের কাজ যেন কলমের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং লিখনীর দ্বারা মুকাবিলা করে বিরূদ্ধবাদীদেরকে পরাস্ত করা হয়। সেজন্যে, এখন কলমের জবাব তলোয়ারের দ্বারা দেয়ার চেষ্টা-প্রয়াস কারও পক্ষে শোভনীয় নয়। "گر حفظِ مراتب نکنی زندیقی" (অর্থাৎ "যদি মওকা ও মর্যাদার তারতম্য রক্ষা না কর তাহলে আস্ত নাস্তিক হয়ে পড়বে" -অনুবাদক)।"

(মলফুযাত, ১খন্ড, পৃঃ ৫৮, ৫৯)

"বর্তমান যুগে তলোয়ার নয়, বরং কলমের আবশ্যক। বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামের উপর যেসব সন্দেহ-সংশয় চাপিয়েছে এবং বিভিন্ন কুটকৌশলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার সত্য ধর্ম ইসলামের উপর আক্রমণ চালিয়েছে সে সবের দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন আমি লেখনীর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই বিজ্ঞান ও জ্ঞান-গরিমার উন্নতির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হই এবং ইসলামের রূহানী শৌর্য-বীর্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া ও লীলা-খেলাও প্রদর্শন করি। আমার পক্ষে কবে ও কিরূপেই বা এই ময়দানের যোগ্যতাসম্পন্ন ভূমিকা পালনকারী সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব ছিল?! ইহা তো একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার ফযল এবং তাঁর কৃপা যে, তিনি চেয়েছেন যেন আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির হাতে এই দীনের সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি এক সময়ে ঐ সকল আপত্তি ও আত্রমণসমূহকে সংগ্রহ ও গণনা করেছিলাম যা ইসলামের উপরে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা উত্থাপন ও পরিচালিত করেছে। ফলে সেগুলোর সংখ্যা আমার ধারণা ও অনুমান অনুযায়ী তিন হাজারে উপনীত হয়েছিল। আমি মনে করি, এখন সে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যেন এমনটি মনে না করে বসে যে, ইসলামের ভিত্তি এতই দুর্বল বিষয়াবলীর উপরে যে, তার উপর তিন হাজার আপত্তি আরোপিত হতে পারে! না, তা কখনও নয়। এ সব আপত্তি তো ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে আপত্তি। কিন্তু আমি আপনাদের সত্য সত্য বলছি যে, আমি যেখানে এই আপত্তিগুলোর পরিসংখ্যান করেছি সেখানে গভীর মনোনিবেশে এটাও অনুধাবন করেছি যে, এসব আপত্তির তলদেশে বা পরতে পরতে প্রকৃতপক্ষে রয়েছে অসংখ্য দুর্লভ সত্য

এবং তত্ত্ব ও তথ্য, যা জ্ঞানাভাবে আপত্তিকারীদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। বস্তুতপক্ষে ইহা আল্লাহ্‌তা'লারই হিকমত যে, জ্ঞানান্ধ আপত্তিকারী যেখানে এসে ঠেকেছে, সেখানেই প্রকৃত সত্য, অকাট্য যুক্তি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্বসমূহের গোপন ভাণ্ডার রাখা আছে।"

(মালফুযাতঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯, ৬০)

"অতএব, জানা উচিত, কুরআন শরীফ অযথা যুদ্ধ-বিগ্রহের আদেশ প্রদান করেনি, বরং একমাত্র ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছে যারা খোদাতা'লার পুণ্যবান বান্দাদেরকে ঈমান আনতে ও তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধা দেয় এবং খোদাতা'লার আদেশাবলী এবং তাঁর যথাযথ ইবাদত পালনে বলপ্রয়োগ ক'রে বাধা দেয়। আর তেমনি ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়, যারা মুসলমানদের সাথে বিনা কারণে (অযথা) যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুমেনদেরকে তাদের ভিটে-বাড়ী এবং মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে বলপ্রয়োগে জবরদস্তি নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করে। ইসলাম ধর্মকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করতে চায় এবং লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়া থেকে বাধা দেয়। এদের প্রতি আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট এবং এরা যদি এইরূপ মন্দ আচরণ হতে বিরত না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুমেনদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।"

(নূরুল কুরআনঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২)

"এই যুগে জিহাদ রূহানী রূপ ধারণ করে নিয়েছে এবং এ যুগের জিহাদ ইহাই যে, আপনারা ইসলামের কলেমাকে সমুন্নত ও গৌরবান্বিত করতে সচেষ্ট হোন, বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগসমূহের যথাযথ উত্তর দিন। ইহাই জিহাদ, যে পর্যন্ত না খোদাতা'লা অন্য কোন প্রকারে দুনিয়াতে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটান।"

(আখবার "আল্‌-বদর", কাদিয়ান, ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৪ ইং, পৃঃ ২৩৯, কঃ ৩)

"খোদাতা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি এই সকল প্রথিত গুপ্তধন দুনিয়াতে প্রকাশিত করি এবং নাপাক আপত্তিসমূহের যে পঙ্কিল কর্দম ঐ সকল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় মণি-মানিক্যের উপর লেপন করা হয়েছে, তাথেকে সেগুলোকে পাক সাফ ও পরিশ্রুত করি। খোদাতা'লার গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) এখন অত্যন্ত উদ্বেলিত, যাতে তিনি কুরআন করীমের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রত্যেক নাপাক দুশমনের আপত্তির দাগ হতে মুক্ত ও পবিত্র ক'রে দেখান।

মোট কথা, বিরুদ্ধবাদীরা লিখনীর দ্বারা আমাদের উপরে আঘাত হানতে চায় এবং আঘাত হানছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি তাদের সাথে লাঠালাঠিতে উদ্যত হয়ে পড়ি তাহলে সেটা খুব বোকামীর কাজ হবে। আমি তোমাদেরকে খুলেই বলছি যে, এমতাবস্থায় যদি কেউ ইসলামের নাম নিয়ে প্রত্যুত্তরে লড়াই এবং যুদ্ধের পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে সে ইসলামের দুর্নামকারী। বস্তুতঃ ইসলামের এরূপ কখনও অভিপ্রায় ছিল না যে, অর্থহীন ও বিনা প্রয়োজনে তলোয়ার ধারণ করা হোক। বর্তমানে যুদ্ধের লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্যাবলী– যেমনটি আমি বর্ণনা করে এসেছি- কৌশলগত রূপে এসে ধর্মীয় উদ্দেশ্য আর থেকে যায় নি, বরং পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী আজিকার যুদ্ধগুলোর বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। অতএব, যদি আপত্তিকারীদেরকে উত্তর দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে তলোয়ার দেখানো হয় তবে তা বড়ই অন্যায় হবে। এখন যুগের পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধ-কৌশলের পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেজন্যে প্রয়োজন, সর্ব প্রথম নিজেদের হৃদয় ও মাথা খাটিয়ে কার্য গ্রহণ করুন, নিজেদের আত্মাকে শোধন ও পবিত্র করুন। সত্যবাদিতা ও তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি ও খোদা-প্রেম)-এর মাধ্যমে খোদাতা'লার কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করুন। ইহা খোদাতা'লার এক অটল ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম এবং সুদৃঢ় নীতি। আর যদি মুসলমানরা কেবল বাকবিতন্ডা দ্বারাই মুকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য ও বিজয়লাভ করতে চান তাহলে তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তা'লা বাগাড়ম্বর এবং কথার বাহার চান না। তিনি তো প্রকৃত তাক্ওয়া চান এবং সত্যিকার ও যথার্থ পবিত্রতা পসন্দ করেন। যেমন, তিনি বলেছেন ঃ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○ (অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরই সাথে আছেন (সাহায্যকারীরূপে) যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সম্যক পুণ্যবান।' - অনুবাদক)।"

(মালফুযাতঃ ১ খণ্ড, পৃঃ ৬০, ৬১)

"কুরআন করীমে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না। দীনের সাক্ষাৎ সৌন্দর্যরাজি, গুণ ও বৈশিষ্ট্যাসমূহ পেশ কর এবং পুণ্য নমুনা ও আদর্শপূর্ণ দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ কর। এ ধারণা কখনও পোষণ করো না যে, সূচনাকালে ইসলামে তলোয়ার ধারণের আদেশ হয়েছিল। কেননা, সে তলোয়ার ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিষ্কাসিত হয়নি, বরং দুশমনের হামলা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্যে অথবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালান হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের জন্যে বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তি করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" *(সিতারা-এ-কায়সারিয়াঃ পৃঃ ১৬)*

"আমি জানি না, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোথায় এবং কার কাছে শুনতে পেয়েছেন যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। খোদাতা'লা তো কুরআন করীমে বলেনঃ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ 'ইসলামধর্মে জোর জবরদস্তি নেই।' তাহলে আবার কে-ইবা জরবদস্তির আদেশটি দিল? তাছাড়াও জবরদস্তি করার মত সাজসরঞ্জামাদিই বা কি ছিল?" *(পয়গামে সুলহঃ পৃঃ ৫১)*

"মসীহ্ মাওউদ দুনিয়ায় এসেছেন যাতে ধর্মের নামে তলোয়ার তোলার ধারণাটাকে দূরীভূত করেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করে দেখান যে, ইসলাম এরূপ এক ধর্ম যা নিজের বিস্তার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তলোয়ারের সাহায্যের কখনও মুখাপেক্ষী নয়। বরং এর শিক্ষামালার সহজাত সৌন্দর্যরাজি, এর শাশ্বত সত্য ও বাস্তব জ্ঞান-তত্ত্বাবলী, অকাট্য দলিল ও যুক্তিপ্রমাণ এবং খোদাতা'লার জীবন্ত নিদর্শন ও স্বর্গীয় সাহায্য এবং এর সাক্ষাৎ ও সহজাত আকর্ষণ এইসব এরূপ বিষয়াদি যা সদাসর্বদা এর

উন্নতি ও প্রসার লাভের কারণ হয়ে এসেছে। সেজন্যে ঐ সকল ব্যক্তি যারা ইসলামকে তলোয়ারের জোরে বিস্তার দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা অবহিত থাকুন যে, তারা তাদের এই দাবীতে মিথ্যাবাদী। ইসলামের সুপ্রভাবসমূহ নিজের প্রসারের জন্যে কোনও জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের মুখাপেক্ষী নয়। যদি কারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে সে এসে আমার কাছে অবস্থান করে দেখে নিক যে, ইসলাম স্বীয় জীবনের প্রমাণ অকাট্য যুক্তি ও ঐশী-নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রদান করে। এখন খোদাতা'লা চান এবং তিনি সংকল্প করেছেন যে, এই যাবতীয় আপত্তিগুলিকে ইসলামের পবিত্র অস্তিত্ব থেকে অপসারিত করেন, যা অপবিত্র লোকেরা এর বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে। অতএব, তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তারের আপত্তিকারীরা দারুণভাবে লজ্জিত হবে।"

(মলফুযাতঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৬)

"ইসলামে শক্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। ইসলামের যুদ্ধসমূহ তিন প্রকারের, এর বাহিরে নয়ঃ

১। প্রতিরোধ স্বরূপ অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক অধিকারের ধারায়,

২। শাস্তিস্বরূপ অর্থাৎ রক্তের বিনিময়ে রক্ত, ও

৩। স্বাধীনতা সংস্থাপনস্বরূপ, অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধাদানকারী, যারা কারও স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়াতে তাকে হত্যা করতো, তাদের পাশবিক শক্তিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে। অতএব, যেখানে ইসলামে কোন নির্দেশনাই নেই যে, কোনও ব্যক্তিকে জবরদস্তি এবং হত্যার হুমকির দ্বারা ধর্মে দীক্ষিত করা যায়, সেখানে কোন রক্তপাতকারী মাহ্‌দী অথবা রক্তক্ষরণকারী কোন মসীহ্‌র আগমনের জন্যে অপেক্ষা করা নিতান্ত বাতুলতা এবং বেহুদা ধারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা, সম্ভবই নয় যে, কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণে এরূপ কোনও মহাপুরুষ আসেন যিনি তলোয়ারের মাধ্যমে মানুষকে মুসলমান করেন।" *(মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ ঃ পৃঃ ১০)।*

"চিন্তা করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি এক ধর্ম এজন্য গ্রহণ করে না যে, সে উহার সত্যতা, উহার পবিত্র শিক্ষা এবং উহার সৌন্দর্য ও সৎগুণসমূহ সম্বন্ধে অদ্যাবধি অজ্ঞ, তাই বলে কি সেরূপ ব্যক্তির সাথে এ আচরণ করাটা সমীচীন হতে পারে যে, তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হয়? বরং ঐরূপ ব্যক্তি তো করুণার পাত্র এবং তার অধিকার রয়েছে তার নিকট যেন নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে ঐ ধর্মের সত্যতা, গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকারিতা সম্যকভাবে উপস্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে এমনটি করা কখনও উচিত নয় যে, তার অস্বীকারের জবাব তলোয়ার অথবা বন্দুকের দ্বারা দেয়া হয়। অতএব, এ যুগের এই ইসলামী ফির্কাসমূহের জিহাদ সংক্রান্ত মতবাদ আর সেই সাথে তাদের এই শিক্ষা যে, শীঘ্রই সে সময় আগতপ্রায় যখন এক খুনী (রক্তপাত কারী) মাহ্‌দীর জন্ম হবে যার নাম হবে ইমাম মুহাম্মদ এবং (ঈসা) মসীহ্

তার সাহায্যার্থে আকাশ থেকে নামবেন এবং উভয়ে মিলিত হয়ে দুনিয়ার সকল বিধর্মীজাতিকে ইসলাম অস্বীকার করার কারণে হত্যা করবেন - এহেন মতবাদ নিঃসন্দেহে চরম পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধী। এটা কি সেই আকীদা-বিশ্বাস নয় যা মানবতার সকল কোমল বৃত্তি ও পবিত্র চেতনাকে নস্যাৎ করে এবং হিংস্র পশু-সূলভ প্রবৃত্তিগুলোর জন্ম দেয়? এহেন আকীদায় বিশ্বাসীদেরকে প্রত্যেক জাতির সংগে মুনাফেকি ও কপটতাপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য করে। *(মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁঃ পৃঃ ৬,৭)*

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মক্কা মুয়ায্‌যামায় এবং তারপরও কাফেরদের হাতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। বিশেষতঃ মক্কার তের বছর এই মহাবিপদ ও প্রত্যেক প্রকারের যুলুম-নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, যা কল্পনা করতেও কান্না আসে। কিন্তু তিনি তখন শত্রুদের মোকাবেলায় তলোয়ার ধারণ করেন নি, এবং তাদের কঠোর গালমন্দের কঠোর উত্তরও দেন নি। অতএব প্রমাণিত, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) ধর্ম বিস্তারের জন্যে কখনও যুদ্ধ করেছিলেন অথবা কাউকে জবরদস্তি ইসলাম ধর্মে প্রবিষ্ট করেছিলেন এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল এবং অন্যায়।" *(মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁঃ পৃঃ ৭,৮)*

২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় উদ্ধৃতিসমূহের পর এখন আমরা তাঁর পূর্ববর্তী বুযুর্গানে- ইসলাম ও তাঁর সমসাময়িক উলামায়ে- কেরাম এবং তঁর পরবর্তী কোন কোন বিখ্যাত আলেমের জিহাদ সম্পর্কে লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। যা দ্বারা আহমদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার অভিমতের প্রতি সমর্থন ও স্বীকৃতি সাব্যস্ত হয় এবং এ সত্যটি খুবই স্পষ্ট হয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, আজ যেসব ফির্কার আলেমগণ আহ্‌মদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার উপর জিহাদকে অস্বীকার করার অপবাদ দিচ্ছেন, সে-সকল ফির্কার উলামাবৃন্দের লিখিত বক্তব্যসমূহ অনুযায়ীই আহ্‌মদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার ফয়সালা শরীয়ত-সম্মত ছিল এবং চুল পরিমাণও তাথেকে বিচ্যুতি বা ব্যত্যয়ের অপবাদ দেয়া যেতে পারে না।

১। তের শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভী (রহঃ)-এর ইরশাদ ঃ

"যদিও ইংরেজ সরকার ইসলামে অবিশ্বাসী, কিন্তু তারা মুসলমানদের উপর যুলুম ও উৎপীড়ন করে না। তাদেরকে ধর্ম পালনে বাধা দেয় না। আমরা তাদের রাজত্বে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা ক'রে ধর্মপ্রচার করে থাকি। এতে তারা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। আমাদের আসল কাজ তৌহীদ প্রচার করা এবং সৈয়্যদুল মুরসালীন (সাঃ)-এর সুন্নতকে সঞ্জীবিত করা। তাদের রাজত্বে আমরা স্বাধীনভাবে একাজ করতে পারি।

সুতরাং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আমরা কি জন্যে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করবো এবং ইসলামের নীতির পরিপন্থি উভয় পক্ষের রক্তপাত ঘটাবো?"
(মৌলানা মুহাম্মদ জা'ফার থানেশ্বরীর লিখিত "সোয়ানেহে আহ্‌মদী" পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠা)

২। হযরত মৌলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ফতওয়া ঃ

"হযরত মৌলানা ইসমাঈল শহীদকে ইসলাম ধর্মে তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত থাকতে হয়েছিল। এই জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি খোতবা প্রণয়ন করেছিলেন। ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও জিহাদ ছিল না। এই গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যে ঐ খোতবাটিতে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতেও কোন উল্লেখ ছিল না। বরং এই গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ করাকে নাজায়েয (অবৈধ) বলে মনে করতেন।"

(ইশায়াতুস্‌সুন্নাহ্‌ঃ ৯ম খণ্ড, সংখ্যা নং ১, পৃঃ ১১, ১২)

৩। মৌলবী নযীর হুসেন সাহেব দেহলভীর ফতওয়া ঃ

"এ দেশে যখন জিহাদের শর্ত তিরোহিত হয়ে গিয়েছে, তখন জিহাদ করা ধ্বংসের কারণ এবং পাপ হবে"। *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াঃ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭২)*

৪। তদানীন্তন তুরস্ক সাম্রাজ্যের 'খলীফাতুল মুসলেমীনে'র ফতওয়া ঃ

জনাব মুর্তযা আহমদ মায়কাশ্ "তারিখে আকওয়ামে আলম" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"খলীফা এ বিষয় সম্বলিত ফতওয়া লিখে ইংরেজদেরকে দিয়ে দিলেন যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত নয়। কেননা, তারা খিলাফতে-ইসলামীয়ার মিত্র ও সাহায্যকরূপে সুপ্রমাণিত হয়েছেন।" *("তারিখে আকওয়ামে আলম"ঃ পৃঃ ৬৩৯, প্রকাশকঃ মজলিসে তারিক্কিয়ে আদাব, ২ নং নবসিংহ দাস গার্ডেন, ক্লাব রোড, লাহোর)*

৫। "উলামায়ে ইসলাম-এর ফতওয়া", ছাপাখানা দুখানি, লাহোরঃ

ফতওয়াটির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় "أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"

(-"আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে উলিল-আমরদের") আয়াতটি লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে ইংরেজদেরকে "উলিল আমর" (বিধি সম্মত শাসক) বলে সাব্যস্ত করে তাদের ইতায়াত ও আনুগত্য ফরয (অবশ্য কর্তব্য) বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ফতওয়াটির উপর নিম্নলিখিত বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের নাম-স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ রয়েছেঃ

- ✳ জনাব মুফ্‌তী মৌলবী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ টোঙ্কী, মীরে-মজলিস মুস্তাশারুল উলামা, লাহোর।
- ✳ জনাব মৌলবী গোলাম মুহাম্মদ বগুভী, ইমাম মসজিদ শাহী এবং আঞ্জুমানে মুস্তাশারুল উলামা, লাহোরের প্রধান রোকন।

* জনাব মৌলবী সৈয়দ নযীর হুসেন মুহাদ্দিস দেহলভী।
* জনাব আবুল-সাফা মৌলবী কাজী মীর আহ্মদ শাহ্ রিজওয়ানী পেশোয়ারী।
* জনাব মৌলনা মুহাম্মদ লুধিয়ানভী।
* জনাব মৌঃ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আনসারী, নাযিম, দীনিয়াত বিভাগ, মাদ্রাসাতুল উলুম, আলীগড়।
* জনাব মৌঃ আব্দুল হাই আমীনাবাদী, লক্ষ্ণৌভী, মুন্তাযিম দারুল উলুম, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ।
* জনাব মুফ্তী মোহাম্মদ আব্দুর রহীম পেশোয়ারী,
* জনাব মৌঃ গোলাম মুহাম্মদ হুশিয়ারপুরী, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ-এর প্রধান রোকন।
* জনাব মোল্লা হাফেয ইজ্জতুল্লাহ, সাকিন যখী, জেলা-পেশোয়ার।
* জনাব আবুল হামেদ মৌঃ আব্দুল হামীদ লক্ষ্ণৌভী।
* জনাব কাজী যাফরুদ্দীন, সাকিন গুজরাঁওয়ালা।
* জনাব আবু সাঈদ মৌঃ মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী।
* জনাব মোল্লা হাফেয হামেদ শাহ্, খতীব, জামে মসজিদ মহাবত খাঁ, পেশোয়ার।
* জনাব মৌঃ আবু মুহাম্মদ গোলাম রসূল, অমৃতসরী।
* জনাব আব্দুর রহমান বিন মৌঃ গোলাম আলী মরহুম, কসূরী।
* জনাব মৌঃ আব্দুল আযীয লুধিয়ানভী।।
* জনাব মৌঃ গোলাম আহমদ, প্রধান মুদার্‌রিস (শিক্ষক), মাদ্রাসা নোমানীয়া, লাহোর।
* জনাব মৌঃ মুহাম্মদ হুসেন ফয়েযী, মুদার্‌রিস, মাদ্রাসা নোমানীয়া, লাহোর
* জনাব মৌঃ সৈয়্যদ আহ্মদ, ইমাম জামে মসজিদ, দিল্লী।
* জনাব কাযী রফীউল্লাহ, সাকিন বুড্‌নী, জিলা-পেশোয়ার।
* জনাব মৌঃ আব্দুল জব্বার গজনভী অমৃতসরী।
* জনাব সৈয়্যদ মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার আল্ দেহলভী, (হযরত জনাব মৌলানা শামসুল উলামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নযীর হুসেন সাহেব, মুদ্দা যিল্লুহুল আলী, আল্-মুহাদ্দিস দেহলভীর পুত্র)

* জনাব মৌঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম দেহলভী ইব্নে মৌঃ মুহাম্মদ হুসেন ফকীর

* জনাব মৌঃ সৈয়্যদ মোহাম্মদ আবুল হাসান আল্ দেহলভী, জনাব মৌঃ শামসুল উলামা সৈয়্যদ মোহাম্মদ নযীর হুসেন মুদ্দা যিল্লুহুল আলী আল্-মুহাদ্দেস দেহলভীর কনিষ্ঠ পুত্র।

* জনাব মৌঃ মাদ্দাহ্ বশীর ও নযীর ইব্নে মৌঃ মুহম্মদ হুসেন ফকীর।

* জনাব মৌঃ খলীল আহ্মদ, প্রধান মুদার্‌রিস, মাদ্রাসা শাহারানপুর।

* জনাব মৌঃ রশীদ আহ্মদ গঙ্গোহী।

* জনাব মাহ্মুদ আল-হাসান, প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসা দেওবন্দ।

আঞ্জুমানে-ইসলামীয়া, পাঞ্জাব-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে উপরে বর্ণিত উলামায়ে-কেরাম কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত ফতওয়াটিতে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে ঃ

(১) "ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা নাজায়েয, হারাম এবং কঠিনতম পাপগুলোর অন্যতম। সে ব্যক্তি মুসলিম হোক বা অমুসলিম, খ্রীষ্টান হোক কিম্বা ইহুদী, হিন্দু হোক কিম্বা পারসী ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(২) ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং তার প্রজাদের মধ্যে পারস্পরিক হেফাযত ও নিরাপত্তা বাবদ মৌলিক বা প্রাসঙ্গিকভাবে চূড়ান্ত চূক্তিনামা অনুষ্ঠিত হয়ে আছে।

(৩) ইহা সুনিশ্চিত বিষয় যে, ইংরেজ সরকারের নিজের জাতির অথবা তার প্রজাদের মধ্য থেকে কাউকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে, সে

"مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"

(অর্থাৎ 'চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে যে হত্যা করে সে জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না') - উক্ত হাদীস অনুযায়ী জান্নাতের সৌরভ থেকে বঞ্চিত থাকবে।"

৬। আহ্লে হাদীস নেতা মৌঃ মুহাম্মদ হুসেন বাটালভীর ফতওয়া অনুযায়ীঃ

(ক) "ভারতবর্ষের মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজ সরকরের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ হারাম।" *(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা ১০, পৃঃ ২৮৭)*

(খ) "১৮৫৭ সালের দাঙ্গায় যেসব মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল তারা শক্ত পাপী এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তারা হাঙ্গামাকারী, বিদ্রোহী এবং অসৎ চরিত্র।"
(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ, ৯ম খণ্ড, সংখ্যা ১০,)

(গ) "এই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের (তারা তাদের ভাই মুসলমানই হোক না কেন) কোনও প্রকারের সাহায্য করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং হারাম বটে। *(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ পত্রিকার ৯ম খণ্ড, সংখ্যা ১০, পৃঃ ৩৮-৪৮)*

৭। জনাব মৌলবী আহমদ রেযা খান বেরেলভীর ফতওয়া ঃ

"এই অধম 'এলামুল্এলামে বেআন্না হিন্দোস্তান দারুস সালাম' পুস্তিকায় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রমাণ করেছে যে, হিন্দুস্তান হলো দারুস্-সালাম (অর্থাৎ যেখানে জিহাদ করা হারাম) এবং ইহাকে 'দারুল হার্‌ব' (যুদ্ধ ক্ষেত্র) বলা কখনও সঠিক নয়।" *(নুসরতুল আবরারঃ পৃঃ ২৯, ছাপাখানা সাহাফী, লাহোর, এচিশেনগঞ্জে মুদ্রিত, ১৭ই রবিউল আওয়াল, ১৩০৬হিঃ/ ১৮৮৮ ইং)*

৮। জনাব স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেবের বিবৃতি ঃ

"মুসলমানগণ আমাদের গভর্ণমেন্টের নিকট শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। কাজেই তারা কোন অবস্থাতেই গভর্ণমেন্টের শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে না। বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে একজন অনেক বড় নাম করা মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল (শহীদ) হিন্দুস্তানে জিহাদের বক্তৃতা করেছিলেন এবং মানুষকে জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সে সময় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা যেহেতু ইংরেজ সরকারের নিরাপত্তায় বাস করে, সেহেতু হিন্দুস্তানে তারা জিহাদ করতে পারে না।" *('আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১০৪, প্রকাশক ঃ উর্দূ একাডেমী, সিন্ধু; মিশন রোড, করাচী)*

৯। মক্কা মুয়াযযামার মুফতী মহোদয়গণের ফতওয়া ঃ

(১) জামাল উদ্দীন বিন আব্দুল্লাহ্ শায়খ উমর হানাফী, মুফ্‌তী মক্কা মুকর্‌রমা,

(২) হুসেন বিন ইব্‌রাহীম মালেকী, মুফ্‌তী মক্কা মুয়ায্‌যামা,

(৩) আহ্‌মদ বিন যেহ্‌নী শাফেয়ী, মুফ্‌তী মক্কা মুয়ায্‌যামা। উক্ত তিন মুফ্‌তী সাহেবান হিন্দুস্তানকে দারুস্ সালাম বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন," *("সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী"ঃ পৃঃ ৩১, শোরশ কাশ্মীরী প্রণীত)*

১০। মৌলবী যাফর আলী খান, যমীনদার পত্রিকা, লাহোর-এর সম্পাদক, লিখেছেন ঃ-

"ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যদি কোন দুর্ভাগা মুসলমান ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাহস দেখায়, তাহলে আমরা বজ্রনিনাদে বলছি যে, সে মুসলমান নয়।" *(দৈনিক যমীনদার ঃ লাহোর, ১১ই নভেম্বর, ১৯১১ ইং খান কাবুলী রচিত"যাফর আলী খান কি গ্রেফ্‌তারী" পুস্তকের সৌজন্যে)*

৩

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে জিহাদ অস্বীকারের অপবাদ সন্দেহাতীতভাবে তাঁর শিক্ষা, নীতি, তাঁর সংগ্রামী ও মুজাহেদানা জীবন এবং তাঁর লিখা ও বক্তব্যসমূহের বিরোধী। তাঁর সমগ্র জীবন ইসলামের উপর ঘোর সমালোচনামূলক আক্রমণসমূহের প্রতিরোধ, ইসলামের তবলীগ ও প্রচার এবং জিহাদে কবীর অর্থাৎ জিহাদ বিল-কুরআনের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর সময়কালে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের ভয়াবহ চতুর্মুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষায় ও সমর্থনে এক মহান জিহাদের কর্তব্য পালন করেন। ক্রুশভঙ্গকারীর মর্যাদায় তিনি খ্রীষ্টানদের বিভ্রান্তিকর ব্যাপক প্রচারাভিযান এবং ত্রিত্ববাদের বাতিল ইমারতকে অকাট্য দলিল ও যুক্তি-প্রমাণসমূহের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে দেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে যদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে যে, তিনি ইসলামের সমর্থনে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে যে আযিমুশ্বান জিহাদ করেছিলেন তার পেছনে যে কত শক্তিশালী চেতনা ও প্রবল প্রেমপুর্ণ আবেগ সক্রিয় ছিল, তিনি লিখেছেনঃ

"ক্রুশভঙ্গের (কাস্‌রে সলীব) জন্যেই আল্লাহ আমার নাম দিয়েছেন 'মসীহে-কায়েম', যাতে হযরত মসীহ (আঃ)-কে যে ক্রুশ ক্ষত-বিক্ষত ও বিচুর্ণ করেছিল সে ক্রুশকে যেন অন্য সময়ে মসীহ্ এসে ভঙ্গ করেন; কিন্তু ঐশী-নিদর্শনাবলীর দ্বারা, মানবীয় হস্ত দ্বারা নয়। কেননা খোদার নবী পরাভূত অবস্থায় থেকে যেতে পারেন না। অতএব, খ্রীষ্টিয় বর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার খোদাতা'লা ইচ্ছা করেছেন যেন ক্রুশকে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র হাত দিয়ে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করেন।"

(পরিশিষ্টঃ হাকীকাতুল ওহীঃ পৃঃ ৮৪)

"একজন মুত্তাকী মাত্রই এ বিষয়টি বুঝতে পারেন যে, এই হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর মাথায় যখন ইসলামের উপর হাজারো হামলা হলো, তখন এরূপ একজন মুজাদ্দিদ (ঐশী সংস্কারক)-এর প্রয়োজন ছিল যিনি ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা সুপ্রমাণ করেন। হাঁ, এই মুজাদ্দিদের নাম এজন্যে 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম' রাখা হয় যে, তিনি ক্রুশভঙ্গের ('কাস্‌রে-সলীব') জন্যে এসেছেন। খোদাতা'লা চান যে, মসীহ্ (আঃ)-কে যেমন কি-না পূর্বকালে ইহুদীদের ক্রুশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, এখন খ্রীষ্টানদের ক্রুশ থেকেও যেন তাঁকে উদ্ধার করেন। যেহেতু খ্রীষ্টানেরা মানবকে খোদা বানাবার জন্যে অনেক কিছুই মিথ্যে রচনা করেছে, সেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার গায়রত (আত্মাভিমান) চেয়েছে যে, মসীহের নামেই এক ব্যক্তিকে প্রত্যাদিষ্ট (মা'মুর) ক'রে খ্রীষ্টানদের রচিত সে মিথ্যাকে নস্যাৎ ক'রে দেন। ইহা খোদার কাজ, এবং তা এই লোকদের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর।"*(আঞ্জামে আথমঃ পৃঃ ৩২০, ৩২১)*

"এই যুগে বিদ্বেষপরায়ণ পাদ্রীদের সম্প্রদায় যে নিতান্ত সত্যগোপনের ধারায় বলে বেড়াতো যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কোন মো'জেযা

(বা অলৌকিক-ক্রিয়া) প্রকাশিত হয় নি তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা চরমভাবে লজ্জিত করার মত জবাব দিয়েছেন এবং খোলাখুলিভাবে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী তিনি তাঁর এই দাসের (সত্যতার) সমর্থনে প্রদর্শন করেছেন।

এক সময় ছিল যখন ইঞ্জিলের প্রচারকগণ হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে ঘুরে ফিরে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় প্রতারণামূলকভাবে আমাদের প্রভু ও মৌলা, খাতামুল আম্বীয়া, নবী-শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও নিষ্ঠাবানদিগের শিরোমণি ও খোদার প্রিয়তম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি এই মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোন ভবিষ্যদ্বাণী অথবা মো'জেযা (অলৌকিক ক্রিয়া) প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয়নি। আজ এই অবস্থা যে, আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সহস্র সহস্র ঐ সব মো'জেযা ব্যতীত, যা অতি প্রামাণ্য ও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ও সংরক্ষিত রয়েছে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এই দাস ও অধমের মাধ্যমে অভিনব ও নিত্য-নতুন শত শত এরূপ ঐশী নিদর্শনও প্রকাশ করেছেন এবং করে চলেছেন, যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কোনও বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারীর মধ্যে নেই। আমি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত প্রত্যেক খ্রীষ্টান ও অপরাপর বিরুদ্ধবাদীদেরকে বলে আসছি, এখন আবারও বলছি, ইহা বাস্তবিকই সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌ হতে আগত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধর্মের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, সে-ধর্মে সর্বদা এরূপ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হতে থাকবে, যাঁরা তাঁদের পথদিশারী নেতা ও রসূলের নায়েব (আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী) হয়ে প্রমাণ করবেন যে, সে-নবী ও রসূল আপন আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজীর (প্রবহমান থাকার) দিক দিয়ে মৃত নন বরং জীবিত। কেননা সেই নবী, যাঁর অনুগমন করা হচ্ছে এবং যাঁকে যোজক ও ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর জন্যে অত্যাবশ্যকীয়, তিনি যেন তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবহমানতার দিক দিয়ে চিরঞ্জীব ও অমর প্রতিপন্ন হন এবং সম্মান, উচ্চমর্যাদা ও মহিমার আকাশে আপন দেদীপ্যমান চেহারা নিয়ে এরূপ জাজ্জ্বল্যমানরূপে তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়া এবং চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, সর্বরক্ষণকারী ও সর্বশক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁর উপবিষ্ট হওয়া এমনই একটি ব্যাপার, যা বাস্তব ও শক্তিশালী ঐশী-জ্যোতিসমূহের দ্বারা এইভাবে প্রমাণিত হওয়া উচিত যে, তাঁর পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ অনুগমন যেন অনুগামীর মধ্যে প্রভাব বিস্তারে এরূপ সুফল উদয়ের কারণ হয় যে, সে রূহুল-কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর সাক্ষাৎলাভ ও ঐশী কল্যাণরাজী প্রাপ্তির পুরস্কারে ভূষিত হয়, আপন প্রিয় নবী থেকে নূর লাভ করে আপন যুগের অন্ধকারসমূহকে অপসারিত করে এবং চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে খোদার অস্তিত্বে এরূপ সুদৃঢ়, পরিপূর্ণ ও প্রদীপ্ত বিশ্বাসের উদয় ঘটায়, যার ফলে পাপের প্রতি তাদের

আসক্তি এবং কলুষিত পার্থিব জীবনপ্রসূত সকল কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তাহলেই প্রমাণিত হবে, সে-নবী (আধ্যাত্মিকভাবে) জীবিত আছেন- আকাশে আছেন। অতএব, আমি আমার পবিত্র ও প্রতাপান্বিত খোদার কেমন করে শোক্‌র আদায় করি যে, তিনি আমাকে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার ও তাঁর অনুবর্তিতার তৌফীক দান ক'রে এবং সে-প্রেম ও অনুবর্তিতারই ফয়েয ও কল্যাণস্বরূপ আমাকে সত্যিকার তাক্‌ওয়া এবং সত্য নিদর্শনাবলীর পরিপূর্ণ অংশ প্রদান ক'রে সকলের নিকট এ সত্যকে প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, আমাদের সেই প্রিয় ও আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মৃত নন, বরং তিনিই উচ্চতম আকাশে তাঁর সর্বাধিপতি ও সর্বশক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে মর্যাদা ও মহত্ত্বের উচ্চতম আসনে উপবিষ্ট আছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔" (ترياق القلوب ص ۸-۱۰)

(তারইয়াকুলকুলূবঃ পৃঃ ৮-১০)

"প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের মৌলিক ও মোক্ষম উদ্দেশ্য আহাদীস-নব্‌বী (সাঃ)-তে বর্ণিত হয়েছে এই যে, তিনি খ্রীষ্টান জাতির 'দাজাল' – মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণাকে দূর করবেন এবং তাদের ক্রুশীয় ধ্যান-ধারণা বা ক্রুশীয় মতবাদকে খন্ডন করে দেখিয়ে দিবেন। সুতরাং এ বিষয়টি আমার হাত দিয়ে খোদাতা'লা এরূপভাবে সুসম্পন্ন করেছেন, যার ফলে খ্রীষ্টধর্মের মূলোৎপাটন হয়েছে (মূলনীতির অবসান ঘটেছে)। আমি খোদাতা'লার নিকট হতে পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সপ্রমাণ করে দিয়েছি যে, সেই 'অভিশপ্ত মৃত্যু' যা নাউযুবিল্লাহ্‌ হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর দিকে আরোপ করা হয়- যেই অভিশপ্ত মৃত্যুর উপরেই সর্বতোভাবে ক্রুশীয় নাজাত বা পরিত্রাণ নির্ভরশীল, তা কোনক্রমেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে আরোপিত হতে পারে না। কোনক্রমেই লা'নত বা অভিশাপের মর্ম কোনও সত্যবান মহাপুরুষের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং পাদ্রীদের সম্প্রদায় উক্ত অভিনব পদ্ধতির প্রশ্নটির দ্বারা যা কি-না বস্তুতপক্ষে তাদের ধর্মকেই নস্যাৎ করে, এমনই নিরুত্তর হয়ে পড়ে যে, এ গবেষণা ও সত্যাবিস্কার সম্বন্ধে যারা যারাই অবহিত হয়েছেন তাঁরা বুঝে গিয়েছেন যে, এই উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা ক্রুশীয় ধর্মকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। কোন কোন পাদ্রী সাহেবের পত্রাবলী থেকে আমি জেনেছি যে, তাঁরা এই চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্তকর গবেষণায় একান্তভাবে ভীত হয়ে পড়েছেন এবং বুঝে গিয়েছেন যে, এর দ্বারা ক্রুশীয় ধর্মের ভীত ধূলিস্যাৎ হবে এবং এর পতন অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।"

(কিতাবুল বারীয়্যাঃ পাদটীকা, পৃঃ ২৬২)

"আমি সর্বক্ষণ চিন্তামগ্ন, আমাদের এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেন কোনও রূপে মীমাংসা হয়ে যায়। মৃতের উপাসনারূপ ফেৎনার কারণে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে এবং আমার প্রাণ এক অদ্ভুত রকম সংকোচন ও পীড়া বোধ করছে। একজন অক্ষম অসহায় মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে এবং ধূলির একটি মুষ্টিকে 'রাব্বুল আলামীন' বলে মনে করা হচ্ছে। এর চেয়ে অধিক মর্মপীড়া আর কি-ইবা হতে পারে!! আমি বহু পূর্বেই এই মর্মবেদনার দরুন বিলীন হয়ে যেতাম, যদি না আমার মাওলা এবং আমার সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে সান্ত্বনা দিতেন যে, 'পরিণামে তৌহীদেরই বিজয় হবে। অলীক উপাস্যরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সব বানোয়াট ও মিথ্যা খোদাকে তাদের খোদায়ীর অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। মরিয়মের উপাস্যরূপ জীবনের উপর মৃত্যু আনয়ন করা হবে এবং তার পুত্রেরও এখন জীবনাবসান অবশ্যম্ভাবী'। সর্বশক্তিমান খোদা বলেন, 'আমি ইচ্ছা করলে মরিয়ম এবং তার পুত্র ঈসা এবং সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের নিপাত করে দিতাম।' অতএব, এখন তিনি চেয়েছেন যে, উভয়ের উক্ত উপাস্যসুলভ জীবনকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাবেন। অতএব, এখন উভয়েই মরবে। কেউ তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। সেই সঙ্গে ঐ সমস্ত মন্দ স্বভাব-প্রবৃত্তিগুলিরও মৃত্যু ঘটবে, যেগুলি মিথ্যে খোদাকে গ্রহণ করেছিল। এক নতুন আকাশ, এক নতুন জগৎ দেখা দিবে। সেদিন নিকটে, যখন সত্যের সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হবে এবং ইউরোপ সত্য খোদার সন্ধান পাবে। তারপর অনুতাপের (তৌবার) দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, যারা প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তারা আগ্রহ ভরে প্রবেশ করে যাবে। কেবল তারাই অবশিষ্ট থেকে যাবে যাদের হৃদয়ের দ্বার প্রকৃতির দ্বারা রুদ্ধ হয়ে আছে, যারা আলো ভালোবাসে না, বরং অন্ধকারকে ভালোবাসে। সেই দিন নিকটবর্তী, যখন ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্ম লোপ পাবে এবং সকল অস্ত্র ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র না ভাংবে, না তীক্ষ্ণতা হারাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা দাজ্জালী শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। সে সময় সন্নিকট, যখন খোদাতা'লার সেই খাঁটি তৌহীদ, যা মরুপ্রান্তরের অধিবাসীগণ এবং সকল প্রকার জ্ঞানালোক হতে যারা বঞ্চিত তারাও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করে থাকে, তা বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়বে। সে দিন না কোন কল্পিত প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব থাকবে, না কোন কল্পিত খোদার।................. খোদাতা'লার একটি মাত্র আঘাত কুফরীর যাবতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবে, কিন্তু না কোন তলোয়ারের সাহায্যে, না কোন বন্দুকের দ্বারা, বরং সচেতন আত্মাদেরকে আলোক দান করে এবং পবিত্র হৃদয়সমূহে স্বর্গীয় দীপ্তি অবতীর্ণ ক'রে। কেবল সে সময়েই তোমরা বুঝবে যা আমি বলছি।"

(তবলীগে রিসালতঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮)

"হে মুসলমানগণ! শ্রবণ করো এবং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। ইসলামের পবিত্র প্রভাব রোধ করার জন্যে খ্রীষ্টান জাতি যেরূপ কুটিল কুৎসা রটনা ও প্রবঞ্চনামূলক উপায় অবলম্বন করেছে এবং কঠোরতম পরিশ্রম সহকারে ও পানির মত টাকা পয়সা ব্যয়ে তা প্রচার ও বিস্তারের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এমন কি, অতি লজ্জাজনক উপায়সমূহও এ উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়েছে, যার উল্লেখ হতে এই রচনাকে পবিত্র

রাখাই শ্রেয়ঃ। খ্রীষ্টান জাতি ও ত্রিত্ববাদের সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে এগুলি এরূপ যাদুকরী কার্যকলাপ যে, যে-পর্যন্ত খোদাতা'লা তাদের এই যাদুর বিরুদ্ধে সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশালী হস্ত প্রদর্শন না করবেন এবং অলৌকিক শক্তির দ্বারা এই যাদুর ধাঁ ধাঁ ছিন্নভিন্ন করে না দেবেন, সে-পর্যন্ত এই ফিরিঙ্গী জাতির প্রতারণা থেকে সরলচিত্ত জনগণের মুক্তি লাভ সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ও ধারণাবহির্ভূত।

অতএব, খোদাতা'লা এই যাদু বা প্রতারণা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে এই যুগের খাঁটি মুসলমানকে এক মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদান করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর এই দাসকে স্বীয় ইলহাম, কালাম এবং বিশিষ্ট আশিস ও কল্যাণসমূহ দ্বারা সম্মানিত ক'রে এবং স্বীয় পথের (ইসলাম-ধর্মের) সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান দান ক'রে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় প্রেরণ করেছেন এবং বহু স্বর্গীয় উপহার এবং মহান অলৌকিক ব্যাপার এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্বসমূহ তাকে দান করেছেন, যেন এই স্বর্গীয় প্রস্তরের সাহায্যে ফিরিঙ্গীদের যাদুর দ্বারা প্রস্তুত সেই মোমের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা যায়।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! এই অধমের আগমন সেই যাদুর অন্ধকারকে দূর করার জন্যে খোদাতা'লার তরফ হতে এক মোজেযা। যাদুর মোকাবেলায় দুনিয়ায় অলৌকিক নিদর্শনও কি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল না? তোমাদের দৃষ্টিতে কি ইহা বিস্ময়কর ও অসম্ভব বোধ হয় যে, এরূপ অতি জঘন্যতম স্তরের প্রবঞ্চনাসমূহের বিরুদ্ধে যা যাদুর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, খোদাতা'লা সত্যের এইরূপ এক জ্যোতিঃ প্রদর্শন করেন, যা অলৌকিক শক্তির প্রভাব রাখে?!" *(ফতেহ্ ইসলাম ঃ পৃঃ ৪, ৫)*

"যেহেতু আমি ত্রিত্ববাদের ভ্রান্তি ও খারাপিসমূহ সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি সেহেতু জগতের চল্লিশ কোটিরও বেশী (বর্তমানে প্রায় ১১৫ কোটি-প্রকাশক) লোকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদাস্বরূপ মনে করে বসে থাকার এই বেদনাদায়ক দৃশ্য আমার অন্তরে এতই আঘাত দিয়েছে যে, সারা জীবনে তার চেয়ে কঠিন মর্মপীড়া কখনও ঘটেনি। বরং দুঃখ-বেদনায় যদি মৃত্যু বরণ আমার পক্ষে সম্ভব হতো, তাহলে এই দুঃশ্চিন্তা আমাকে বিনাশ করে দিত যে, কেন এই সকল লোক 'এক-অদ্বিতীয়' খোদাকে ছেড়ে অধম-অক্ষম এক ব্যক্তির উপাসনা করছে এবং কেন এরা সেই মহিমান্বিত নবীর (সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামের) উপর ঈমান আনয়ন করে না, যিনি সঠিক হেদায়াত ও সত্য পথের নির্দেশ সহকারে জগতে আগমন করেছেন। সর্বক্ষণই আমার এই আশঙ্কা রয়েছে যে, এই দুঃখ ও বেদনার আঘাতে জীবনাবসান না ঘটে যায়!...............এবং এই মর্মবেদনায় আমার অবস্থা এই, যদিও অপরাপর মানুষ বেহেশ্ত কামনা করে থাকে, কিন্তু আমার বেহেশ্ত এই যে, আমি যেন আমার জীবদ্দশাতে মানুষকে এই শেরক (অংশীবাদিতা) হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে এবং খোদাতা'লার মহিমা ও প্রতাপকে প্রকাশমান হতে দেখে যাই। আমার আত্মা সর্বক্ষণ দোয়া করে, 'হে খোদা ! আমি যদি তোমারই পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকি এবং

তোমার ফযল ও কৃপার ছায়া যদি আমার উপরে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে সেইদিন দেখাও যখন হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর উপর হতে এই মিথ্যে অপবাদ অপসারিত হয় যে, তিনি না-কি খোদা হবার দাবী করেছিলেন। এক দীর্ঘকাল থেকে আমার পাঁচ ওয়াক্তের দোয়া এই যে, খোদাতা'লা এই সব লোকদের চক্ষু দিন, এবং তারা তাঁর তৌহীদ তথা একত্বে বিশ্বাসী হোক; তাঁর রসূলকে সনাক্ত করুক এবং ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত আকীদা থেকে তৌবা করুক।"

(তবলীগে রিসালতঃ ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭১,৭২)

"اُنْظُرْ اِلَى الْمُتَنَصِّرِيْنَ وَذَأْنِهِمْ   وَانْظُرْ اِلٰى مَا بَدَءَ مِنْ اَدْرَانِهِمْ

১। "খৃষ্টানদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, লক্ষ্য কর তাদের দোষ ও বদ স্বভাবগুলোকে। আরও লক্ষ্য কর তাদের কলুষতা যা তাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে ।।

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ تَشَذُّرًا   وَيُنَجِّسُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ اَوْثَانِهِمْ

২। তারা তাদের সীমালঙ্ঘনের দরুন প্রত্যেক উচ্চতা দিয়ে ধেয়ে চলেছে। এবং নিজেদের প্রতিমাগুলোর দ্বারা সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে নাপাক করছে ।।

نَشْكُوْ اِلَى الرَّحْمٰنِ شَرَّ زَمَانِهِمْ   وَنَعُوْذُ بِالْقُدُّوْسِ مِنْ شَيْطَانِهِمْ

৩। আমরা তাদের যুগের অনিষ্ট থেকে খোদাতা'লার সমীপে অভিযোগ জানাচ্ছি। আর তাদের শয়তানী থেকে পাক পরওয়ারদিগারের আশ্রয় চাচ্ছি ।।

يَا رَبِّ خُذْهُمْ مِثْلَ اَخْذِكَ مُفْسِدًا   قَدْ اَفْسَدَ الْاٰفَاقَ طُوْلُ زَمَانِهِمْ

৪। হে খোদা! তুমি তাদের ধৃত কর যেমন তুমি ফাসাদ ও হাঙ্গামাকারীদেকে ধৃত করে থাকো। তাদের যুগের দীর্ঘতা দুনিয়াকে বিকারগ্রস্থ করে ফেলেছে।।

يَا رَبِّ اَحْمَدَ يَا اِلٰهَ مُحَمَّدٍ   اِعْصِمْ عِبَادَكَ مِنْ سُمُوْمِ دُخَانِهِمْ

৫। হে আহ্মদের (সাঃ) প্রভু! হে মুহাম্মদের (সাঃ) উপাস্য! তোমার বান্দাদেরকে তাদের বিষাক্ত আবহাওয়া হতে রক্ষা কর।।

سَبُّوْا نَبِيَّكَ بِالْعِنَادِ وَكَذَّبُوْا   خَيْرَ الْوَرٰى فَانْظُرْ اِلٰى عُدْوَانِهِمْ

৬। তারা তোমার নবী (সাঃ)-কে শত্রুতার বশবর্তী হয়ে গালি দিয়েছে এবং মিথ্যেবাদী বলেছে। সেই নবী, যিনি সৃষ্টির সেরা; অতএব, তাদের অত্যাচারকে দেখ ।।

يَارَبِّ سَحِّقْهُمْ كَسَحْقِكَ طَاغِيًا وَانْزِلْ بِسَاحَتِهِمْ لِهَدْمِ مَكَانِهِمْ

৭। হে আমার প্রভু! তাদেরকে এমনভাবে পিষে দাও যেমন সীমা অতিক্রমকারীকে পিষে থাক এবং তাদের সৌধগুলীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্যে তাদের আঙিনায় নেমে আস।।

"يَارَبِّ مَزِّقْهُمْ وَفَرِّقْ شَمْلَهُمْ يَارَبِّ قَوِّدْهُمْ اِلٰى ذَوْبَانِهِمْ"

৮। হে আমার প্রভু! তাদেরকে টুকরো টুকরো কর এবং তাদের দলবদ্ধতাকে খান্ খান্ করে দাও। হে আমার প্রভু! তাদেরকে দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ার দিকে টান।।"

(নূরুল হকঃ ১ম খন্ড)

৪

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রভু ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্য ধর্মের সমর্থনে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে যে আযিমুশ্বান কলমের জিহাদ করেছেন তার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

তিনি এরূপ একজন বিজয়ী জেনারেল ছিলেন, যার অদৃষ্টে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই বিজয় ও প্রাধান্যলাভ লিখিত হয়েছিল এবং শত্রু-মিত্র সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মারহাবা শত-সহস্র মারহাবা বলে আওয়াজ তুলেছিলেন।

তাঁর এই অভূতপূর্ব মহান জিহাদের প্রতি মাত্র কয়েকটি স্বীকারোক্তি আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো ঃ

হযরত খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব চাঁচড়া শরীফ (মুলতান) বলেনঃ

"হযরত মির্যা সাহেব সারাক্ষণ খোদায়ে-আয্যা ও জাল্লার ইবাদতের মধেই অতিবাহিত করেন; হয়ত নামায পড়েন, নয়ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন; অথবা এরূপ অন্যান্য দীনি (ধর্মীয়) কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। আর দীন ইসলামের সেবা কার্যে তিনি এইরূপ দৃঢ়সংকল্প এবং বদ্ধপরিকর যে, লন্ডনের যুগ-সম্রাজ্ঞীকেও দীনে মুহাম্মদী (ইসলাম) কবুল করার জন্যে দাওয়াত দিয়েছেন এবং রুশ, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের রাজা-বাদশাহগণকেও ইসলামের পয়গাম প্রেরণ করেছেন। তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এ বিষয়টিতে নিবদ্ধ যে, ত্রিত্ববাদ ও ক্রুশীয় (প্রায়শ্চিত্তবাদের) বিশ্বাসকে, যা সর্বৈব কুফরী, তা যেন তারা পরিত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্তা'লার তৌহীদ (একত্ববাদ)-কে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে এ যুগের আলেমদের অবস্থা দেখুন যে, অপরাপর সকল মিথ্যা ধর্মকে উপেক্ষা ক'রে ঐরূপ পুণ্যবান ও সত্য মহাপুরুষের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন, যিনি আহ্লে-সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত এবং সিরাতে-মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত এবং হেদায়াতের সৎ পথ প্রদর্শন করেন। এঁরা এহেন

ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া প্রদান করেন। তাঁর আরবী রচনাবলী দেখুন, যা মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্ব পর্যায়ের এবং তাঁর যাবতীয় কালাম (লেখা) সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানরাজী ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণাদি এবং হেদায়াতে ভরপুর। তিনি আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাত এবং দীনের (ইসলামের) যাবতীয় অপরিহার্য বিষয়াদিকে কখনও অস্বীকার করেন না।" *(ফার্সী ভাষায় প্রণীত 'ইশায়াতে ফরীদী' গ্রন্থের তরজমা, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৯ ও ৭০)*

'উকিল' পত্রিকা, অমৃতসর

মুসলিম পত্রিকাগুলোর মধ্যে সবচে' জোরালো প্রভাবশালী এবং সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী পর্যালোচনা ও বক্তব্য তুলে ধরেছিল অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'উকিল' পত্রিকা। যে বক্তব্যটি নিঃসৃত হয়েছিল মৌলানা আবুল কালাম আযাদের কলম হতে। তিনি লিখেছিলেনঃ

"তিনি এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লিখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিস্ক মুর্তিমান বিস্ময় ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয়স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কিয়ামত সদৃশ। তাঁর অঙ্গুলী সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হতো। তাঁর দু'টি মুষ্টি বিজলীর ব্যাটারীর মত ছিল। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ধর্ম-জগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয় বিষাণ হয়ে নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করতেন। তিনিও সবকিছু রেখেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন।.........................

কাদিয়ান নিবাসী মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের ইন্তেকালের অসহনীয় ঘটনা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য। বস্তুতঃ যুগের ব্যবধানেও ইহা অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকার যোগ্য। এরূপ মহাপুরুষগণ, যাদের দ্বারা ধর্ম ও জ্ঞান-বুদ্ধির জগতে বিপ্লব ঘটে থাকে, সর্বদা জগতে আসেন না। ইতিহাসের এই সকল গৌরবান্বিত মহাপুরুষের জগতের দৃশ্যপটে আবির্ভাব খুবই বিরল হয়ে থাকে, এবং যখন তাঁরা আসেন তখন জগতে বিপ্লব সাধন করে যান। মির্যা সাহেবের অতি উচ্চ মর্যাদা, তাঁর কতক দাবী ও আকীদার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর কিছু লোকের প্রকট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিরবিদায় মুসলমানদেরকে, হ্যাঁ, শিক্ষিত মুসলমানদেরকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছে যে, তাদের একজন মহান ব্যক্তিকে তারা হারিয়েছে, এবং তাঁর সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় ইসলামের সেই শক্তিশালী মহান প্রতিরোধেরও অবসান ঘটেছে, যা একমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তিনি একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন– তাঁর এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্ত অনুভূতি প্রকাশ ও স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যাতে করে সেই মহান আন্দোলন যা আমাদের দুশমনদেরকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করে রেখেছিল তা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে– এই আমাদের কামনা ও আকাঙ্খা।

খ্রীষ্টান ও আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা সর্বসাধারণ্যে সমাদর লাভ করেছে, এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি কোন পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন। আজ যখন তাঁর এই মহান রচনাবলী স্বীয় কার্যকারিতা পূর্ণ করেছে তখন এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের স্বীকার করতে হয়। কেননা ঐ সময়টা হৃদয় থেকে কখনও বিস্মৃত হতে পারে না, যখন ইসলাম চতুর্দিক থেকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের মাঝে বেষ্টিত হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানেরা-যারা হেফাযতকারী খোদাতা'লার পক্ষ থেকে এই উপকরণ ও বস্তুনির্ভর জগতে হেফাযতের মাধ্যম হয়ে এর হেফাযতের জন্যে আদেশপ্রাপ্ত ছিল, তারা তাদের অপরাধসমূহের শাস্তিভারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিল এবং ইসলামের জন্যে তারা কোনকিছুই করছিল না বা করতে পারছিল না। তখন একদিকে বৈরী আক্রমণসমূহের ব্যাপকতার অবস্থা ছিল এই যে, সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎ ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান-তত্ত্বের প্রদীপকে তাদের লক্ষ্যপথের কাঁটা ও প্রতিবন্ধকতা মনে করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিল এবং অঢেল ধন-সম্পদ ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিরাট শক্তি এই আক্রমণকারীর পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে ধেয়ে আসছিল, আর অন্য দিকে প্রতিরোধের দৈন্য ও দুর্বল দশা ছিল এই যে, তোপের মোকাবিলায় (মুসলমানদের কাছে) তীরও ছিল না এবং পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়েরই আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না- এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দিক থেকে যে প্রতিরোধ শুরু হয় তার এক মৌলিক অংশের গৌরব মির্যা সাহেব লাভ করলেন। তাঁর এই প্রতিরোধ খ্রীষ্টানদের সেই প্রথম দিকের দুর্বার প্রভাব, যা সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় থাকার দরুন বস্তুতপক্ষে উহাই এর প্রাণ-শক্তি ছিল, কেবল সেটাকেই পর্যুদস্ত করে দিয়ে সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকেই খ্রীষ্টানী আক্রমণের ভয়াবহ আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়ার কারণ হয় নি, বরং স্বয়ং খ্রীষ্টান ধর্মের যাদু ধূঁয়া হয়ে বিলীন হতে আরম্ভ করলো।-----
মোট কথা, মির্যা সাহেবের এই খিদমত ভবিষ্যদ্বংশধরদেরকে বিরাট অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ রাখবে যে, তিনি কলমের দ্বারা জিহাদকারীদের প্রথম সারিতে শামিল হয়ে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার এরূপ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং এরূপ চিরস্মরণীয় সাহিত্য রেখে গিয়েছেন যা মুসলমানদের ধমণীতে যতদিন পর্যন্ত জীবন্ত রুধির প্রবাহিত হয় এবং ইসলামের সাহায্যের উদ্যম ও হিফাযতের উদ্যম তাদের জাতীয় ঐতিহ্যের শিরোনাম হিসেবে পরিলক্ষিত হয়, ততদিন তা কায়েম থাকবে।"

('উকিল' পত্রিকা ২০শে জুন, ১৯০৮ ইং, 'বদর' পত্রিকা ২৮শে জুন, ১৯০৮ইং পৃঃ২,৩ এর সূত্রে এবং 'মিল্লাত' পত্রিকা ৭ই জানুয়ারী, ১৯১১ ইং পৃঃ ১৩-১৫, 'আল্-হাকাম' পত্রিকা, জিল্দ ১৫, পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য)

"সাদেকুল্ আখবার" (রিওয়াড়ী)

সাদেকুল্ আখবার, পত্রিকাটি লিখেছিল ঃ

"মির্যা সাহেব তাঁর জোরালো বক্তৃতাসমূহ এবং অতি গৌরবময় রচনাবলীর দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদেরকে তাদের উদ্ভট আপত্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা উত্তর প্রদান করে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেন এবং যথার্থরূপে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। সত্য

কথা এই যে, মির্যা সাহেব ইসলামের সাহায্য ও সংরক্ষণের যথার্থ হক্ আদায় ক'রে দীনে-ইসলামের সর্বাত্মক সেবার আদর্শ রেখে গিয়েছেন। ন্যায়তই, এরূপ দৃঢ় সংকল্পশালী, ইসলামের পক্ষ সমর্থক ও মুসলমানদের সাহায্যকারী এবং ইসলামের অতুলনীয় বিদগ্ধ আলেমের অকস্মাৎ ও অকাল মৃত্যুতে আফসোস করা অবশ্য কর্তব্য।"

('বদর' ২০ আগষ্ট, ১৯০৮ পৃঃ ৬, কঃ ১,২-এর সূত্রে)

কার্জন গেজেট (দিল্লী)

দিল্লীর "কার্জন গেজেট" পত্রিকার সম্পাদক মির্যা হায়রত দেহ্‌লবী লিখেছিলেন ঃ

"আর্যসমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মরহুম (মির্যা সাহেব) যে ইসলামী খেদমত করেছেন তা বস্তুতই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। তিনি মোনাযেরার (ধর্মীয় তর্কশাস্ত্রের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছিলেন আর হিন্দুস্থানে এক নূতন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করেছেন। একজন মুসলমান হিসেবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করছি যে, কোন বড়র চেয়েও বড় আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তার মুখ খুলে।....যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তাঁর কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবেই নয় বরং সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁর পর্যায়ের শক্তিশালী লেখক নেই।......"

("সিলসিলা আহমদীয়া" পুস্তকঃ পৃঃ ১৮৯ দ্রষ্টব্য)

চৌধুরী আফযাল হক্, আহ্‌রারী চিন্তাবিদ

মজলিসে-আহ্‌রারের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ চৌধুরী আফযাল হক্ লিখেছেন ঃ

"আর্যসমাজ অস্তিত্বে আসার পূর্বে ইসলাম এক প্রাণহীন দেহ বিশেষ ছিল, যার মধ্যে তবলীগ বা প্রচারের স্পৃহা ও অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল।....... মুসলমানদের অন্যান্য ফির্কাগুলির মধ্যে কোনও জামাত বা দল তবলীগী উদ্দেশ্যাবলীকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সৃষ্টি হতে পারল না। হ্যাঁ, একটি হৃদয় মুসলমানদের উদাসীনতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। স্বল্পসংখ্যক লোকের একটি ক্ষুদ্র জামা'ত তিনি তাঁর চারদিকে একত্রিত করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। ....তিনি তাঁর জামাতের মধ্যে ইসলাম প্রচারের এরূপ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে গেলেন, যা কেবল মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা বা সম্প্রদায়ের জন্যেই নয়, বরং বিশ্বের সকল প্রচারের সাথে জড়িত জামা'তসমূহের জন্যে আদর্শ ও নমুনা স্বরূপ।"

(ফিৎনা-এ-ইরতিদাদ আওর পলিটিক্যাল কলাবাজিয়াঁ ঃ ২য় রোম সংস্করণ পৃঃ ২৪)

"সিয়াসত" পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ হাবীব লিখেছেন ঃ

"ঐ সময় যখন আর্যসমাজী এবং খ্রীষ্টান প্রচারকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ হেনে চলেছিল তখন দু'একজন যে আলেমেদীন কোথাও ছিলেন তারা শরীয়তে-হাক্কার (ইসলামের) সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু

কেউই বিশেষ একটা সফল হলেন না। এহেন সময় মির্যা সাহেব ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদের এবং আর্য সমাজী প্রচারক ও পণ্ডিতদের মোকাবেলায় ইসলামের পক্ষ থেকে সামনে নিজের বুক পেতে দিয়ে প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ হলেন। আমি মির্যা সাহেবের নবুওয়ত ইত্যাদির দাবীর অসারতা প্রদর্শ করে এসেছি। কিন্তু বিজ্ঞজনের কথা আছে যে, عیب ہائے جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

(অর্থাৎ- 'তার সম্পর্কে যেমন সবই দোষ বর্ণনা করলে, সেই সঙ্গে তাঁর গুণের কথাও বল।' – অনুবাদক)

তাই একথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই যে, মির্যা সাহেব এ কর্তব্যটি পরম সুষ্ঠু ও সফলরূপে সম্পাদন করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের পর্যুদস্ত করে ছেড়েছেন। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর কোন কোন রচনা অপূর্ব, অদ্বিতীয়।"

(তাহ্‌রীকে-কাদিয়ানঃ পৃঃ ২০৮, ২০৯)

আলোচ্য বিষয়ের এ পর্বটির পরিশেষে আমরা সবিনয়ে এই বক্তব্য না রেখে পারছি না যে, ইসলামের এই অনন্য মহাবীর মুজাহিদ সম্পর্কে গোটা জীবনই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ধর্মের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ জিহাদে নিবেদিত ও উৎসর্গিত ছিল, এবং খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ধর্মীয় যুদ্ধ ও অভিযানসমূহ খ্রীষ্ট জগতকে কম্পমান করে রেখেছিল, হ্যাঁ, এই সেই মহাবিজয়ী জেনারেল, যাঁর অনুসারীবৃন্দ আজও সে মহান জিহাদেই আত্মনিয়োজিত এবং দৈনন্দিন নিত্য নূতন রণাঙ্গণে খ্রীষ্টধর্মকে ক্রমাগত প্রকাশ্যে পরাজিত করে চলেছে। ইসলামের এই প্রেমিকগণই বিশ্বের প্রান্তে-প্রান্তে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রয়েছে, এবং কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, কি আফ্রিকার অন্ধকার মহাদেশ- সর্বত্র প্রতিটি সংগ্রাম-ক্ষেত্রেই গির্জা তাদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে ভীত-ত্রস্ত ও খ্রীষ্ট জগৎ কম্পমান অবস্থায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ যাদের কণ্ঠস্বরে ক্রুশ ভেঙ্গে পড়ে এবং যাদের পদশব্দ খ্রীষ্টধর্মের পশ্চাদাপসরণের বাণী বয়ে আনে। অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, ইসলামের সেই মহা বিক্রমশালী মুজাহিদ এবং মহাবিজয়ী জেনারেলের বিরুদ্ধেও কতিপয় যালেমের কণ্ঠস্বর এই বলে ঘৃণ্য দোষারোপ ও মিথ্যা অপবাদের বাণ বর্ষণ করে থাকে যে, তিনি নাকি নাউযুবিল্লাহ খ্রীষ্টান সরকারের ক্রীড়ণক ছিলেন।

আমরা এ প্রসঙ্গে কেবল এতটুকু বলেই এ ব্যাপারটি আমাদের আলীম ও খবীর এবং মহাআত্মাভিমানী খোদার সমীপে ছেড়ে দিচ্ছি যে,

হে বিজয়ী! তোমার উপরে শান্তি ও সালামতি বর্ষিত হোক! তোমার মাকাম ও মর্যাদা হিংসুকদের ঘৃণ্য দোষারোপ ও মিথ্যে অপবাদের বহু উর্ধ্বে। হে মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হিজরী চৌদ্দ শতকের চতুর্দশী! হিংসুকদের থু থু তোমার অত্যুচ্চ ও মহা গৌরবময় মহাজগতের ধূলিকণাকেও স্পর্শ করতে পারে না।

অন্যান্য কতিপয় অভিযোগের পর্যালোচনা

আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যা দানের দাবীকে যুক্তি-সঙ্গত ও সঠিক সাব্যস্ত করার উদ্দেশে কিছু অন্যান্য অভিযোগেরও অবতারণা করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্যঃ

১। আহ্‌মদীগণ অন্যান্য মুসলমানদের পিছনে নামাযও পড়ে না, জানাযাও আদায় করে না এবং বিবাহ-সম্পর্কও স্থাপন করে না।

২। আহ্‌মদীরা কুরআন মজীদে শব্দ ও অর্থগত হের-ফের ও প্রক্ষেপ করেছে।

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে সবিনয়ে নিবেদন এই যে, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি অত্যাচারিত জামা'ত, যাদের বিরুদ্ধে এর সূচনা কাল হতেই ওলামা-কেরাম ফতওয়া দিয়ে রেখেছেন। যেমন, ১৮৯২ ইং সালে মৌলানা নযীর হুসেন দেহ্‌লভী সাহেব আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ফতওয়া দেন, "তাকে আগাম সালামও করবেন না............এবং তার ইমামতীতে নামাযও আদায় করবেন না"

(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ঃ খণ্ড- ১৩, সংখ্যা ৬, পৃঃ ৮৫)

মৌঃ মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী ফতওয়া দেন, "কাদিয়ানীর (মির্যা গোলাম আহমদ) মুরীদ হয়ে মুসলমানদের পেশ-ইমাম হওয়া পরস্পর বিরোধী এবং উভয় অবস্থান কখনও একত্র হতে পারে না।" *(শারয়ী ফয়সালাঃ পৃঃ ৩১)*

মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী সাহেব ফতওয়া দেন, "তাকে (মির্যা গোলাম আহমদ) এবং তার অনুসারীদেরকে ইমাম বানান হারাম।" *(শারয়ী ফয়সালা ঃ পৃঃ ৩১)*

মৌঃ সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী ফতওয়া দেন, "তার পিছনে নামায আদায় জায়েয (বৈধ) নয়।" *(ফতওয়া শরীয়তে গার্‌রা ঃ পৃঃ ৯)*

মৌঃ আব্দুস সামী বাদাইউনী সাহেব ফতওয়া দেন, "কোন মির্যায়ীর (আহ্‌মদীদেরকে বিরুদ্ধবাদী উলামার দেয়া নাম) পিছনে নামায কখনও জায়েয নয়। মির্যায়ীদের পিছনে নামায আদায় করা এমনই, যেমন হিন্দু এবং ইহুদ-নাসারাদের পিছনে। মির্যায়ীদেরকে নামায পড়ার অথবা অন্যান্য ধর্মীয় আহ্‌কাম পালনের উদ্দেশ্যে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল্ জামাত এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কখনও নিজেদের মসজিদে ঢুকতে দিবেন না।"

(সায়েকা রব্বানী বর ফেৎনা কাদিয়ানী ঃ ১৮৯২ সনে মুদ্রিত, পৃঃ ৯)

মৌঃ আব্দুর রহ্‌মান বিহারী ফতওয়া দেন, "তার এবং তার অনুসারীদের পিছনে নামায নিছক বাতেল ও মর্দুদ (ভ্রষ্ট ও অশুদ্ধ)।......তাদের ইমামতি এমনই যেমন ইহুদীর ইমামতি।" *(ফতওয়া শরীয়তে গার্‌রাঃ পৃঃ৪)*

মৌঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ টোঙ্কী (লাহোর) ফতওয়া দেন, "তার এবং তার মুরীদানের পেছনে নামায আদায় কখনও দুরস্ত (বৈধ) নয়।" *(শর্‌য়ী ফয়সালা ঃ পৃঃ ২৫)*

মৌঃ আব্দুল জব্বার উমরপুরী ফতওয়া দেন, "মির্যা কাদিয়ানী ইসলাম-বহির্ভূত, কখনও ইমামতির যোগ্য নয়।" *(শর্‌য়ী ফয়সালা ঃ পৃঃ ২০)*

মুফ্‌তী দেওবন্দ মৌঃ আযীযুর রহ্‌মান সাহেব ফতওয়া দেন, "যে ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস কাদিয়ানী ভাবাপন্ন তাকে ইমামুস্ সালাত করা হারাম।"

(শর্‌য়ী ফয়সালা ঃ পৃঃ ৩১)

মুশতাক আহমদ দেহ্‌লভী সাহেব ফতওয়া দেন, "মির্যা এবং তার সমমনা লোকদেরকে ভাল জ্ঞানকারী যেকোন ব্যক্তি ইসলামের জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাকে ইমাম বানান না-জায়েয।" *(শার্‌য়ী ফয়সালাঃ পৃঃ২৪)*

মৌঃ আহ্‌মদ রেযা খান বরেলভী ফতওয়া জারী করেন, "তার (মির্যা সাহেবের) পিছনে নামায আদায়ের শরীয়তগত অবস্থান অবিকল তাই যা ধর্মত্যাগীদের।"

(হুসামুল হারামাঈনঃ পৃঃ ৯৫)

মৌঃ মুহাম্মদ কেফায়তুল্লাহ শাহ্‌জাহানপুরী ফতওয়া দেন, "তাঁর (মির্যা সাহেব) কাফের হবার বিষয়ে কোন শক্-সন্দেহ নেই এবং তার কাছে বয়াত হওয়া হারাম এবং তার ইমামতি কখনও জায়েয নয়।" *(ফতওয়া শরীয়তে গার্‌রা ঃ পৃঃ ৬)*

জানাযা সম্পর্কে উলামা কেরামের ফতওয়াসমূহ ঃ

মৌঃ নযীর হুসেন দেহ্‌লভী ফতওয়া দেন, "এরূপ দজ্জাল-কায্‌যাব থেকে সতর্ক ও দুরে থাকুন---তার জানাযার নামাযও পড়বেন না।"

(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ ঃ ১৩ খন্ড, সংখ্যা ৬)

মৌঃ আব্দুস্ সামাদ গযনভী ফতওয়া দেন, "তার জানাযার নামায আদায় যেন না করা হয়।" *(ইশায়াতুস্ সুন্নাহঃ খন্ড, ১৩, সংখ্যা ৬, পৃঃ ১০১)*

কাযী উবায়দুল্লাহ্ বিন সিবগাতুল্লাহ মাদ্রাযী ফত্‌ওয়া দেন, "যে ব্যক্তি তার অনুসারী হয়েছে, সেও কাফের এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ---এবং সে মুরতাদ তৌবা ব্যতিরেকে মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়বেন না। " (ফত্‌ওয়া দর তাকফীরে মুনকেরে উরুজে জিসমী ও নুযূলে হযরত ঈসা (আঃ)

মুফতী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ টোঙ্কী, লাহোর, ফতওয়া দেন, "যে ব্যক্তি জেনে শুনে মির্যায়ীর (আহ্‌মদীর) জানাযার নামায পড়েছে, প্রকাশ্যে (জন সমক্ষে) তার তৌবা করা উচিত এবং নিজের বিয়ের নবায়ন করে নেয়া সমীচীন হবে। (অর্থাৎ মাওলানাকে দিয়ে নিজের স্ত্রীর সাথে পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে)।"

(ফতওয়া শরীয়তে গার্‌রা ঃ পৃ-১২)

অধিকন্তু এই উলামা-কেরাম এ ফতওয়াও দেন, "এসব লোকদেরকে (আহ্‌মদীদেরকে) যেন মুসলমানদের কবরস্থানেও দাফন হতে না দেয়া হয়।" মৌলানা আব্দুস সামাদ গযনভী ফতওয়া দেন, "এদেরকে (আহমদীদেরকে) মুসলমানদের কবরস্থানে যেন দাফন হতে না দেয়া হয়, যেন কবরগুলোতে সমাহিত মৃতরা এর কারণে পীড়িত ও নির্যাতিত না হয়।"

(ঈশায়াতুস্ সুন্নাহ্ ঃ ১৩ খন্ড সংখ্যা ৬, পৃঃ ১০১)

কাযী উবায়দুল্লা মাদ্রাযী ফতওয়া দেন, "এদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবেন না, বরং গোসল ও কাফন ব্যতিরেকেই কুকুরদের ন্যায় গর্তের মধ্যে ফেলে গেড়ে দেবেন।" *(১৮৯৩ সালের ফতওয়া, ফতওয়া দর তাফফীরে মুনকেরে উরুজ ও নুযূলে ঈসা আলায়হেস সালাম" থেকে উদ্ধৃত)*

তেমনি তিনি এও ফতওয়া দেন যে, কোনও মুসলমানের জন্যে আহ্‌মদীদেরকে কন্যা দান জায়েয নয়। সুতরাং 'শারয়ী ফয়সালা'য় লিপিবদ্ধ করা হয়, "যে-ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রমাণিত হয় যে, সে সত্যিই কাদিয়ানীর (মির্যা সাহেবের) মুরীদ তার সাথে কন্যা নেয়া দেয়া করা না-জায়েয।" *(শারয়ী ফয়সালা ঃ পৃঃ ৩১)*

অধিকন্তু এ ফতওয়া দেয়া হয়েছে, "যারা তার (মির্যা সাহেবের) উপর বিশ্বাস রাখে, তারাও কাফের এবং তাদের বিবাহবন্ধন অটুট থাকল না। যার ইচ্ছা সে তাদের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করতে পারে।" *(লুধিয়ানাবাসী মৌঃ আব্দুল্লাহ ও মৌঃ আব্দুল আযীয সাহেবানের ফতওয়া, ঈশায়াতুস্ সুন্নাহ ঃ ১৩ খন্ড, পৃঃ ৫)*

তার মানে, আহ্‌মদীদের স্ত্রী-লোকদের জবরদস্তি বিয়ে করে ফেলাও উলামা কেরামের মতে সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত ছিল। আর তেমনি তারা এই ফতওয়া দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি তার অনুসারী হয়েছে সেও কাফের ও মুর্তাদ (ধর্ম ত্যাগী) এবং শরীয়ত অনুযায়ী ধর্মত্যাগীর বিয়ে 'ফিস্‌খ' (ভ্রষ্ট ও ছিন্ন) হয়ে যায় এবং তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যায়। কাজেই সে তার স্ত্রীর সাথে যে সহবাস করবে তা হবে ব্যভিচার আর এমতাবস্থায় যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তা ব্যভিচার জনিত জারয সন্তান হবে।" *(ফতওয়া দর তাকফীরে মুনকেরে উরুজে জিসমী ও নুযূলে ঈসা আলায়হেস্‌সালাম, হিজরী ১৩১১ সনে মুদ্রিত)*

আহ্‌মদীয়া মুসলিম আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী উলামা কেবলমাত্র ফতওয়াই দেন নি বরং নিজেদের অনুসারী সরলপ্রাণ জনগণ দ্বারা তদনুযায়ী কঠোরভাবে কার্যকর করানোরও সদাসর্বদা চেষ্টা চালান। যেমন, পীর মেহের আলী গোলড়ভীর মুরীদ মৌঃআব্দুল আহাদ খানপুরী রচিত পুস্তক "মুখাদায়া মুসায়লামা কাদিয়ানী" (১৯০১ইং সালে প্রকাশিত)-এর নিম্ন উদ্ধৃত উস্কানিমূলক লিখা থেকে প্রতীয়মান ঃ

"মির্যায়ী দলটা খুবই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল। তারা জুমুআ ও জামা'ত নামায থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং যে মসজিদে তারা নামায পড়তো তা থেকে তাদেরকে

বেইজ্জতির সাথে বেদখল করা হয়েছে এবং যেখানে তারা জুমুআর নামায আদায় করতো সেখান থেকে তাদেরকে আদেশ বলে রোধ করে দেয়া হয়েছে--- তাছাড়াও বহু রকমের জিল্লতি তাদের পোহাতে হয়েছে। মুসলমানদের সাথে তাদের সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন ও রুদ্ধ হয়ে গেছে। বিবাহিতা ও বাগদত্তা স্ত্রীদেরকে মির্যায়ীয়াতের (আহমদীয়াতের) কারণে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের মৃতদেরকে বিনা গোসল ও কাফন এবং নামায জানাযা ব্যতিরেকে গর্তগুলোতে গাড়া হয়েছে।" *(পৃঃ২)*

এবারে সম্মানিত সংসদ-সদস্যগণ অনুধাবন করতে পারেন যে, বছরের পর বছর দীর্ঘকাল যাবৎ দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন ও নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবার পর যদি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদেরকে স্পর্শকাতর পরীক্ষা এবং ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাবশতঃ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় তাহলে সেটা বরং তাদের দয়াযোগ্য এবং বেদনাত্মক অবস্থার প্রমাণ বহন করে। ইহা কখনও তাদের 'অ-মুসলিম' হবার দলিল সাব্যস্ত হতে পারে না।

এ সমস্যাটির অন্যান্য দিকও আছে, যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এবং অভিমত প্রকাশিত পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যা হুবহু উদ্ধৃত করা হলোঃ

আহ্‌মদী মুসলমানগণ অ-আহ্‌মদী মুসলমানদের পেছনে কেন নামায পড়ে না ঃ

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের উলামাদের সর্বাপেক্ষা কৌতুহলপূর্ণ নিত্য কর্মকান্ড হলো, যেন-তেনভাবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তকে অ-মুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যায়িত করা। এ প্রসঙ্গে বিপুল সংখ্যায় এরূপ বই-পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে, যা যুক্তি-প্রমাণ অপেক্ষা ঢের বেশী উস্কানিমূলক, ভিত্তিহীন অভিযোগ, অপবাদ এবং গালি-গালাজপূর্ণ। আর এগুলোতে ঐ সব কথারই পুনরাবৃত্তি, যা ১৯৫২-৫৩ সালে সরলপ্রাণ জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছড়ান হয়েছিল। ডঃ গোলাম জীলানী বার্ক এই শ্রেণীর বই পুস্তকের উল্লেখ তাঁর রচিত ''হারফে মাহ্‌রামানা'' গ্রন্থে নিম্নরূপ ভাষায় করেছেনঃ-

''আজ পর্যন্ত আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ ও যতসব বই-পুস্তকই উলামায়ে-ইসলাম উপস্থাপিত করেছেন তাতে যুক্তি ও দলিল প্রমাণ ছিল কম এবং গালি-গালাজ অধিক। এরূপ অশালীণ বই পুস্তক কে-বা পড়বে, আর গালিগালাজ কে-ই বা শুনবে?!" *(হরফে মাহ্‌রামানা ঃ পৃঃ ১২)*

১৯৫৩ইং সালে যখন এই অশালীণ বক্তব্য ও অশ্লীল গালি-গালাজ জনসাধারণের মেযাজ ও মনমানসিকতাকে উত্তেজিত করে তুললো, তখন জনাব মৌলানা মওদূদী ঐ পরিস্থিতি থেকে দলীয় ফায়েদা লুটার জন্যে এবং ঐ উত্তপ্ত লাভাকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সেই দিয়াশলাই কাঠি দেখালেন, যার নাম দেয়া হলো "কাদিয়ানী মাসয়ালা"। এ পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্যও প্রকৃতপক্ষে অবিকল তাই

ছিল, যা ইতোপূর্বে প্রকাশিত পুস্তকাদিরও ছিল। যদিও দৃশ্যতঃ উহাতে গালি-গালাজ ও অশ্লীল বক্তব্য কম এবং যুক্তি-প্রমাণ অধিক আছে বলে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সরলপ্রাণ ও স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো বা তদ্রুপই ছিল, যারা যুক্তি-প্রমাণকে যাচাই করার যোগ্যতা রাখে না। যেমন, আসর জমানো বাকপটু ওষুধ বিক্রেতা নিম-হেকিমদের হাতে তারা রং মিশানো পানিকে অমৃত মনে করে কিনে নেয়, তেমনি 'কাদিয়ানী মাসয়ালা' যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা হিসেবে যদি তারা ধরে নিয়ে থাকে তাহলে আমাদের বলার কিছুই নেই। তবে কোন কোন প্রখ্যাত অ-আহমদী উলামার দৃষ্টিতে ঐ সব যুক্তি-প্রমাণের যে কী মূল্য ছিল তা "তুলুয়ে-ইসলাম"-এর সম্পাদক জনাব গোলাম আহ্মদ পারভেজের নিম্নরূপ মন্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়ঃ

"সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় মওদূদী সাহেবের লেখা 'কাদিয়ানী মাসয়ালা' পুস্তিকাটিকে। আমাদের মতে এই পুস্তিকার উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণগুলো এতই হাল্কা এবং নীচু মানের যে, যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এগুলো সব আহমদীদের পক্ষেই চলে যায়।" *(মেযাজ শেনাসে রসূল ঃ পৃ ঃ ৪৪৩)*

ঐ পুস্তিকাতে যেসব আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং আজকাল আবার সেগুলোর বিপুল পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের আপত্তিটিই নিচ্ছি, 'আহ্মদীরা অ-আহ্মদীদের পেছনে কেন নামায পড়ে না? যেহেতু তারা পড়ে না কাজেই প্রমাণিত হল যে, 'তারা এক পৃথক উম্মত এবং অমুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যায়িত হবার যোগ্য'।

এ আপত্তির একটি উত্তর আমরা অতি সংক্ষেপে পেশ করছি। এর মধ্যেই বাস্তবপক্ষে 'কাদিয়ানী মাসয়ালা' পুস্তিকার অধিকাংশ আপত্তিগুলোর উত্তর এসে যাবে। বরং যদি কোন ন্যায়পরায়ণ মন-মানসিকতাসম্পন্ন পাঠক ইসলামী ন্যায় বিচারকে পদদলিত ও হাত ছাড়া না করেন, তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কাদিয়ানী তো দূরে থাক, অপরাপর প্রতিটি ফির্কাকেই ন্যায়সঙ্গত ভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যা দেয়া ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কেবল এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আসল প্রশ্ন যা এখন আমাদের সামনে আছে তা হচ্ছে, আহমদীরা অআহ্মদী মুসলমানদের পেছনে কেন নামায পড়ে না।

তবে শুনুন। অন্যদের পেছনে নামায না পড়ার গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো ক্ষমতাবান, খ্যাতিমান ও নামী-দামী শীর্ষস্থানীয় অ-আহমদী ওলামার ঐ সকল ফতওয়া, যেগুলোর দ্বারা মুসলমানদেরকে একে অন্যের পেছনে নামায পড়তে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

(১) বিচার্য বিষয়, আমরা কি ঐ দেওবন্দীদের পেছনে নামায পড়বো? যে দেওবন্দীদের সম্বন্ধে আহমদীদের নয়, বরং অ-আহ্মদী নেতৃস্থানীয় উলামার দ্ব্যর্থহীন

ফতওয়া হলো এই, "ওহাবী-দেওবন্দীরা তাদের ইবারত (লিখিত বক্তব্য) গুলোতে সকল অলী আল্লাহ্ ও নবীগণের, এমন কি হযরত সৈয়্যদুল আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এবং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তা'লার অবমাননা ও অপমান করার কারণে নিশ্চিত মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) ও কাফের এবং তাদের ধর্মত্যাগ (ইর্তেদাদ) কুফরীর ক্ষেত্রে শক্ত, অতি শক্ত, ও কঠিনতম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে– এমনই পর্যায়ে যে, যে ব্যক্তিই এই ধর্মত্যাগী কাফেরদের ধর্মত্যাগ ও কুফরী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করে সে-ও তাদেরই ন্যায় মুর্তাদ ও কাফের। মুসলমানদের উচিত সম্পূর্ণভাবেই তাদের কাছ থেকে যেন দূরে থাকেন। তাদের পেছনে নামায পড়ারতো প্রশ্নই উঠে না, নিজেদের পেছনেও তাদেরকে ঢুকতে দিবেন না। তাদের যবাই করা কোন কিছু খাবেন না; তাদের সুখে-দুঃখেও অংশীদার হবেন না। তাদেরকে নিজেদের কাছেও আসতে দিবেন না এবং অসুস্থ হলে এদের দেখতেও যাবেন না। এরা মরলে এদেরকে পুঁতে দিতেও অংশ নিবেন না। মুসলমানদের কবরস্থানে স্থান দিবেন না। মোট কথা, এদের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সাবধান এবং দূরে থাকবেন ....।

অতএব, ওহাবী দেওবন্দীরা শক্ত, অতি শক্ত ও কঠিনতম মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) এবং কাফের; এমনই কাফের যে, তাদেরকে যে কাফের না বলবে, সে নিজেও কাফের হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তার বিবাহ-বন্ধনের আওতার বাইরে চলে যাবে (অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে), যে সন্তানাদি হবে তারা জারয সন্তান হবে এবং শরীয়ত অনুযায়ী সম্পত্তির অংশ পাবে না।"

উক্ত ফতওয়া সম্বলিত বিজ্ঞাপনটিতে বহুসংখ্যক আলেমের নাম লিপিবদ্ধ আছে, যেমন সৈয়দ জামাত আলী শাহ, হামেদ রেযা খাঁন কাদেরী নূরী রিযভী বেরেলভী, মুহাম্মদ করম দিনভী, মুহাম্মদ জমীল আহ্‌মদ বাদাইউনী, উমর আল্-নয়ীমী মুফ্‌তী-এ-শরীয়ত এবং আবু মুহাম্মদ দীদার আলী মুফতী আকবরাবাদ প্রভৃতি ।

"উক্ত ফতওয়া প্রদানকারী কেবলমাত্র হিন্দুস্থানের উলামাই নয় বরং ওহাবী দেওবন্দীদের লিখাগুলোর তরজমা যখন পাঠানো হলো তখন আফ্‌গানিস্তান, খিফা, বোখারা, ইরান, মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া ও মক্কা মুয়ায্‌যামা এবং মদীনা মুনাওয়ারা প্রভৃতি আরব জাহান, কুফা ও বাগদাদ শরীফ মোট কথা তামাম জাহানের আহ্‌লে সুন্নত উলামা সর্ব সম্মতিক্রমে এই ফতওয়া দিয়েছেন।"

(ফতওয়া বেরেলভী উলামা-এ - আরব ও আযম– মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম ভাগলপুরী কর্তৃক প্রকাশিত, শেয়খ শওকত হুসেন ম্যানেজার কে, হাসান ইলেকট্রিক প্রেস, ইশতিয়াক মঞ্জিল, হিউট রোড, লক্ষ্মৌ কর্তৃক মুদ্রিত, মুদ্রন সন তারিখ লিপিবদ্ধ নেই, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের ফতওয়া। তাছাড়াও মৌলানা শাহ মুস্তফা রেযা খান প্রণীত 'রদ্দে রাফাযা' এবং মুফতী-এ-আযম হিন্দ কর্তৃক সংকলিত 'আল্ মলফুয' ইত্যাদি পুস্তিকাবলীতেও লিপিবদ্ধ আছে।)

মৌঃ আব্দুল করীম নাজী দাগিস্তানী ঃ হারাম শরীফ, মক্কা-এর ফতওয়া ঃ

" هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ قَتْلُهُمْ وَاجِبٌ عَلٰى مَنْ لَهٗ حَدٌّ وَنَصْلٌ وَافِرٌ۔ بَلْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ قَتْلِ اَلْفِ كَافِرٍ فَهُمُ الْمَلْعُوْنُوْنَ فِيْ سِلْكِ الْخُبَثَاءِ مُنْخَرِطُوْنَ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى اَعْوَانِهِمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلٰى مَنْ خَذَلَهُمْ فِيْ اَطْوَارِهِمْ "

তরজমাঃ- "তারা বদকার (পাপাচারী) কাফের। ইসলামের রাজা-বাদশা, যে-ই শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাবান এবং অস্ত্রধারী ও যুদ্ধবাজ তার উপরে তাদেরকে (ওহাবী-দেওবন্দীদেরকে) হত্যা করা ওয়াজেব, বরং তা সহস্র কাফেরকে হত্যা করার চেয়েও শ্রেয়ঃ, কেননা তারা লা'নতি (অভিশপ্ত) এবং খবীসদের (অপবিত্রদের) সূত্রে একসাথে গ্রথিত। অতএব, এদের উপরে এবং এদের সাহায্যকারীদের উপরে আল্লাহ্‌তা'লার লা'নত এবং যারা তাদেরকে তাদের ঘৃণ্য চাল-চলনের দরুন পরিত্যাগ করে তার উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত। এ বিষয়টি বুঝে নাও।"

(ফাযিলে-কামেল, নেকো খাসায়েল, সাহেবে ফয়েযে ইয়ায্‌দানী মৌলভী আব্দুল করীম নাজী দাগিস্তানী, হারাম শরীফ, মক্কা, হুসামুল হারামাঈন আলা মানহারিল কুফ্‌রে ওল মিয়ানঃ পৃঃ ১৭৬-১৭৯, মৌলানা আহমদ রেযা খান বেরেলভী প্রণীত, আহলে সুন্নত ওল-জামাত বেরেলিঃ হিঃ ১৩২৪-২৬/ইং ১৯০৬-৮)

(২) অতঃপর, আমরা কি ঐ আহ্‌লে হাদীসদের পেছনে নামায আদায় করবো? যে আহলে-হাদীসদের সম্বন্ধে বেরেলভী নেতৃস্থানীয় উলামা ও ইমামগণ আমাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করেন যে, "ওহাবীয়া ইত্যাদি এযুগের মুকল্লেদীন (অন্ধঅনুকরণকারীগণ) হারামাঈন শরীফাঈনের উলামা-কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের মুর্তাদ (অবিশ্বাসী, ধর্মত্যাগী), তারা এমন পর্যায়ে কাফের মুর্তাদ যে, যে-কেউ তাদের বক্তব্য ও অভিমত সম্বন্ধে অবহিত হবার পর তাদেরকে কাফের জ্ঞান না করে অথবা সন্ধিহান হয় সে-ও কাফের। তাদের পেছনে নামায আদায় হয়ই না। তাদের হাতে যবাইকৃত জীব হারাম। তাদের স্ত্রীগণ তাদের বিয়ে-বন্ধনের আওতার বাইরে চলে গেছে। তাদের বিয়ে-শাদী কোন মুসলমান-কাফের বা মুর্তাদের(?) সাথেও হতে পারে না। এদের সাথে মেলা-মেশা, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, সালাম-কালাম সবকিছুই হারাম। এদের বিস্তারিত হুকুম আহ্‌কাম 'মুস্তায়াব হিসামুল হারামাঈন শরীফ' কিতাবে মওজুদ আছে। এবং আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।"

সিল-মোহর	সিল-মোহর	সিল-মোহর
দারুল ইফ্‌তা মাদ্রাসা	আলে রসূল আহ্‌মদ	শফী আহ্‌মদ খান রিয্‌ভি
আহলে সুন্নত ওল জামাত, বেরেলি	রেযা খান বেরেলি	সুন্নী-হানাফী কাদেরী।

(ফাতাওয়া সানাইয়া ঃ খন্ড ২, পৃঃ ৪০৯, আল্-হাজ্জ মৌঃ মুহাম্মদ দাউদরায, খতীব জামেয়া আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক সংকলিত; মকতবা ঈশায়াতে দীনিয়াত, মোহন পুরা, বোম্বে কর্তৃক প্রকাশিত)

আরও পাঠ করুনঃ

"তাকলীদকে (অনুকরণকে) হারাম এবং মুকাল্লেদীনকে মুশরেক বলে যে আখ্যা দেয়, সে কাফের বরং মুর্তাদও (ধর্মত্যাগী) বটে .... মুসলমান শাসকদের অবশ্য কর্তব্য তাকে হত্যা করা এবং 'আমি জানতাম না' এ বলে তার ওজরআপত্তি শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাওবা করার পরেও তাকে হত্যা করা বাধ্যকর, অর্থাৎ তাওবা করার দরুন যদিও মুসলমান হয়ে যায় তথাপি এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরীয়ত মতে এটাই শাস্তি যে, তাকে মুসলিম শাসক হত্যা করে ফেলবে অর্থাৎ যেমন ব্যভিচারের 'হদ্দ' (বিধিবদ্ধ শাস্তি) ব্যভিচারী তাওবা করলেও রহিত হয় না, তেমনিভাবে শরীয়ত নির্ধারিত এই শাস্তিও (হদ্দ) অপসৃত হয় না। ইহা যুগের উলামা ও মুফতীগণের উপরে বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

তারা যেন এ রকম বিষয় সম্পর্কে কেবল শোনা মাত্র (সাক্ষী-প্রমাণ বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে) ঐ ব্যক্তির কাফের ও মুর্তাদ হওয়ার ফতওয়া দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধা না করেন। অন্যথায় তাঁরাও ধর্মত্যাগীদের দলভুক্ত হবেন। (ইন্তেযামুল্ মাসাজিদ বি-ইখ্‌রাজি আহ্‌লিল ফিতানে ওল-মাকয়িদে ওল-মাফাসিদ ঃ পৃঃ ৫, জা'ফারী প্রেস, লাহোরে মুদ্রিত, মৌলানা মুহাম্মদ ইব্‌নে মৌঃ আব্দুল কাদের লুধিয়ানভি)

(৩) অতঃপর আমরা কি ঐ বেরেলভিদের পেছনে নামায আদায় করে কাফেরে পরিণত হবো? যে বেরেলভীদের সম্পর্কে দেওবন্দী উলামা আমাদেরকে এই 'শরীয়ত সম্মত' (?) হুকুম শুনাচ্ছেনঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ছাড়াও অন্য কাউকে এলমে-গায়েব (অদৃশ্য) সম্বন্ধে জ্ঞাত বলে সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ে অন্য কারো এল্‌ম বা জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। তার ইমামতি এবং তার সাথে মেলামেশা ও সৌহার্দ্য-সৌজন্য সবকিছুই হারাম।"

(সীলমোহরকৃত ফাতাওয়া রশিদীয়া কামেল মুবাওয়াব, মৌঃ রশিদ আহ্‌মদ গঙ্গোহি, পৃঃ ৬২, প্রকাশকঃ মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, গ্রন্থাবলী ব্যবসায়ী, কুরআন মহল, মৌলভি মুসাফিরখানার বিপরীতে, করাচী, ইং ১৮৮৩-৮৪)

অথবা, যাদের সম্পর্কে বিখ্যাত দেওবন্দী আলেম জনাব মৌঃ সৈয়্যদ হুসেন আহ্‌মদ মাদানী সাহেব, সাবেক প্রধান মুদার্‌রেস, দারুল উমুল দেওবন্দ আমাদেরকে জ্ঞাত করছেন, "এই যাবতীয় কুফরী ফতওয়া এবং লা'নতসমূহ বেরেলভি এবং তার অনুগামীদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে কবরের ভেতর তাদের জন্যে আযাব এবং (মৃত্যুপূর্ব) অন্তিম মুহূর্তে তাদের জন্যে হৃদয় থেকে ঈমান অন্তর্হিত এবং (সত্যের)

তসদীক ও দৃঢ়বিশ্বাস বিলুপ্ত হবার কারণ হবে, কেননা ফিরিশ্‌তারা হুযুর আলায়হেস্ সালামের কাছে বলবে, ইন্নাকা লা তাদরি মা আহ্‌দাসু বা'দাকা (হে রসূল! আপনি জানেন না তারা আপনার অবর্তমানে কি সব কার্যকলাপ করেছে) এবং রসূলে মকবুল আলায়হেস্ সালাম বেরেলভি দাজ্জাল এবং ঐ অনুচরদেরকে "সুহ্‌কান সুহ্‌কান (দূর হও, দূর হও) বলে হাউযে কওসর এবং প্রশংসনীয় শাফায়াত হতে কুকুরের চেয়েও লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করবেন এবং তাদেরকে এই মর্যাদাপূর্ণ উম্মতের (অন্তর্ভুক্ত হবার) সকল আজ্‌র (প্রতিদান) ও সওয়াব (পুরস্কার) এবং মর্তবা ও নেয়ামতসমূহ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা হবে।" *("রজূমুল-মুযনেবীন আলা রউসিশ্ শাইয়াত্বীন" আল্ মশহুরু বিহিশ্ শিহাবুস্ সাকেবে আলাল মুস্তারেকিল কাযেব ঃ পৃঃ ১১, মৌঃ সৈয়্যদ হুসেন আহ্‌মদ মাদানী কর্তৃক প্রণীত এবং কুতুবখানা ইয়াযিয়া, দেওবন্দ, জিলা সাহারানপুর কর্তৃক প্রকাশিত)*

(৪) তারপর, আমরা কি ঐ পরভেজি এবং চকড়ালভিদের পেছনে নামায পড়বো? যাদের সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে বেরেলভি ও দেওবন্দি এবং মওদূদী উলেমা ফতওয়া দিয়েছেন, "চকড়ালভিয়াত হলো হুযূর সরওয়ারে কায়েনাত আলায়হেত্ তাসলিমাত এর মাকাম ও মর্যাদা এবং তাঁর তশরীয়ী (বিধান প্রণয়নের) পদমর্যাদার অস্বীকারকারী এবং তাঁর আশিসময় হাদীসসমূহের প্রাণঘাতি দুশমন। রব্বুল করীমের এই সব প্রকাশ্য বিদ্রোহীরা রসূলের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী রণক্ষেত্র কায়েম করে ফেলেছে। জানা আছে তো! বিদ্রোহীর কি শাস্তি? শুধুমাত্র গুলি।" *(সাপ্তাহিক "রিজওয়ান" লাহোর (চকড়ালভিয়াত সংখ্যা) আহলে সুন্নত ওল জামাতের ধর্মীয় মুখপত্র, ২১-২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, পৃঃ ৩ "রেজওয়ান" 'অফিস, দিল্লী দরোজা, লাহোর)*

তারপর, ওয়ালী হাসান টোঙ্কী তাদের বিরুদ্ধে প্রণীত "শারয়ী হুকুমনামা" নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণনা করেন ঃ

"গোলাম আহমদ পরভেজ মুহাম্মদী শরীয়ত অনুযায়ী নির্জলা কাফের এবং ইসলাম বহির্ভূত। এই ব্যক্তির বিবাহ-বন্ধনে কোনও মুসলমান নারী থাকতে পারে না (অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে)। তার সাথে কোন মুসলমান নারীর বিয়েও হতে পারে না। তার জানাযার নামাযও পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করাও জায়েয হবে না। এই হুকুম কেবলমাত্র পরভেজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং প্রত্যেক কাফেরের ক্ষেত্রেই। তার অনুসারী লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এই সব কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের সমর্থক তার ক্ষেত্রেও একই আদেশ প্রযোজ্য। আর যখন সে মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) সাব্যস্ত হলো, তখন তার সাথে আর কোনও রকমের ইসলামী সম্পর্কাদি রাখা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয (বৈধ) নয়।" *(ওয়ালী হাসান টোঙ্কী, মুফতী ও মুদার্‌রিস মাদ্রাসা আরাবীয়া ইসলামীয়া, নিউ টাউন, করাচী; মুহাম্মদ ইউসুফ বন্নোরী, শায়খুল হাদীস, মাদ্রাসা আরাবীয়া, ইসলামীয়া টাউন, করাচী)*

পরভেজীদের সম্পর্কে জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'তসনীমে'র ফতওয়া হলো, "এই পরামর্শদাতাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, শরীয়ত কেবলমাত্র ততটুকই যতটুক কুরআনে আছে। তাছাড়া আর বাকী যা কিছু আছে তা শরীয়ত নয়, তাহলে ইহা নির্জলা কুফরী এবং অবিকল সেই রকমেরই কুফরী যে রকমটি কাদিয়ানীদের রয়েছে বরং তার চেয়েও শক্ত এবং কঠোরতর।" *(মৌলানা আমীন আহ্‌সান ইসলাহীর নিবন্ধ, দৈনিক 'তসনীম' লাহোর, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫২, পৃঃ ১২)*

(৫) তারপর, আমরা কি ঐ শিয়াদের পেছনে নামায পড়বো যাদের। সম্পর্কে সর্ব সাধারণ মুসলমানদের উলামা হৃদয় কাঁপানো ভয়ঙ্কর ভাষায় সাবধান করেন? ঃ-

"সামগ্রিকভাবে এই রাফেযী (শিয়া) তাবাররাকারীদের (প্রথম তিন খলিফাকে গালমন্দকারী) প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে দ্ব্যর্থহীন ও সুনিশ্চিত ফয়সালা হলো এই যে, সার্বিকভাবে তারা কাফের ও মুরতাদ (অবিশ্বাসী, ধর্মত্যাগী)। তাদের হাত দিয়ে যবাইকৃত পশু মৃত বিশেষ। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী শুধু হারামই নয়, বরং নিছক ব্যভিচার। মায়াযাল্লাহ, পুরুষ যদি রাফেযী (শিয়া) হয় এবং স্ত্রী মুসলমান, তাহলে এটা আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি বিশেষ। আর যদি পুরুষ সুন্নী হন এবং স্ত্রী ঐ অপবিত্রদের মধ্যকার হয়, তবুও কখনও বৈধ বিয়ে হবে না। সেটা কেবলমাত্র ব্যভিচার হবে। সন্তানরা হবে ব্যভিচারজনিত জারয সন্তান। পিতার উত্তরাধিকার তারা পাবে না, যদিও সন্তানরা সুন্নীই হোক না কেন। কেননা ব্যভিচার জনিত সন্তানের পিতা কেউ নয়। স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী হবে না, মোহরানারও নয়। ব্যভিচারিণীর জন্যে মোহরানা নেই। শিয়া রাফযী তার কোন নিকট-আত্মীয়ের, এমন কি মাতা-পিতা-কন্যার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেতে পারে না। সুন্নীর তো দূরে থাক, কোনও মুসলমানের বরং কোন কাফেরেরও পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার পাবে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং স্বয়ং তার স্বধর্মীয় শিয়া রাফযীর উত্তরাধিকারে তার মূলতঃ কিছুমাত্রও হক্-অধিকার নেই। তাদের নারী-পুরুষ-আলেম-জাহেল নির্বিশেষে কারো সঙ্গে মেলামেশা, সালাম-কালাম শক্ত কবীরা গোনাহ্ এবং কঠোরভাবে হারাম। তাদের অভিশপ্ত আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে জানার পরও যে ব্যক্তি তাদেরকে মুসলমান মনে করে অথবা তারা কাফের হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, এরূপ ব্যক্তিও দীনের সকল ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের বেদীন বটে এবং তার ক্ষেত্রে ঐ যাবতীয় আদেশ প্রযোজ্য, যা তাদের জন্যে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমানদের উপরে ফরয-কর্তব্য যে, উক্ত ফতওয়া যেন তাঁরা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং এর উপর আমল করে সত্যিকার পাকা ও খাঁটি সুন্নী প্রতিপন্ন হন।" *(ফতওয়া মৌঃ শাহ্ মুস্তফা রেযা খান, 'রাদ্দুর রাফাযাহ্'-এর সূত্রে, পৃঃ ২৩, নূরী কেতাবখানা, দাতা সাহেব বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, গুলজারে আলম প্রেসে মুদ্রিত, বেরুন ভাটি গেট, লাহোর, হিঃ ১৩২০)*

"বর্তমানকালের শিয়া রাফেযীগণ তো সাধারণভাবেই ধর্মের জরুরী বিষয়াবলীর অস্বীকারকারী এবং সুনিশ্চিত মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। তাদের পুরুষ বা নারীর বিয়ে কারও সঙ্গে হতেই পারে না। তেমনি ওহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, নেচারী, চকড়ালভী এরা

সবাই মুরতাদ। কাজেই এদের পুরুষ বা নারীর বিয়ে সমগ্র বিশ্বে যার সঙ্গেই হবে সে মুসলমান হোক কিম্বা কাফের, আসল হোক কিম্বা মুরতাদ, মানব হোক কিম্বা জীব-জন্তু সে বিয়ে নিছক বাতিল এবং নিছক ব্যভিচার হবে এবং তজ্জনিত সন্তানরা হবে হারাম সন্তান।" *(আল্ মলফুয ঃ দ্বিতীয় অংশ ঃ পৃঃ ৯৭, ৯৮, মুফতী-এ-আযম, হিন্দ কর্তৃক সংকলিত)*

(৬) তারপর, জামাতে ইসলামীর পেছনে নামায আদায়ের দ্বারা আমরা কি আমাদের ইসলাম বাঁচাতে পারবো? যাদের সম্পর্কে বেরেলভী ও দেওবন্দী নির্বিশেষে সকল উলামা এই সুনিশ্চিত ফতওয়া জারী করেন, "মওদূদী সাহেবের বই-পুস্তকের উদ্ধৃতিসমূহ দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ধ্যান-ধারণা ইসলামের পথদিশারী ইমামগণ এবং সম্মানিত নবীগণের শান ও মর্যাদায় আঘাত এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ অবমাননায় ভরপুর। তিনি যে পথভ্রষ্ট গোমরাহ এবং পথভ্রষ্টকারী তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের কাছে আমার আকুল আবেদন যে, তাঁর আকীদ-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে সযত্নে দূরে থাকুন এবং তাঁকে ভুলবশতঃ ইসলামের খাদেম ও সেবক বলে না ভেবে বসুন। এমনতর ভুল বুঝাবুঝির শিকার হবেন না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন যে, আসল দাজ্জালের পূর্বে আরও ত্রিশজন দাজ্জাল পয়দা হবে, যারা ঐ আসল দাজ্জালের পথকে সুগম করবে। আমার জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী ঐ ত্রিশ দাজ্জালদের মধ্যে একটি হলেন মওদূদী।"

(ফাকাৎ, ওয়াস্‌সালাম- মুহাম্মদ সাদেক (উফেয়া আন্‌হু) মোতামীম (কর্মাধ্যক্ষ), মাদ্রাসা মাযহারুল উলুম, মহল্লা খাড্ডা করাচী, ২৮শে যিলহজ্জ, ১৩৭১ হিঃ, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ ইং; "হক্কপরাস্ত উলামা কি মওদূদীয়াত সে নারাযগী কে আসবাব" ঃ মৌঃ আহমদ আলী, আঞ্জুমানে খুদ্দামুদ্দীন, লাহোর।)

তারপর, মাওদুদী এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট অনুচরদের পেছনে নামাযের অবৈধতা (হুরমত) সম্বন্ধে খোলাসাভাবে ঘোষণা করতে গিয়ে জমিয়তে-উলামা-এ-ইসলাম-এর প্রধান হযরত মৌলানা মুফতী মাহ্‌মুদ বলেন, "আমি আজ এখানে হায়দ্রবাদস্থ প্রেসক্লাবে ফতওয়া দিচ্ছি যে, মওদূদী গোম্‌রাহ্‌, কাফের এবং ইসলাম বহির্ভূত। তার এবং তার জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও মৌলভীর পেছনে নামায পড়া না-জায়েয এবং হারাম। তার জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখা নির্জলা কুফরী এবং বিপথগামিতা। সে আমেরিকা এবং পুঁজিবাদীদের এজেন্ট। এখন সে মওতের শেষ কিনারায় পৌছে গেছে। এবং এখন তাকে কোনও শক্তি বাঁচাতে পারবে না। তার জানাযা বের হবেই হবে।" *(সাপ্তাহিক 'জিন্দিগী'ঃ ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৯, জমিয়তগার্ড, লায়েলপুর-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত)*

(৭) আমরা কি আহ্‌রারী (তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবুওয়তপন্থী) উলামার পেছনে নামায পড়বো? যাদের সম্পর্কে 'গোপন রহস্য বিশারদ' মৌলানা যাফর আলী সাহেব সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, বস্তুতঃ ও প্রকৃতপক্ষে এই দলের লোকগুলি ইসলাম ধর্মের প্রতি কেবল মাত্র বেজার ও বিরক্তই নয়, বরং সুনিশ্চিৎ তারা ইসলামের গাদ্দার (বিশ্বাসঘাতক)ও বটে। একটু পড়ে দেখুন ঃ-

"আল্লাহ্‌র কানুন বুঝতে ও চিনতে বেজার (বিমুখ)

ইসলাম ও ঈমান এবং পুণ্যের প্রতি বেজার।।

পয়গম্বরের (সাঃ) সম্মান ও মর্যাদার নেগেহ্‌বানের (সংরক্ষণকারীর) প্রতি বেজার।।

কাফেরদের সাথে সখ্যতা ও আঁতাত, মুসলমানের প্রতি বেজার।।

তদুপরি দাবী যে, তারা ইসলামের আহ্‌রার (সৈনিক)

আহ্‌রার তারা কোথাকার! এরা হলো ইসলামের গাদ্দার।।

পাঞ্জাবের আহরার ইসলামের গাদ্দার।।

আরবের সংস্কৃতি ও সভ্যতা (ইসলাম) সম্বন্ধে অপরিচিত, দুর্ভাগা এরা, আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং শাস্তিকে ভয় পায় না তারা।।

সরকারের মন্ত্রিত্ব পেলেই হলো ছলে-বলে-কৌশলে

মদীনার সরকার (সাঃ)-এর সাথে নেই এদের কোনও যোগ-সম্পর্ক

পাঞ্জাবের আহ্‌রার ইসলামের গাদ্দার।।"

(দৈনিক যমীনদার" ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৫, পৃঃ ৬)

অতঃপর, মৌলানা মওদূদী সাহেব মৌলানা যাফর আলী সাহেবের কিছুটা সমর্থন করে বলেন, "এই কার্যকলাপ থেকে দু'টি বিষয় আমার কাছে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। এক, আহরারদের সামনে আসল প্রশ্ন 'তাহাফ্‌ফুযে (সংরক্ষণ) খতমে-নবুওত' নয়, বরং নাম-ধাম এবং কৃতিত্ব লাভ। বস্তুতঃ এই লোকগুলো মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদকে নিজেদের পরিকল্পিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে জুয়ার চাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। দুই, রাতের বেলায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়ার পর আবার তারা কয়েক জনে মিলে পৃথক বসে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকায় এবং ভিন্ন একটা প্রস্তাব নিজেদের ক'রে লিখে আনে--।

আমি অনুধাবন করেছি, যেকাজ এই রকম নিয়্যত এবং নিজেদের হীন স্বার্থাবলী চরিতার্থে খোদা ও রসূলের নামে খেলোয়াড়রা, যারা মুসলমানদের মস্তকসমূহ দাবার

গুটির ন্যায় ব্যবহার করে তারা কখনও আল্লাহ্‌র সাহায্যে ভূষিত হয়ে সফলকাম হতে পারে না।" *(দৈনিক "তাসনীম" লাহোর, ২রা জুলাই, ১৯৫৫ ইং, কঃ ৩, পৃঃ ৪,৫)*

কেবলমাত্র নমুনাস্বরূপ, অত্যন্ত সংক্ষেপে বহুল সংখ্যক সুদীর্ঘ ফতওয়াসমূহের মধ্য থেকে এই কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। এ ফতওয়াসমূহ আপনারা পাঠ করলেন। আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতে- মুসলেমার প্রতি সদয় হোন। নিশ্চয় আপনারা বুকে এবং মাথায় হাত রেখে বসে পড়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে এ মুহূর্তে কেবল এটুকু জিজ্ঞেস করবার অনুমতি দিন যে, এই হৃদকম্প সৃষ্টিকারী ফতওয়াসমূহের বিদ্যমানতায়, আহমদীরা কেন উল্লেখিত ফির্কাগুলোর ইমামগণের পেছনে নামায পড়ে না- এ আপত্তি করার লেশমাত্রও অবকাশ থাকে কি?!

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটু ইনসাফের সাথে বিচার করুন! খোদাকে তো কিছু ভয় করুন। দুই জাহানের প্রভু হক্‌ ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গোলামীর মর্যাদা ও লজ্জা-শরম তো এতটুকু হলেও রাখুন এবং বলুন যে, উপরে উল্লিখিত অধিকাংশ ফির্কার উলামা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে যে নিতান্ত যুলুম এবং বেইনসাফির হোলি খেলা খেলছেন, এটা মুসলমান হিসেবে কতটুকু শোভা পায়? রহমাতুলিল-আলামীন (সাঃ)-এর গোলামদের পক্ষে কি ইহা শোভনীয়? এদের পেছনে নামায পড়লেও কাফের আবার না পড়লেও কাফের! এমতাবস্থায় মানুষ যাবে কোথায়? তাহলে কি মুসলমান থাকার জন্যে একটাই পথ খোলা থাকলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায় নামাযকেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া?! অধুনাকালের উলামার সিদ্ধান্ত তো এরূপ বলেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানিত্ব যদি অবশিষ্ট রাখতে চাও, তাহলে নামায ছেড়ে দাও। অন্যথায়, যার পিছনেই নামায পড়বে, তার ফলে, শক্ত কাফের এবং জাহান্নামী বলে সাব্যস্ত হবে। তাই, বাঁচার একটি পথই খোলা ছিল, কারও পেছনেই নামায না পড়া। তখন আবার আহমদীদের জন্যে এ পথটিও রুদ্ধ করে দেয়া হলো- এ ফতওয়া দিয়ে যে, অন্য কোন ফির্কার পেছনে নামায না পড়লে তারা কাফের। আবার অ-মুসলিম সংখ্যালঘু যদি নামায পড়ে, তবুও কাফের। আর যদি না পড়ে, তবুও কাফের!!! এবার বলুন, তারা যাবে কোথায়? অথবা কবি আতেশের কথা অনুযায়ীঃ

"কোই মর না যায়ে তো কেয়া করে?"

- ('এমতাবস্থায় কারো পক্ষে মরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?')

বিজ্ঞ দার্শনিকেরা এ ধরনের ন্যায়-বিচারকে ব্যঙ্গ করে একটা গল্প লিখেছেন যে, একটা মেষশাবক কোন নদীর তীরে পানি পান করছিল। তখনই এক নেকড়ে বাঘ উজানের দিকে অর্থাৎ স্রোতের উল্টো দিক থেকে আসলো এবং ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোর কি জানা নেই যে, আমিও পানি খাচ্ছিলাম? তারপরও তুই তা ঘোলা

করবার সাহস কি করে পেলি।' মেষশাবক সবিনয়ে বললো, "হুযূর! আমি তো ভাটির দিক থেকে পানি খাচ্ছিলাম। আপনার পানি কি করে ঘোলা হতে পারে, যখন কি-না আপনি উজানের দিক থেকে পানি খাচ্ছিলেন?" নেকড়ে বাঘটা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললো, "আচ্ছা! মুখের উপর আবার কথা বলিস? আমাকে মিথ্যাবাদী বলছিস? লা'নতি! বাস্, তোর শাস্তি তোকে চিরে ফেড়ে খাওয়া।"

এই সব উলামাকে কিছু তো আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বলুন, নেকড়ে বাঘ এবং মেষ-শাবকের ঐ গল্পটি যখন আপনারা পাঠ করেন তখন কখনও সে কাল্পনিক মেষ-শাবকটির প্রতি করুণায় আপনার হৃদয় আপ্লুত হয়, আর কখনও নেকড়ে-বাঘটার উপর রাগ আসে। কিন্তু আজ আপনাদের চোখের সামনে মেষ-শাবকের সাথে নয়, বরং আদম-সন্তানদের সাথে অনুরূপ করা হচ্ছে। কোন কাল্পনিক গল্পের মধ্যে নয়, বরং বর্তমান জগতে একটি মর্মন্তুদ হৃদয়বিদারক বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে অনুরূপ যুলুমের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে। অথচ প্রতিবাদের একটি অক্ষরও, এমনকি 'টু' শব্দটিও তাদের মুখে উচ্চারিত হয় না।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে! এতটুকু তো করুন যে, এই উলামাকে বলুন, "যদি এই যুলুমের পথই অবলম্বন করতে চান, যদি ঐ জঙ্গলের কানুনকেই বেছে নিতে চান, যদি শক্তির অহমিকায় খোদাতা'লার আদল ও ইনসাফের কানুনকে (ন্যায়-বিচারের নীতিকে) যে-কোনও মূল্যে পিষে ফেলার ফয়সালা করে থাকেন তাহলে অন্ততঃ এতটুকু সমীহ করুন, ইসলামের পবিত্র নামকে এর মধ্যে জড়িয়ে কলঙ্ক লেপনে বিরত থাকুন। এতটুকু দয়া তো করুন, রসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মান-মর্যাদাকে এই বিবাদের মধ্যে কলুষিত করবেন না। শক্তিমত্তা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহঙ্কারে যুক্তি ও দলিল প্রমাণের কি-ই বা প্রয়োজন! জনৈক কবি যেমন বলেছেন ঃ

"যব ম্যায়কাদা ছুটা হ্যায় তো ফের কিয়া জাগাহ্ কি কয়েদ?"

(অর্থাৎ, "যখন মদালয় হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন স্থানভেদের আর কি-বা প্রয়োজন?" - অনুবাদক)।

ইসলামী মূল্যবোধ – আদল ও ইনসাফের টুঁটি চেপে ধরে নিজেদের বাসনা-কামনা চরিতার্থ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন ছেড়ে দিন এই সব 'দলিল-প্রমাণ' এবং এই তৃণকণার আশ্রয় গ্রহণ। হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ুন কারবালার ময়দানে আর করে ফেলুন, যা করতে চান। তারপর, স্বচোখে দেখে নিন, ইসলামের খোদা এবং ইসলামের রসূল (সাঃ) কার সাথে আছেন। বিপদাবলী এবং কঠিন দুঃখ-কষ্টের ময়দান কাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লালাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্যিকার, নিষ্ঠাবান এবং আত্মোৎসর্গীকৃত আশেক ও প্রেমিক এবং নিবেদিত প্রাণ সাব্যস্ত করে।

ইনশাআল্লাহ্, আপনারা দেখে নিবেন এবং সময় প্রমাণ করে দেবে যে, প্রতিটি আহমদী তার এই দাবীতে সত্যবান।

در کوئے تو اگر سرِ عشاق را زنند
اوّل کسے کہ لافِ تعشّق زند منم

অর্থাৎ "হে আমার প্রিয় রসূল! তোমার গলিতে যদি তোমার প্রেমিকের শির উচ্ছেদ করা হয়, আর এটাই যদি হয় প্রেমিক হবার জন্যে শর্ত তাহলে আমি হবো সেই প্রথম ব্যক্তি যে প্রেম নিনাদে মাথা পেতে দেবে; হ্যাঁ, আমিই হবো সে ব্যক্তি।"

(মুবারক মাহমুদ, রামগলি, ৩নং ব্রাণ্ডরুথ রোড, লাহোর)

(২) আর একটি নেহায়েৎ যালেমানা এবং ডাহা মিথ্যা আপত্তি আরোপ করা হয়েছে এই বলে যে, আহমদীয়া সিলসিলার স্থপতি এবং তাঁর অনুসারীগণ মায়াযাল্লাহ্ কুরআন মজীদের মধ্যে শব্দ ও অর্থে প্রক্ষেপ করেছে। অথচ আহমদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর জামা'ত সেই একমাত্র জামা'ত যাদের আকীদা হলো, কুরআন মজীদের কোনও একটি শব্দও রহিত (মনসুখ) হতে পারে না এবং উহাকে পরিবর্তনও করা যায় না। বস্তুতঃ কুরআন শরীফ চিরসংরক্ষিত ও অভ্রান্ত কিতাব।

আফসোসের বিষয়, সাম্প্রতিককালে কতিপয় উলামা কেবলমাত্র উস্কানি এবং উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে প্রক্ষেপের অপবাদ আরোপ করেছন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কোন কোন পুস্তকে "কিতাবতের ভ্রম" বা মুদ্রণ প্রমাদের ফলে ভুল প্রকাশিত কোন কোন আয়াত পেশ করে ইহা প্রমাণ করার অবাঞ্ছিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুরআন করীমে 'তাহরীফ' বা প্রক্ষেপের অপরাধ করেছে। কিন্তু তারা এ কথাটি ভুলে গিয়েছেন যে, যে ধরনের মুদ্রণ প্রমাদের ভুল ধরিয়ে তাহ্‌রীফের আপত্তি আরোপ করা হয় তা প্রায় প্রত্যেক প্রণেতার পুস্তকাবলীতে মওজুদ রয়েছে।

আহ্‌মদীয়া সিলসিলার মুখপত্র দৈনিক "আল্‌-ফযল"-এর বিভিন্ন সংখ্যায় নিম্নবর্ণিত উলামার প্রকাশিত পুস্তকাবলী থেকে ঐরূপ নমুনা উপস্থাপন করা হলো, যেগুলিতে কুরআন করীমের আয়াতসমূহ ছাপার ভুলে অশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

১। সৈয়্যদ আতাউল্লাহ শাহ্‌ বুখারী

(খুতবাতে আমীরে শরীয়ত, মাকতাবা 'তাবসেরাহ' লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত)

২। মৌলানা আহমদ রেখা খান বেরেলভী *(আল্‌ মলফূয, প্রথম খন্ড)*

৩। মুফতী-এ-আযম দেওবন্দ মৌঃ আযীযুর রহমান দেওবন্দী

(ফাতওয়া দারুল উলুম, দেওবন্দ, ৫ম খণ্ড)

৪। ইমামুল হিন্দ মৌলানা আবুল কালাম আযাদ *(মাযামীনে 'আল বালাগ', আইনা আদাব চক মিনার, আনারকলি, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত।*

৫। আল্লামা মৌলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সুলেয়মান নদভী

(সাপ্তাহিক 'আল্ ইতেশাম', লাহোর)

৬। ইখওয়ান আন্দোলনের অধিনায়ক হাসানুলবান্না

(সাপ্তাহিক 'আল্ মুনির', লায়েলপুর, জানুয়ারী, ১৯৫৫ সংখ্যা)

৭। মৌঃ আশরাাফ আলী থানুভী *(বেহেশ্‌তী যেওয়ার, ১ম খন্ড, শেয়খ গোলাম আলী এণ্ড সন্স্‌, লাহোর থেকে প্রকাশিত)*

৮। সাদরুল মুদার্‌রেসীন মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যুমী রিয্‌ভী সুন্নী বরকাতী আজমীর শরীফ *(বাহারে শরীয়ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড)*

৯। ইখওয়ান লিডার হাসানুল হায়সামী

(সাপ্তাহিক 'আল্ মুনীর', লায়েলপুর, জানুয়ারী, ১৯৫৫ সংখ্যা)

১০। মৌলভী আব্দুর রহীম আশরাফ, আল্ মুনীর সম্পাদক

(সাপ্তাহিক 'আল্ মুনীর', লায়েলপুর, জানুয়ারী, ১৯৫৫ সংখ্যা)

১১। হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) *("আরবাঈন ফী উসুলিদ্ দীন" এর* উর্দু তরজমা, *প্রকাশকঃ মালিক ফযলুদ্দীন প্রমুখ, লাহোর)*

১২। মোহ্‌তামীম, দারুল উলুম দেওবন্দ কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব *(তালীমাতে ইসলাম আওর মসীহী আকওয়াম, প্রকাশকঃ নাদওয়াতুল মুসান্নেফীন,-দিল্লী)*

১৩। মৌলানা সৈয়্যদ মুহম্মদ দাউদ গযনভী

(সাপ্তাহিক "আল্ ই'তেসাম, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫৮)

১৪। মৌলানা সানাউল্লাহ সাহেব অমৃতসরী

(ফাতাওয়া সানাইয়া, ১ম খণ্ড ঃ মোহনপুরা, বোম্বে-১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ ইং)

১৫। মৌঃ মুহম্মদ বখ্‌শ মুসলিম, লাহোর *(কিতাবুল আখলাক)*

১৬। মৌঃ আব্দুর রউফ রহমানী সাহেব *(সাপ্তাহিক "আল্ ই'তেসাম" লাহোর, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৩)*

১৭। মৌঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল, আমীরে শরীয়ত

(সাপ্তাহিক "আল্ ই'তেসাম" লাহোর, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

১৮। আল্লামা সৈয়্যদ মুনাযের আহ্‌সান গিলানী *(তবাকাত, অনুবাদক আল্লামা মুনাযের আহ্‌সান গিলানী, আল্ লাজনাতুল ইলমিয়া, হায়দারাবাদ)*

১৯। মৌলানা কওসার নিয়াযী, আওকাফ ও হজ্জ মন্ত্রী

("ইসলাম হাসারা দীন হ্যায়" প্রকাশকঃ ফিরোজ সন্স, লাহোর)

২০। মুল্লাওয়াহেদী দেহ্লভী- *(হায়াতে সরওয়ারে কায়েনাত, ২য় খন্ড)*

২১। মুফতী মাহ্মুদ সাহেব, জেনারেল *সেক্রেটারী, জমিয়তে ইসলাম (আযানে সেহ্র, মৌলানা মুফতী মাহ্মুদের ইন্টার ভিউ এবং বক্তৃতাসমূহের সমষ্টি, প্রকাশকঃ আযীয পাব্লিশার্স, লাহোর)*

২২। মৌলানা মাহ্মুদ আহ্মদ

(সাপ্তাহিক 'রেদওয়ান' এর সম্পাদক, (উক্ত পত্রিকার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩)

২৩। মুফ্তী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন

(মজমুয়া ইফাযাত সাদরুল আফযেল, প্রকাশকঃ ইদারা নাঈমিয়া রিযভিয়া, লাহোর)

২৪। মৌলানা সৈয়্যদ আবুল আলা মওদূদী

(আল্ জিহাদ ফিল ইসলাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮ ইং, প্রকাশক ঃ ইস্‌রা, লাহোর)

২৫। মৌলানা শামসুল হক্ আফগানী, বাহাওলপুর

(সাপ্তাহিক 'লওলাক" ৭ই জুন, ১৯৬৮)

২৬। জনাব গোলাম জিলানী বর্ক (হরফে মাহ্রামানা, আহমদীয়াত পর এক নজর)

মুদ্রণ- ভ্রমকে যদি 'তাহ্রীফ' বা প্রক্ষেপ বলা সঠিক হয়, তাহলে এই সকল উলামা কেরামকে কি কুরআন মজীদে তাহ্রীফকারী আখ্যা দেয়া হবে? এ প্রসঙ্গে আমরা একটি প্রচার-পত্রও এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করছি যার শিরোনাম হলোঃ "হযরত বানিয়ে সিলসিলা আওর তাহরীফে কুরআনকে বোহতান কি তারদীদ" (আহ্মদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা এবং পবিত্র কুরআনে প্রক্ষেপ সংক্রান্ত অপবাদ খন্ডন)।

অর্থগত তাহ্রীফ বা প্রক্ষেপের আপত্তিও সর্বৈবঃ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। উলামাগণ কুরআন মজীদের বিভিন্ন তরজমা করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন তফসীরও লিখেছেন। যদি এই বিভিন্নতাকে তাহ্রীফ বা প্রক্ষেপ আখ্যা দেয়া হয়, তাহলে তো সকল মুফাস্সের এবং উলামাকেই তাহ্রীফ বা প্রক্ষেপের অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে হবে।

স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআনী 'তত্ত্বজ্ঞান' পবিত্র ব্যক্তিদের কাছে উম্মোচিত হয়। আল্লাহ্তা'লা বলেনঃ "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ"

যদি এই সুক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের অফুরন্ত রত্নভান্ডারকে অর্থগত তাহ্রীফ বা প্রক্ষেপের নাম দেয়া হয় তাহলে এই উম্মতের সমগ্র আওলীয়াআল্লাহ্কে প্রক্ষেপকারী বলে আখ্যায়িত করতে হবে। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)।

সম্মানিত সাংসদ মহোদয়গণের খেদমতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর সম্মান্বিত সংসদ সদস্যদের খেদমতে অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা এ সতর্কবাণীটি পেশ করা জরুরী বলে মনে করি যে, ধর্মের নামে পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে পরস্পর কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত করার এবং তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার এক দীর্ঘ কালীন ষড়যন্ত্র চলছে, যার মুখোশ উম্মোচন করে দিয়েছেন বহুকাল পূর্বে 'বযমে শাকাফতে ইসলামীয়া" (Islamic Cultural Society)-এর সভাপতি খলীফা আব্দুল হাকীম সাহেব লিখিত বক্তব্যে। তিনি লিখেছেনঃ

"পাকিস্তানের একটি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সম্প্রতি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, এক 'মুল্লায়ে আযম' এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী আলেম, যিনি কিছুকাল হলো, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দোটানাভাবে বিচার বিবেচনার পর হিজরত করে পাকিস্তানে চলে এসেছেন। তাঁকে আমি একটি ইসলামী ফির্কা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তার উত্তরে তিনি ফতওয়া দিলেন, 'তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা 'ওয়াজেবুল-কতল' (অবশ্য অবশ্য হত্যাযোগ্য)। আর যারা উগ্র ও চরমপন্থী নয় তারা 'ওয়াজেবুত-তাযির' (অবশ্য অবশ্য শাস্তি যোগ্য)'। আর একটি ফির্কা, যাদের মধ্যে রয়েছে বহু সংখ্যক কোটি পতি ব্যবসায়ী, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বল্‌লেন, 'ওরা সকলই ওয়াজেবুল্‌কতল।' এ আলেমই ছিলেন ঐ ত্রিশ-বত্রিশ জন উলামার মধ্যে সর্বাগ্রে এবং হর্তা-কর্তাবিশেষ, যারা নিজেদের প্রস্তাবিত ইসলামী গঠনতন্ত্রের মধ্যে এটা জরুরী ও অপরিহার্য দফা বলে নির্ধারণ করেছেন যে, প্রতিটি ইসলামী ফির্কাকেই স্বীকৃতি দেয়া হোক একটি ব্যতিরেকে। সে ফির্কাটি ইসলাম বহির্ভূত বলে বিবেচিত হোক। তারাও ওয়াজেবুল কতলই বটে, তবে এখনই তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলার কথা নয়। সময়-সুযোগ যখন আসবে তখন দেখা যাবে। তাঁদেরই মধ্যে আর একজন নেতৃস্থানীয় আলেমে-দীন বল্‌লেন, 'এখন সবেমাত্র আমরা 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্' একটি ফির্কার বিরুদ্ধে শুরু করেছি। এতে সফলতালাভের পর ইনশাআল্লাহ অন্যান্যগুলোর খবর নেয়া হবে।" *("ইকবাল আওর মুল্লা"-ডকটর খলীফা আব্দুল হাকীম, এম,এ, পি-এইস-ডি প্রণীত, পৃঃ১৯; প্রকাশনাঃ বয্‌মে ইক্‌বাল, লাহোর)*

'খতমে নবুওয়তে'র পবিত্র নামে এই 'পাক ভুমি'তে (পাকিস্তানে) যে আন্দোলন চালানো হচ্ছে, এর প্রেক্ষাপট উপরোল্লিখিত লিখাটি থেকে সুপ্রতিভাত হয়ে পড়ে। জনাব আবুল আলা মওদূদী সাহেব ১৯৫৩ সালের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে এক বিশেষ বিবৃতির মাধ্যমে বিস্ময়করভাবে স্বীকার করেছেন ঃ

"এই কার্যক্রম থেকে দু'টি বিষয় আমার কাছে একেবারেই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। একটি হলো, আহ্‌রারদের সামনে আসল প্রশ্ন 'খতমে-নবুওয়ত তাহাফ্‌ফুয (সংরক্ষণ)' নয়, বরং নাম-ধাম এবং কৃতিত্ব লাভ । বস্তুতঃ এই লোকগুলো নিজেদের পরিকল্পিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ জুয়ার চাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়ার পর আবার তারা কয়েক জনে মিলে পৃথক বসে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকায় এবং ভিন্ন একটা প্রস্তাব নিজেদের থেকে লিখে আনে। আমি অনুধাবন করেছি, যে কাজ এই রকম নিয়্যত এবং পদ্ধতিতে করা হয় তাতে কখনও মঙ্গল হতে পারে না, নিজেদের হীন স্বার্থাবলী চরিতার্থে খোদা ও রসূলের নামে খেলোয়াড়গণ যারা মুসলমানদের মস্তক দাবার গুটির ন্যায় ব্যবহার করে, তারা কখনও আল্লাহ্‌র সাহায্যের দ্বারা ভূষিত হয়ে সফলকাম হতে পারে না ----- ।" *(দৈনিক "তাসনীম" লাহোর, ২রা জুলাই, ১৯৫৫ ইং)*

এই প্রেক্ষাপটে যদি পাকিস্তানের বিগত যুগ এবং বর্তমানের উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হবে যে, যদিও বর্তমান পর্যায়ে শুধুমাত্র জামা'ত আহ্‌মদীয়াকে অ-মুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে, কিন্তু পাকিস্তানের দুশমনদের সুদীর্ঘকালীন পরিকল্পনাধীনে মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্যান্য ফির্কাগুলোর বিরুদ্ধেও ফেৎনার এক সুপ্রশস্ত পথ নিশ্চয় প্রস্তুত ও উম্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ ১৯৫৩ ইং সালের পর থেকেই আহমদীদের ছাড়াও কতিপয় অন্যান্য ফির্কাগুলোকেও অ-মুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যা দানের আওয়াজ উত্থাপিত হতে শুরু করেছে। সুতরাং ১৯৫৩ সালের মার্চের গোড়াতে করাচীর দেয়ালে দেয়ালে "মোতালবাত" (দাবীনামা) শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপণ সেঁটে দেয়া হয়েছিল, যা হুবহু নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

"মোতালবাত"

(দাবীনামা)

"দেওবন্দী ফির্কাকে পৃথক সংখ্যালঘু ফির্কা বলে স্বীকার করা হোক"

"গুটিকয়েক উলামার মজলিসে শোরা কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামী হুকুমতের মৌলিক নীতিমালা' দৃষ্টিগোচর হলো। এর ৯নং দফাটিতে ইসলামী ফির্কাসমূহের 'হকুক' (অধিকারসমূহ) উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সেগুলোর কোন বিবরণ নেই। দৃশ্যতঃ এই উপেক্ষার কারণ বৃটিশ রাজত্ব কালের জন্মগত সংখ্যালঘু (দেওবন্দী) ফির্কাটির সৃষ্টিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসমূহের পূর্ণতা এবং এ ফির্কাটিকে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফির্কার মধ্যে একাকার দেখিয়ে তাদেরই হাত দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের 'আকায়েদ'কে

পদদলিত করা বলেই প্রতীয়মান হয়। সেজন্যে আমরা স্পষ্ট ভাষায় খোলাসাভাবে পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেয়া নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করি যে, আওলিয়াল্লাহ্‌দের সেবকবৃন্দ অর্থাৎ 'আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাত' ফির্কাই হলো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফির্কা। আজ ইহার যে মযহাব ও তরীকা বিদ্যমান আছে উহাই প্রবহমান হয়ে চলে আসছে শাহাবুদ্দিন ঘৌরী থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বকাল অব্দি 'অবিভক্ত ভারতবর্ষে'র ইসলামী রাষ্ট্রের মযহব ও তরীকা হিসেবে। পাকিস্তানের এই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্মীয় বিশ্বাস নিম্নরূপঃ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদব এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা নির্দিষ্ট নিয়মে 'ইসালে-সওয়াব', নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে নযর ও নিয়ায (উপঢৌকন), নির্ধারিত তারিখগুলোতে বুযুর্গানে-ইসলামের উরুসাদি, মিলাদ মাহফিলসমূহ এবং এগুলোতে কেয়াম সহকারে সালাত ও সালাম ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু বৃটিশ রাজত্বকালের জন্মগত (দেওবন্দী) সংখ্যালঘু ফির্কাটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপরোল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে শিরক এবং বেদাত বলে আখ্যায়িত করে এবং এটা তাদের আকীদা। বস্তুতঃ প্রারম্ভিকভাবে ইবনে সউদের পক্ষ থেকে যে-সব অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ আদি ও প্রাচীনকালীন আকীদা-বিশ্বাসগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়েছিল, অনুরূপ অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপরোল্লিখিত ধর্মীয় আকীদা ও অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে এই সংখ্যালঘু ফির্কাটি ভারত এবং পাকিস্তানেও আরোপ করা জায়েয (বৈধ) বলে মনে করে।এই সংখ্যালঘু ফির্কাটির সৃষ্টি ও জন্ম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৌলভী ইসমাঈল দেহ্‌লভী, যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে না-জায়েয বলে সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু ইংরেজদের ইশারায় শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। তিনি 'ইমকানে কিয্‌ব' অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ) খোদা মিথ্যা কথাও বলতে পারেন এবং 'ইমকানে নযীর' অর্থাৎ রসূলের (সাঃ) 'মিস্‌ল' বা অনুরূপ কেউ হতে পারে৷ এসব স্বরচিত আকিদাও প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছেন।

১৮৫৮ইং সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সামনে ভারতবর্ষকে খ্রীষ্টান বানাবার যে পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছিল তার একটি দফা ছিলোঃ

'হিন্দুস্থানের প্রতীমাপূজারীদের অর্থাৎ অ-খ্রীষ্টানদেরকে তাদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মেলা (সম্মেলন)গুলোতে একত্রিত হতে দিও না।' এই পরিকল্পনাদির পরে পরেই মৌলভী ইসমাঈল সাহেবের রেখে যাওয়া মিশনে নবজীবন সঞ্চার করা হয় এবং তাঁর তৈরী আকীদা-বিশ্বাস এবং নক্‌শা ও রূপরেখা অনুযায়ী দেওবন্দ জনবসতিতে তাঁর কায়েমকৃত ফির্কাটির নবরূপায়ণ করা হয়। এই কারণেই এখন তারা দেওবন্দী ফির্কা নামে অভিহিত। কিন্তু এ ফির্কাটি সংখ্যায় কম। সেজন্যে নিজেদেরকে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল-জামাতে'র অন্তর্ভুক্ত বলে। অথচ তাদের আকায়েদ 'আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাত' হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ, যেমন শিখরা হিন্দুদের মধ্য থেকেই উৎপত্তি লাভ

করেছে, কিন্তু তারা হিন্দু নয়, অথবা ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্টরা রোমান ক্যাথলিক থেকেই উদ্ভুত, কিন্তু তারা রোমান নয়, অনুরূপভাবেই দেওবন্দী ফির্কা 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত' থেকে হয়েছে, কিন্তু তারা 'আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাত' নয়। সংখ্যালঘু দেওবন্দী ফির্কার বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী সাহেব, মৌলানা সৈয়দ সোলেমান নদভী সাহেব, মৌলভী ইহ্‌তেশামূল হক্‌ সাহেব, মিস্টার আবুল আলা মওদূদী প্রমুখগণ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের আকায়েদ এবং অধিকারসমূহকে উপেক্ষা করা গণতন্ত্রের নীতিমালার বিরোধী ও অবমাননার নামান্তর। সেজন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে নিম্নবর্ণিত দাবীসমূহ পেশ করা গেলঃ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানের 'আমীর' (রাষ্ট্র প্রধান) মুসলমান হবার দফাটিতে তিনি (রাষ্ট্র প্রধান) সংখ্যাগরিষ্ঠদের আকীদাধারী হওয়া অপরিহার্য শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হোক।

২। 'আহ্‌লে-সুন্নত ওয়াল-জামাত' হতে দেওবন্দী ফির্কাকে পৃথক ও স্বতন্ত্র ফির্কা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

৩। 'আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতে'র আকায়েদ এবং ওক্‌ফকৃত সম্পত্তি ও বিষয়-সম্পত্তিতে দেওবন্দী ফির্কার অনাধিকার চর্চা ও হস্তক্ষেপ আইনতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

এ সকল দাবীমালার উদ্দেশ্য পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য পাকিস্তান থেকে চিরতরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বস্তি ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আত্মপক্ষ সমর্থন ও নিজেদের জরুরী বিষয়াদির অভিব্যক্তি। কেননা ইতিহাস সাক্ষী যে, হেনরী ৮ম-এর রাজত্বকালে রাজার প্রীতিভাজন প্রটেস্ট্যান পাদ্রীরা নিজেদেরকে রোমান ক্যাথলিক স্বরূপ প্রকাশ করে এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের উন্নতিকল্পে ঐশ্বরিক রাজত্ব এবং খ্রীষ্টিয় ব্যবস্থার জয়গান করেই পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মমতকে 'ইংলণ্ডের মাটি থেকে উৎখাত করিয়েছিল।' যদি আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল-জামা'তের মাথার উপর দেওবন্দী ফির্কাকে চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে হেনরী ৮ম এবং রোমান ক্যাথলিকদের অনুরূপ ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানো। কল্যাণের দিকে আহ্‌বায়কগণ-

এরপরেই রয়েছে 'জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানে'র পৃষ্ঠপোষক হযরত মৌলানা মখদুম সৈয়্যদ নাসের জালালী এবং বহুসংখ্যক বেরেলভী উলামার দস্তখত।"

(মাসিক 'তুলুয়ে ইসলাম', মে ১৯৫৩ ইং সংখ্যা ৬৪, ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)

শিয়া পত্রিকা "আল্‌ মুন্তাযের" লাহোর, ১৯৭০ সালে লিখেছে ঃ

"জমিয়তের সাংবিধানিক নীতিমালা প্রণয়নকারীরা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে নিজেদের ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী ফির্কাসমূহকে অ-মুসলিম সাব্যস্ত করার জন্যেও দফা জুড়ে দিয়েছেন। খতমে-নবুওয়তের তো কেবল ছলনা মাত্র। অন্যথায় "ইত্যাদি" শব্দটির

মধ্যে এতো ব্যাপকতা রয়েছে যে, মুফতী মাহ্মুদ এবং গোলাম গওস হাযারভী ইসলামের যে-কোন ফির্কাকে অ-ইসলামী সাব্যস্ত করে রেখে দিবেন।"

("আল্ মুন্তাযের" লাহোর, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০, পৃঃ ১০)

"আল্ মুন্তাযের" যে আশঙ্কাটি ব্যক্ত করেছিল তা দু'বছর পরেই বাস্তব রূপ ধারণ করেছে, যার রেকর্ড তুল্য প্রমাণ বহন করছে মুলতানে অনুষ্ঠিত 'খেলাফতে রাশেদা কনফারেন্সে' গৃহীত নিম্নরূপ প্রস্তাব ঃ

"খেলাফতে রাশেদা কনফারেন্স, মুলতানের এই আযীমুশ্বান অধিবেশন পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানায় যে, শিয়ারা যখন মুসলমানদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র আওকাফ (ওক্ফসম্পত্তি) এবং আলাদা শিক্ষা সিলেবাসের জন্যে দাবী জানিয়ে মিল্লাত হতে বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ দিয়েছে এবং এইরূপে কার্যতঃ তারা এ দাবীই করেছে যে, তারা সর্বসাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক একটা স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সরকারও তাদের এই পৃথকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন শিয়াদেরকে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরেই পৃথক করে দেয়া হোক। আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোতে চাকুরীর সকল পদগুলোতে তাদেরকে জনসংখ্যার অনুপাতে অংশ দেয়া হোক। আজ সুন্নী বেচারা সাধারণভাবে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং অধিকাংশ উর্ধতন ও উচ্চপদগুলোতে এবং ক্ষমতার শীর্ষ আসনগুলোতে শিয়াদেরকেই দেখা যায়। 'সওয়াদে-আযমে'র (সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদের) জোরালো দাবী, সরকার এই বিচ্ছিন্নতাপ্রিয় ফির্কাটিকে চাকুরী ইত্যাদিতেও পৃথক করে দিক এবং মূলকেন্দ্রিক পদগুলোতে এবং উর্ধ্বতন উচ্চপদগুলোতে তাদের সংখ্যার অনুপাতে অংশ দিক।

প্রস্তাবকারী- হযরত মৌলানা দোস্ত মুহাম্মদ কুরেশী

সমর্থনকারী- হযরত মৌলানা কায়েমউদ্দিন

(সাপ্তাহিক "তারজুমানে ইসলাম", লাহোর, ৩১শে মার্চ, ১৯৭২ পৃঃ ৫, কঃ ৫)

'আহ্লে-হাদীস' ফির্কার উলামা উল্লিখিত প্রস্তাবটির পক্ষে কার্যতঃ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আহ্মদীদের ন্যায় শিয়াদেরকেও খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী হিসেবেই নিরূপণ করছেন। সুতরাং মৌলানা হানীফ নাদভী লিখেছেন ঃ

"শিয়া সাহেবানের দৃষ্টিতে নবুওয়তের পাশাপাশি যুগপৎ ইমামতের একটি সমান্তরাল ব্যবস্থাও প্রবহমান রয়েছে অর্থাৎ যেমন নবীদের আবির্ভাব জরুরী, তেমনি ইমামদের লকব (উপাধিকরণ) জরুরী........ এবং কার্যতঃ নবুওয়তের প্রবহমানতা এবং ইমামতের প্রবহমানতার মধ্যে কোনও তফাৎ বা বৈষম্য নেই।"

(মির্যাইয়াত নায়ে যাভিইউঁ সে)

পাকিস্তানের বিভিন্ন ফির্কার ধর্ম-বিশ্বাস যা অপরাপর ফির্কাগুলোর দৃষ্টিতে আপত্তিকর

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দের জানা দরকার যে, কাফের তৈরীর যে তলোয়ার আমাদেরকে কেটে পৃথক করে ফেলার প্রয়াসে উঁচানো হচ্ছে সে তলোয়ারই আবার শিয়া ও দেওবন্দী ধর্মমতের মুসলমানদেরকেও কেটে ফেলার ক্ষমতা রাখে। তেমনি পাকিস্তানের প্রতিটি আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অনুসারী ফির্কাকেই অধিকতর ভয়ানক ও কঠিনতর আকারে কেটে ফেলার দক্ষতা ও নিপুণতা রাখে। এই সুস্পষ্ট বাস্তব সত্যের প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন ফির্কার উপর আরোপিত ঐ আপত্তিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা হিসেবে লিপিবদ্ধ করাই যথেষ্ট হবে, যে-সব আপত্তির ভিত্তিতে ঐ ফির্কাগুলোর উপরও চূড়ান্তভাবে তাদেরকে কুফরী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়।

এ ব্যাপারটি জাতীয় সংসদের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সুবিচার-বিবেচনার উপর ছাড়া যাচ্ছে যে, ঐ সব ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐ ফির্কাগুলোকে অ-মুসলিম বলে সাব্যস্ত করার কতখানি বৈধতার অবকাশ আছে।

বেরেলভী ফির্কা

১। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে খোদাতা'লার মর্যাদা দেয়া হয়।
(শামৃয়ে তওহীদ ঃ পৃঃ ৫-মৌঃ সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেব কর্তৃক প্রণীত)

২। খোদা ছাড়াও বুযুর্গদেরকে বিপদাবলী থেকে উদ্ধারকারী বলে বিশ্বাস করেন এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।
(আনওয়ারুস্-সুফীয়াঃ লাহোর, আগস্ট ১৯১৫, পৃঃ৩২)

৩। আলীপুর সৈয়্যাদাঁকে 'সৈয়্যাদুল-কুরা' (সকল জনবসতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ) জ্ঞান করেন। *(আনওয়ারুস্ সুফীয়াঃ জুন ১৯১৫, পৃঃ ১৯)*

৪। খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী।
(ইনসানে-কামেলঃ ৩৬তম অধ্যায়, সৈয়্যদ আব্দুল করীম জায়লী)

৫। ওহী ও ইলহামের অবতরণকে অব্যাহত বলে বিশ্বাস করেন।
(ম্যায়খানা দরদ ঃ পৃঃ ১৩৪, ১৩৫, ফুতুহাতে মক্কীয়া ঃ ৪ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬)

৬। ইসলামী পরিভাষাসমূহ যেমন আঁ-হযরত, উম্মুল মুমেনীন, রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত ও মারাত্মক ব্যবহার নিজেদের বুযুর্গদের ক্ষেত্রে করে

থাকেন। *(নাযমুদ্ দুরার ফি সিলকিস্ সেয়ার, মুল্লা সাফিউল্লাহ প্রণীত, ইশারাতে ফরিদীয়া, কালায়েদুল জওয়াহের)*

৭। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে হারাম বলে আখ্যা দেন।

(নুসরাতল আবরার ঃ পৃঃ১২৯, ১৮৮৮ইং প্রকাশিত)

৮। এঁরা ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ।

(সাপ্তাহিক"চাটান" ঃ লাহোর, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬২)

৯। এঁরা ইংরেজদের গুপ্তচর । *("চাটান"-লাহোরঃ ৫ই নভেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ৮)*

১০। সৈয়্যদ জামায়াত আলী শাহ্কে হেদায়াতদাতা এবং শাফায়াতকারী হিসেবে বিশ্বাস করেন। *(আনওয়ারুস্ সুফীয়াঃ লাহোর, সেপ্টেম্বর, ১৯১৩, পৃঃ ২৩ এবং আগষ্ট ১৯১৫ ইং পৃঃ ৩২),*

১১। সৈয়্যদ জামায়াত আলী শাহ্কে হুযূর পাক (সাঃ)-এর সমান এবং সৈয়্যদদেরও সৈয়্যদ, নূরে-খোদা, মায্হারে খোদা, শাহে লওলাক এবং হাদী-এ-কুল বলে আখ্যায়িত করেন। *(আনওয়ারুস্ সুফীয়াঃ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ ইং, পৃঃ ১৫, সেপ্টেম্বর, ১৯১১ইং এবং ১৭ই জুলাই, ১৯১২ ইং পৃঃ ৮)*

১২। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে আর্শ পর্যন্ত হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জীলানী পৌছিয়েছিলেন। *(গুলদাস্তায়ে-কারামাত ঃ পৃঃ১৮)*

১৩। তাদের এটা আকীদা (দৃঢ় বিশ্বাস) যে, আঁ হুযুর (সাঃ) 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত) এবং তিনি 'হাযের ও নাযের' (সর্বত্র সর্বক্ষণ উপস্থিত এবং সবকিছুকে সর্বক্ষণ দেখেন) । *(রিসালাহ্ আল্ আকায়েদ ঃ পৃঃ ২৪, আবুল হাসনাত সৈয়্যদ মুহম্মদ আহ্মদ কাদেরী কর্তৃক প্রণীত)*

১৪। জিব্রাঈল কিয়ামতকাল অব্দি নাযেল হতে থাকবেন। *(দালায়েলুস্ সুলুক ঃ পৃঃ ১২৭, প্রণেতাঃ আল্লাহ্ইয়ার খান, চাকড়ালা, জিলা-মিয়াঁওয়ালী)*

১৫। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অবমাননা করেন। *(ইরশাদে রহমানী ওয়া ফযলে ইয়ায্দানীঃ প্রণেতাঃ মৌঃ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, পৃঃ৫১,৫২, গুলদাস্তায়ে কারামতঃ পৃঃ৯৪)*

দেওবন্দী ফির্কা

১। খোদাতা'লাকে মিথ্যা কথা বলতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করেন। (নাউযুবিল্লাহ্) *(ফাতাওয়া রশিদীয়াঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯; দেওবন্দী মাযহাব ঃ প্রণেতাঃ মৌলানা গোলাম মেহ্র আলী শাহ্ গোলড়ভী)*

২। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জ্ঞান শিশু, উন্মাদ এবং জীব-জন্তুদের জ্ঞানের সমান বলে বিশ্বাস করেন। *(হিফযুল ঈমানঃ প্রণেতাঃ মৌলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী, দেওবন্দে মুদ্রিত, পৃঃ ৯)*

৩। শয়তানের জ্ঞান হুযুর পাক (সাঃ)-এর চেয়ে অধিকতর ছিল। *(বারাহীনে-কাতেয়াঃ প্রণেতাঃ খলীল আহ্‌মদ রশীদ, আহ্‌মদ গঙ্গোহী কর্তৃক সত্যায়িত, পৃঃ ৫১)*

৪। হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌কে 'রহ্‌মতুল্লিল্‌ আলামীন' বলে অভিহিত করেন।
(ইফাযাতুল ইওমিয়া ঃ মৌলানা আশরাফ আলী থানভী প্রণীত, খণ্ড ১১, পৃঃ ১০৫)

৫। দেওবন্দীরা না-কি (নাউযুবিল্লাহ্‌) হুযুর পাক (সাঃ)কে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। *(বুলগাতুল হায়ারান, দেওবন্দী মাযহাব পুস্তকের হাওয়ালায়, পৃঃ ৮)*

৬। আঁ-হযরত (সাঃ) উর্দ্দু ভাষা শিখার জন্য দেওবন্দীদের ছাত্র।
(বারাহীনে কাতেয়াঃ 'দেওবন্দী মাযহাব' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৬) ।

৭। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর "খায্‌রা গুম্বুজ" না-জায়েয, হযরত ইমাম হুসেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানীর রওযাসমূহ না-জায়েয এবং হারাম।
(ফাতাওয়া দেওবন্দিঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪)

৮। মৌলভী রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গোহী ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে দ্বিতীয় জন।
(মৌলানা মাহ্‌মুল হাসান রচিত শোক গীতিকা)

৯। দেওবন্দী খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী।
(রিসালাহ্‌ 'তাহ্‌যিরুন নাস'ঃ মৌলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী রচিত)

১০। তারা খানা-এ-কা'বাতে গিয়েও গঙ্গোহের পথ খোঁজে।
(মৌলানা মাহ্‌মুদুল হাসান রচিত শোক গীতিকা)

১১। তারা হযরত ফাতেমাতুয্‌ যোহ্‌রা (রাঃ)-এর অসম্মান ও অবমাননা করে।
(ইফাযাতুল ইওমিয়াঃ ৬, খণ্ড পৃঃ ৩৭)

১২। 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং 'আমীরুল মুমেনীন'- পবিত্র পরিভাষাগুলোর না-জায়েয প্রয়োগ ও ব্যবহার করে।
(রিসালাহ্‌ তিবইয়ান, দাদওয়ালী শরীফ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪, পৃঃ ৯)

১৩। দেওবন্দীদের কলেমা হলোঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ আশরাফ আলী রসূলুল্লাহ্‌" এবং তাদের দরূদ হলো "আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সৈয়্যাদেনা ওয়া নবীয়েনা ওয়া মাওলানা আশরাফ আলী"।
(রিসালা আল্‌ ইমদাদ ঃ মৌলানা আশরাফ আলী, মাহে সফর, ১৩৭৬ হিঃ, পৃঃ৪৫)

১৪। মায়ের সাথে ব্যভিচার যুক্তির দিক দিয়ে বৈধ বলে মনে করেন।
(ইফাযাতুল ইওমিয়াঃ মৌলভী আশরাফ আলী থানবী, ২য় খণ্ড)

১৫। দেওবন্দীরা ইংরেজদের প্রতি পূর্ণ ওফাদারী ও বিশ্বস্ততা রক্ষার পক্ষপাতী ও আহ্বায়ক। *(ফাতাওয়া রশীদিয়া)*

উপরে উল্লেখিত অধিকাংশ উদ্ধৃতি মৌলানা গোলাম মেহ্‌র আলী শাহ্ প্রণীত "দেওবন্দী মাযহাব" পুস্তক হতে গৃহীত হয়েছে।

আহ্‌লে-হাদীস

১। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে দাঙ্গা এবং হারাম বলে মনে করেন। *(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ পত্রিকা ঃ খণ্ড ৯, পৃঃ ৩০৮; হায়াতে তৈয়্যবা ঃ পৃঃ ২৯৬, প্রণেতাঃ হায়রাত দেহ্‌লভী)*

২। হাদীসকে কুরআন করীমের উপর অগ্রগণ্য জ্ঞান করেন। *(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্ পত্রিকাঃ খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১০, পৃঃ ২৯৬)*

৩। কোটি কোটি মুহাম্মদ পয়দা হতে পারেন বলে আকীদা রাখেন। *(তাকভিয়াতুল ঈমানঃ পৃঃ ৪২)*

৪। একাধিক খাতামান্নাবীঈনে বিশ্বাসী (বহু খাতামান্নাবীঈন হতে পারেন বলে স্বীকার করেন)। *(রাদ্দু কওলিল জাহেলীন ফি নাসরিল্ মুমেনীন ঃ (পৃঃ ৪, ৬, ১২৯১ হিঃ ,প্রণেতাঃ মৌলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক নিশাপুরী)*

৫। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শান ও মর্যাদায় আঘাত হানে ও ধৃষ্টতাপূর্ণ অবমাননার অপরাধে অপরাধী। *(সিরাতে মুস্তাকীম (অনুবাদ কৃত) ঃ-পৃঃ ২০১, প্রকাশকঃ মুহাম্মদ আশরাফ, বই পুস্তকের ব্যবসায়ী, কাশ্মীরী বাজার, লাহোর)*

৬। পণ্ডিত নেহ্‌রুকে 'রসূলুস্ সালাম' এবং গান্ধীজিকে 'ইমাম মাহদী' এবং প্রচ্ছন্নভাবে (বিল-কুওয়াহ্) নবী বলে জ্ঞান করেন। *(তারিখে হাকায়েকঃ পৃঃ ৫৯-৬৩, প্রণেতাঃ মৌলানা মুহাম্মদ সাদেক সাহেব, গুজরাঁনওয়ালাস্থ মসজিদ যীনাতুল মাসাজিদের খতীব, মাহে তৈয়্যবা, মার্চ, ১৯৫৭ ইং)*

৭। খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী। *(ইকতারাবুস্‌সায়াহ্: পৃঃ ১৬২)*

৮। ওহী ও ইলহামের প্রবহমানতায় বিশ্বাস করেন। *(ইস্‌বাতুল্ ইল্‌হাম ওল-বায়আহ্: পৃঃ ১৪৮, সওয়ানেহ্ মৌলভী আবদুল্লাহ্ গযনভী প্রণেতা ঃ মৌলভী আব্দুল্ জাব্বার গযনভী)*

৯। সর্বদা ইংরেজদের প্রশংসা ও তোশামোদ করেছেন। *(তরজুমানে ওহাবিয়া: পৃঃ ১২১, ১২২)*

১০। ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতার যুদ্ধকে দাঙ্গা ও বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। *(আল্ হায়াতু বা'দাল মামাত: পৃঃ১২৫, প্রণেতাঃ হাফেয আব্দুল গাফ্‌ফার)*

১১। বৃটিশ সরকার তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী সালতানাত বা রাষ্ট্রগুলার চেয়ে শ্রেয়ঃ।
(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ, ৯ খণ্ড, সংখ্যা,৭ পৃঃ ১৯৫,১৯৬)

১২। বৃটিশ রাজত্বের চিরস্থায়ী গোলাম হয়ে থাকার জন্যে দোয়া করতে থাকেন।
(ইশায়াতুস্ সুন্নাহ্: ৯ খণ্ড, পৃঃ ২০৫, ২০৬)

১৩। ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ। *("তুফান" পত্রিকা, ৭ই নভেম্বর ১৯৬২ইং)*

১৪। ইংরেজদেরকে 'উলিল আমর' হিসেবে আখ্যাত করেছেন।
(দাস্তানে তারিখে উর্দু: প্রণেতাঃ হামেদ হাসান কাদেরী, পৃঃ ৯৮)

১৫। হিন্দুস্থানের বাইরে অন্যান্য দেশেও তারা ইংরেজদের এজেন্টের কাজ করেছেন।
(তরজুমানে ওহাবিয়া: পৃঃ ১২১- ১২২)

১৬। তুরস্কের রাজত্বকে টুকরো টুকরো করেছেন। *(তারিখে হাকায়েক: পৃঃ ৭৮-৮১, প্রণেতাঃ মৌলানা মুহাম্মদ সাদেক, খতীব, গোজরাঁওয়ালা)*

১৭। জেহাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়ে জাহালাত (মুর্খতা) অর্জন করেছেন।
(হিন্দুস্থান কি পাহ্লী ইসলামী তাহ্রীক ঃ পৃঃ ২৯, প্রণেতা ঃ মাসুদ আহ্মদ নদ্ভী)

জামা'তে ইসলামী

১। 'কুরআনের সূরাগুলোর নাম সামগ্রিক ও সর্বব্যাপক নয়।'
(তাফহিমুল কুরআন ঃ ১খণ্ড, পৃঃ ৪৪)

২। 'ইসলাম ফ্যাসিজম (সন্ত্রাসবাদ) এবং কমিউনিজমের অনুরূপ নেযাম বা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাটির মধ্যে খারেজিয়্যত এবং এনার্কিজম পর্যন্ত (বৈধতার) স্থান অধিকার করে আছে।'
(ইসলাম কা সিয়াসী নেযামঃ তুলুয়ে ইসলামের বরাত সূত্রে, ১৯৬৩, পৃঃ ১৩)

৩। 'আঁ-হযরত (সাঃ) ক্ষমতা লাভ ও শক্তি অর্জন করা মাত্রই রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে শুরু করে দেন।'
(হাকীকাতে জিহাদঃ পৃঃ ৬৫)

৪। 'ফিরিশ্তারা প্রায় ঐ রকম জিনিসই বটে, যেমনটি হিন্দুস্থানে দেব-দেবীকে মনে করা হয়।' *(তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দীনঃ পৃঃ ১০-টীকা, ৪র্থ সংস্করণ)-**

৫। 'কুরআন মজীদের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়ণের নিয়ম তান্ত্রিকতা ও শ্রেণী পরম্পরা রক্ষা পায়নি'। *(তাফহিমুল কুরআনঃ ভূমিকা, পৃঃ ২৫)*

---

* নতুন সংস্করণগুলোতে তাহরীফ তথা প্রক্ষেপ সাধন করে এই বাক্যটি তুলে দেয়া হয়েছে-প্রকাশক।

৬। 'হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক ভ্রম-ভ্রান্তিসমূহ সম্পাদিত হয়েছে'।
(তরজুমানুল কুরআনঃ ৩৩ খণ্ড, সংখ্যা-২, পৃঃ ৯৯)

৭। 'হযরত উমর (রাঃ)-এর অন্তর হতে গুরুজনপ্রীতি এবং সমাজপতি ও বড় লোকদের পুজোর মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হতে পারলো না।' *(তরজুমানুল কুরআনঃ ১২ খণ্ড, সংখ্যা, ৪ পৃঃ ২৯৫; মওদূদীয়তকা পোষ্টমার্টামঃ পৃঃ ৩৮-এর সূত্রে)*

৮। 'হযরত খালেদ বিন ওলীদ অনৈসলামিক মনোবৃত্তির সীমাগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারলেন না।' *(তরজুমানুল কুরআনঃ খণ্ড ১২, সংখ্যা-৪, পৃঃ ২৯৫; মওদূদীয়াতকা পোষ্টমার্টাম পৃঃ ৩৮-এর বরাত সূত্রে)*

৯। 'ইসলামী সূফীবাদের মৌলিক ভাব ধারণার মধ্যে অত্যন্ত ভারী ধরনের ভ্রম-ভ্রান্তি বিদ্যমান আছে।' *(তরজুমানুল কুরআন ঃ ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা-১, পৃঃ ১০)*

১০। 'বুখারী শরীফের হাদীসগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা ব্যতিরেকে গ্রহণ করে নেয়া ঠিক নয়।' *(তরজুমানুল কুরআন: ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা- ১, পৃঃ১০)*

১১। 'আঁ-হযরত (সাঃ) থেকে নিয়ে মুস্তাফা কামাল পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাসকে ইসলামী ইতিহাস বলা মুসলমানদের ভুল।'
(তরজুমানুল কুরআন ঃ ২ খণ্ড, সংখ্যা-১ পৃঃ ৭)

১২। 'আহ্‌লে-হাদীস,হানাফী, দেওবন্দী, বেরেলভী, শিয়া, সুন্নী হলো জাহালতজনিত উম্মত।' *(মওদূদী সাহেব প্রদত্ত খুতাবাত: পৃঃ ৭৬)*

১৩। 'মুসলমান জাতির মধ্যে হাজারে নয়শ নিরান্নব্বই জনই সত্যি-মিথো সম্বন্ধে অজ্ঞ।' *(মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ১১৫)*

১৪। 'ইমাম মাহ্‌দী নতুন ধ্যান-ধারণার এক মায্‌হাব (ধর্মমত) সৃষ্টি করবেন।'
(তাজদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দীনঃ পৃঃ ৫২-৫৪)

১৫। 'গণতান্ত্রিক নীতিমালা ভিত্তিক সংসদসমূহের সদস্য পদ গ্রহণও হারাম এবং এগুলোর জন্যে ভোট দেয়াও হারাম।' *(রাসায়েল ও মাসায়েলঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪)*

১৬। 'পাকিস্তান হলো নাপাকিস্তান, আহম্মকদের জান্নাত এবং মুসলমানদের কফেরানা সরকার, যা মুসলমানদের স্তুপীকৃত জগাখিচুড়ী আহম্মকপনার দ্বারা কায়েম করা হয়েছে।' *(মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মাকাশ: পৃঃ ২৯-৩২, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪, ১১৫)*

১৭। "কায়েদে আযম হলেন 'রজোলে-ফাজের' (আল্লাহ্‌র নাফরমান পাপিষ্ঠ পুরুষ)।"
(তরজুমানুল কুরআনঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ইং, পৃঃ ১৪০-১৫৪)

১৮। 'কাশ্মীরের জিহাদ না-জায়েয (অবৈধ)।' *(দৈনিক নওয়া-এ-ওয়াক্ত, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৮ইং এবং তরজুমানুল কুরআন: জুন, ১৯৪৮ইং)*

উপরোল্লিখিত বরাতসহ উদ্ধৃতিসমুহের অধিকাংশ "মওদূদী শাহ্ পারে" পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

চকড়ালভী এবং পারভেযী ফির্কা

১। হাদীসকে শরীয়তসম্মত সনদ স্বরূপ মানেন না।

২। 'আল্লাহ্' শব্দটির দ্বারা কুরআনী সমাজ বা সমাজ ব্যবস্থাবলে অর্থ গ্রহণ করেন।
(নেযামে রুবুবিয়্যত: পৃঃ১৭২, জনাব গোলাম আহমদ প্রণীত)।

৩। 'কুরআনী সরকার নামায এবং রোযার খুঁটি-নাটি বিষয়ে রহিতকরণ, পরির্বতন ও পরিবর্ধন সাধনের অধিকার রাখে।' *(কুরআনী ফয়সালে: পৃঃ ১২, ফিরদৌসে গুমগাস্তা: পৃঃ ৩৫১; খোদা আওর সারমায়াদার: পৃঃ ১৩৬, এদারাহ্ তুলুয়ে ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত)।*

৪। 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম 'খাতামান্নাবীঈন' নন, বরং 'খাতামান্নাবীঈন' হলো কুরআন মজীদ।'
(রিসালাহ্ (পত্রিকা) ইশাআতুল কুরআনঃ ১৫ই জুন, ১৯২৪, পৃঃ ৩১)

৫। 'প্রত্যেক কুরআন অনুশীলনকারীই মাহ্দী।'
(রিসালাহ্ 'ইশাআতে-কুরআন' লাহোর, ১৫ই, নভেম্বর, ১৯৬৪)

৬। তারা মে'রাজকে অস্বীকার করেন।
(নাওয়াদিরাত: পৃঃ ১৭, আল্লামা আসলাম জয়রাজপুরী)

৭। বৃটিশ সরকারের চাটুকারী করেছেন।
(রিসালাহ্ ইশাআতুল কুরআন ঃ ১৫ই জুন, ১৯২৪ইং পৃঃ ২৯-৩২।

শিয়া মাযহাব

১। 'হযরত আলী (রাঃ) হলেন খোদা।' *(তাযকেরাতুল আইয়েম্মাহ্: পৃঃ ৯১)*

২। 'হযরত আলী খোদা এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা।'
(মানকিযে মুরতাযভী হায়াতুল কুলুব: ২ খণ্ড, বাব ৪৯)

৩। 'খোদাতা'লা সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টিকে শিয়াধর্ম মতে ইমামগণের নিয়ন্ত্রণ ও আনুগত্যে আদিষ্ট করে রেখেছেন।'
(নাসেখুত্ তওয়ারিখ: ৬খণ্ড, কিতাবে দওম, ৩৪৮)

৪। 'হযরত আলী খোদার পুত্র।' *(রিসালাহ্ নও রতন: পৃঃ ২৬)*

৫। 'আমরা আমীরুল মুমেনীন (আলী)-কে সমস্যাবলী সমাধানকারী এবং দুঃখ-কষ্ট নিরসনকারী হিসাবে মানি।' *(শিয়া মাযহাব মোওহাবিয়্যত কি রোকথাম কে লিয়ে সুগরা মাকালা যুহুরে আলী বমকাম কাবে কওসাইন: পৃঃ১৫, ১৬)*

৬। 'যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ তৃতীয় একটি অংশ বিশেষ অর্থাৎ 'উলুল আমর' (আদেশ দানের অধিকারী কর্তা বা শাসক) এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান বলে আখ্যাত হতে পারে না।'

(মা'রিফে ইসলাম: লাহোর, আলী এবং ফাতেমা সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৮ পৃঃ৭৪)

৭। 'কুরআন প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীর দিকে নাযেল হয়েছিল।'

(রিসালাহ্ 'নও রতন': পৃঃ ৩৭)

৮। 'হযরত আলী সকল নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

(গুনইয়াতু ত্বালেবীন এবং হক্কুল একীন মজলিসী, বাব ৫)

৯। 'যদি হযরত আলী মে'রাজের রাতে উপস্থিত না হতেন, তাহলে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র আল্লাহ্‌র কাছে কোনও মাকাম ও মর্যাদা হতো না।' *(জালা' আহ্ইউন মাজলেসী আয খিলাফতে শায়খাইন ঃ পৃঃ ১৭)*

১০। 'আসল কুরআন ইমাম মাহ্দীর কাছে রয়েছে, যা চল্লিশ পারা সম্বলিত। বর্তমান কুরআন উস্‌মানী পাণ্ডুলিপি, যার মধ্যে দশটি পারা কম।' *(আস্‌রাকুল খিলাফৎ তফসীর লওয়ামিউত্ তানযীল ঃ ৪র্থ খন্ড, সৈয়্যদ আলী আল্ হায়েরী লাহোরী প্রণীত; তফসীর সাফী, অধ্যায় ২২, পৃঃ ৪১১)*

১১। 'হযরত আযরাঈল হযরত আলীর আদেশে রূহ্‌গুলোকে কবয করে থাকেন।'

(তাযকেরাতুল আইয়েম্মাহ্ ঃ পৃঃ ৯১)

১২। 'হযরত আবুবকর ও হযরত উমর উভয়েই হযরত ফাতেমার রূপ - সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং এর জন্যেই হিজরত করেছিলেন।'

(কিতাব কামেল এবং কিতাব খিলফতে শায়খাইন ঃ পৃঃ ৪১)

১৩। 'হযরত উমর এমন এক রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যদ্দরুন লওয়াতাত (সমকাম) ছাড়া স্বস্তি পেতেন না।'

(আয্ যাহ্‌রা, শিয়া -সুন্নী ইত্তেহাদ পুস্তকের বরাত অনুযায়ী, পৃঃ ৪)

১৪। 'হযরত আবুবকরের নিকট মসজিদ-নব্বীতে নবী করীমের মিম্বারের উপরে সর্ব প্রথম খেলাফতের বায়াত নিয়েছিল শয়তান।'

(কিতাব ইমামী ইমাম আযম তুসী শিয়ী এবং খিলাফতে শায়খাইন ঃ পৃঃ ২৫)

১৫। 'কুরআন করীমে যেখানে যেখানেই "ওয়াকালাশ্ শায়তানু" (-'শয়তান বলেছে') শব্দ এসেছে, দ্বিতীয় খলীফা উমরকে বুঝায়।'

(মকবুল কুরআন ইমামিয়া ঃ পৃঃ ৫১২-এর বরাত অনুযায়ী)

১৬। "হযরত আবুবকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান কাফের-ফাসেক ছিলেন।"

(হায়াতুল কুলুবম জলিসীঃ বাব ৫১)

১৭। "শয়তান হযরত আলীর চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে মারা যায়।"

(তাযকিরাতুল আইয়েম্মাহ্ ঃ পৃঃ ৯১)

১৮। "কেবলমাত্র ছয়জন ব্যতিরেকে----রসূলের বাদবাকী সকল সাহাবা মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) এবং মুনাফিক (কপট) ছিলেন।"

(কিতাব ওফাতুন্ নবী, সালীম ইব্নে কায়সার আল্ হিলাল্ মাজালিসুল্ মুমেনীন, মজলিস-ত, কাযী নূরুল্লাহ, হায়াতুল কুলুব, বাব-৫১, পৃঃ ১১)

১৯। "উমর (রাঃ) কুক্কুরীতে রূপান্তরিত হয়ে ছয়টি বাচ্চা জন্ম দেন এবং অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন।"

(কিতাব ঈসাইয়াত আওর ইসলাম মুসলমান বাদশাহোঁ কে তাহ্ত ঃ পৃঃ ২৪২)

২০। "হুযূর আকদাস (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে চরম অপবিত্র অভিযোগ---।"

(খুলাসাতুল মিনহাজ, কলমী, ১ম খন্ড- সূরা নিসার আয়াতের অধীনে)

২১। "হযরত আলী এবং তাঁদের সমগ্র ইমাম নবীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

(হাক্কুল একীন মজলেসী, বাব ৫)

২২। "আমাদের দলটি ব্যতীত সব মানুষ 'বাগাইয়া' (বেশ্যা)-এর সন্তান।"

(আল্ ফুরুউ মিনাল জমেয়িল্ কাফী, খন্ড; কিতাবুর্ রওযা, পৃঃ ১৩৫)

২৩। "যদি মৃত ব্যক্তি শিয়া না হয় বরং সে আহ্লে বায়তের দুশমন হয়ে থাকে, তার জানাযার নামায প্রয়োজনবশতঃ পড়তেই হয়, তাহলে চতুর্থ তকবীরের পরে বলবে, 'আল্লাহুম্মা--- হে আল্লাহ! তুমি তাকে আগুনের আযাবে নিক্ষেপ কর'।"

(তোহ্ফাতুল্ আওয়াম ঃ পৃঃ ২১৬, ২১৭, চতুর্থ সংস্করণ)

দ্রষ্টব্যঃ উপরোল্লিখিত অধিকাংশ বরাতসমূহ "কাতেউ আনাফিশ্ শিয়াতেশ্ শানীয়াতে" এবং "শিয়া-সূন্নী ইত্তেহাদ কি মুখলেসানা এপীল" গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত।

শিয়াদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের কাফেরানা রাজত্বের সমর্থন এবং জিহাদের বিরুদ্ধাচরণ ঃ

১। মাওয়েযাহ্ তাহ্রীফে কুরআন ঃ (পৃঃ ৭১,৭২ ঃ ২য় সংস্করণ।)

২। ডাবলিউ, ডাবলিউ, হান্টার রচিত গ্রন্থ "আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান" ঃ (পৃঃ১৭৮-১৮০)

৩। মওয়েযাহ্তাকিয়া ঃ পৃঃ ৭৩, ৭৪; ২য় সংস্করণ।

৪। 'উকিল' পত্রিকা, অমৃতসর, ২৮শে অক্টোবর, ১৯১৭ইং সংখ্যায় আগা খানের বিবৃতি।

ইসলামী-ঐক্যের স্থিতিশীলতার একমাত্র পথ

আমাদের দৃষ্টিতে ইসলামী জগৎ, বিশেষতঃ পাকিস্তান পূর্বেই ধর্মের নামে উত্থাপিত উত্তেজনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সেজন্যে সম্মানিত সংসদ সদস্যদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, আহ্মদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বর্তমান দাঙ্গা-ফাসাদ ও উস্কানি-উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলার প্রেক্ষিতে ফির্কাপরস্তি ও সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ কুফল সম্বন্ধে চিন্তা করা। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও দৈনিক 'ইনকিলাব' পত্রিকার প্রথিতযশা সম্পাদক মৌলানা আবদুল মজীদ সালেক ১৯৫২ ইং সালে পাকিস্তান সরকারকে নিম্নরূপ আন্তরিক ও বিজ্ঞোচিত পরামর্শ দিয়েছিলেনঃ

"আমাদের কাজ শুধুমাত্র এতটুকু যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-তে বিশ্বাসী ও এর প্রতি স্বীকৃতিদানকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই যেন আমরা মুসলমান জ্ঞান করি এবং মুসলানদেরকে কাফের আখ্যা দেয়া চিরতরে বর্জন করি। বরং সময় এসে গেছে, ইসলামী সরকার যেন মুসলমনদেরকে কাফের আখ্যা দানকে আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন যাতে ইসলামী সমাজ এই অভিশাপ হতে চিরকালের জন্যে মুক্তি পায়।" *(দৈনিক আফাক' ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫২ ইং)।*

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বেদনাভরা আন্তরিক সাবধানবাণী

আমাদের এ বক্তব্যটি সিলসিলা আহ্‌মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার জলদ্‌গম্ভীর একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ বিবৃতির উপর সমাপ্ত করা হচ্ছে। তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র উলামা ও নেতাদেরকে দরদভরা অন্তরে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

"দুনিয়া আমাকে চিনে না। কিন্তু তিনি আমাকে চিনেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। এটা এই লোকদের ভুল এবং একান্ত দুর্ভাগ্য যে, তারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ যা প্রকৃত মালেক (আল্লাহ্‌) নিজ হাতে রোপণ করেছেন। ....

হে জনগণ! তোমরা নিশ্চিৎ বিশ্বাস করো যে, আমার সহায়তায় সেই হাত আছে যা শেষ মুহূর্ত অব্দি আমার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। যদি তোমাদের পুরুষ, তোমাদের নারী, তোমাদের যুবা, তোমাদের বৃদ্ধ, তোমাদের ছোট এবং বড় সকলে মিলিত হয়েও আমার ধ্বংসের জন্যে দোয়া কর, এমন কি সিজদা করতে করতে তোমাদের নাসিকাও গলে যায় এবং তোমাদের হাত অবশ হয়ে যায়, তথাপি খোদা কখনও তোমাদের দোয়া শ্রবণ করবেন না এবং ক্ষান্ত হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করেন। যদি মানুষের মধ্যে একজনও আমার সঙ্গে না থাকে, তাহলে খোদার ফিরিশ্‌তারা আমার সাথে থাকবে। যদি তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন কর তাহলে অচিরেই পাথর আমার জন্যে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

অতএব, নিজেদের প্রাণের প্রতি যুলুম করোনা। মিথ্যাবাদীদের চেহারা অন্য রকম হয় আর সত্যবাদীদের চেহারাই ভিন্নতর হয়ে থাকে। বস্তুতঃ খোদা কোন বিষয়কেই বিনা ফয়সালায় ত্যাগ করেন না। আমি সেই জীবনের প্রতি অভিশাপ পাঠাই, যা মিথ্যে ও প্রতারণাযুক্ত এবং সেইরূপ অবস্থার প্রতিও অভিসম্পাত যা সৃষ্টিকে ভয় করে খোদার আদেশ হতে সরে দাঁড়ায়। যে খেদমত যথাসময়ে সর্বশক্তিমান খোদা আমার উপর ন্যস্ত করেছেন এবং যার জন্যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা পালনে আমি বিন্দু মাত্রও শৈথিল্য করি তা কখনও হতে পারে না যদিও সূর্য এক দিক থেকে এবং পৃথিবী অন্য দিক থেকে পরস্পর মিলে গিয়ে আমাকে পিষ্ট করতে চায়। মানব কি? একটা কীট মাত্র! এবং মনুষ্যই বা কী? সে মাতৃজঠরের একটা জমাট রক্ত পিণ্ড বৈ আর কিছু নয়। অতএব, আমি কি করে "হাইউন ও কাইউম" (চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী) খোদার আদেশকে একটি কীট বা জমাট রক্তবিন্দুর কারণে অবহেলা করতে পারি। যেভাবে খোদাতা'লা পূর্ববর্তী মা'মুরীন ও মুকায্‌যেবীনের (প্রেরিতগণ ও প্রত্যাখ্যানকারীদের) মধ্যে পরিশেষে নিষ্পত্তি

করে দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি এখনও করবেন। খোদাতা'লার মা'মুরীনের আসার জন্যেও একটি মৌসুম হয়ে থাকে। আবার যাবার জন্যেও একটা মৌসুম। অতএব নিশ্চিৎ জানবে যে, আমি মৌসুম ব্যতিরেকে আসিনি এবং মৌসুম ছাড়াও যাব না। খোদার বিরুদ্ধে লড়াই করো না। তোমাদের কাজ নয় যে, আমাকে ধ্বংস করতে পার।"
(তোহ্ফা গোলড়ভীয়া ঃ পৃঃ ৮ ও ৯)

"আমি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উপদেশ স্বরূপ বিরুদ্ধবাদী উলামা এবং তাদের সমমনা লোকদেরকে বলছি যে, গালি দেয়া এবং কটু ভাষা প্রয়োগ করা ভদ্রতার পরিচয় নয়। যদি ইহাই আপনাদের স্বভাব হয়ে থাকে তাহলে তা আপনাদের অভিরুচি। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে মিথ্যেবাদী মনে করেন তাহলে এ অধিকারও তো আপনাদের আছে যে, মসজিদসমূহে সমবেত হয়ে অথবা পৃথক পৃথকভাবে আমার বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করতে পারেন এবং কেঁদে কেঁদে আমার মূলোৎপাটন কামনা করেন। তারপর আমি যদি মিথ্যেবাদী হয়ে থাকি তাহলে নিশ্চয় সে দোয়াগুলো কবুল হয়ে যাবে। বস্তুতঃ আপনারা সর্বদা দোয়া করেও থাকেন।

কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে, আপনারা যদি এতো দোয়া করেন যে, জিহ্বায় যখম পড়ে যায় এবং এতই কেঁদে কেঁদে সিজদায় পতিত হন যে, নাক খসে যায় এবং অশ্রুপাতে চোখ বসে যায় এবং পলকগুলো ঝরে যায় এবং অতিরিক্ত কান্না-কাটির দরুন দৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, আর পরিশেষে মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন অথবা অনিদ্রাজনিত উন্মাদনার শিকার হন, তথাপি ঐ দোয়াসমূহ গৃহীত হবে না। কেননা আমি খোদার নিকট হতে এসেছি।................কেউ পৃথিবীর বুকে মারা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশে তার মৃত্যু না ঘটে। আমার আত্মায় সত্যতাই বিদ্যমান যা ইব্রাহীম আলায়হেস্সালামকে দেয়া হয়েছিল। খোদার সহিত আমি ইব্রাহিমী সম্পর্ক রাখি। কেউই আমার সে গোপন রহস্য জানে না, কিন্তু আমার খোদা জানেন। বিরুদ্ধবাদীরা অযথাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আমি সে বৃক্ষ নই যা তাদের হাত দিয়ে উৎপাটিত হতে পারে। ....হে খোদা! তুমি এই উম্মতের উপরে সদয় হও, কৃপা করো। আমীন।"
(আরবাঈন ঃ ৪র্থ খণ্ড,, পৃঃ৫-৭)